শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌॥

প্রার্থনা।

নাম্নৈব তব গোবিন্দ কলৌ ত্বত্তঃ শতাধিকম্‌
দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং বিনাপ্যষ্টাঙ্গযোগতঃ।
বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি পুনঃ পুনঃ
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে॥

হে গোবিন্দ! এই কলিযুগে তোমা হইতেও তোমার নামের মহিমা শতগুণ বেশী। পাপী তাপী তোমায় ভাল বাসিতে পারে না, তোমাতে তাহাদের মন যায় না। তোমার প্রতি যাহাদের প্রেম নাই, সেই সকল অপ্রেমিক জনকে তুমি দেখা দাও না, কিন্তু কলিকালে তোমার নাম করিতে পাপী তাপী আচণ্ডাল সকলেই অধিকারী; নাম বলে পাপক্ষয় হয়, নাম বলে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়, নাম বলেই তোমায় লাভ করিয়া তোমার প্রেম ধনে ধনী হইয়া পাপাদি দূর করতঃ জীব কৃতার্থ হয়। নাম কীর্ত্তনে অষ্টাঙ্গ যোগব্যতীতও মুক্তি (সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা, নিন্দা ও স্তুতিতে সমজ্ঞানতা, শত্রু মিত্রে সমভাব প্রভৃতি) লাভ করিতে পারে। নাম ভিন্ন কলিকালে জীবের আর গতি নাই ইহা স্থির। পতিতপাবন!

তোমারে সেই জগন্মঙ্গল নাম আছেন, এবং উচ্চারা দয়া করিয়া জীবকে দিয়াছে, কিন্তু নাথ! আমার রুক রুচি হইল না, নানা কার্য্যে সময় দিতে পারি কিন্তু প্রাণ জুড়াইবে, যাঁহার প্রভাবে পাপ তাপ দূর হইবে, যাঁহার শক্তিতে মনপ্রাণ প্রফুল্ল হইবে সেই মধুর নাম শ্রবণ কীর্ত্তনে রস করিতে পারি না। তাই প্রার্থনা করি, কৃপণ যেমন তাহার সঞ্চিত ধন, বার বার নাড়া চাড়া করিয়া দেখে, সর্ব্বদাই ধনের চিন্তা করে, অন্য কোথায় গেলে বা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও সেই ধন চিন্তায়ই মনকে নিযুক্ত রাখে, কৃপণের ধনের ন্যায় আমি যেন তোমার নামে প্রেম রাখিতে পারি, যেন দিবানিশি নাম চিন্তা, ও নাম জপ করিতে পারি, নামে রুচি, নামে শ্রদ্ধা, নামে বিশ্বাস রাখিয়া যেন কার্য্য করত নামামৃত সিন্ধুতে চিরদিনের মতন ডুবিয়া থাকিতে পারি; আমায় এই ভিক্ষা দাও।

সম্পাদক।

মীরা বাই।

অনন্ত রত্ন প্রসূ ভারত সাগরে কত রত্ন যে কত স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহাদের সন্ধান লয়, কে তাহাদের খবর রাখে? কোন রত্ন বহু জ্বালাসমাকীর্ণ, কোনটী ঈষৎ, কোনটী অর্দ্ধ, কোনটী বা সম্যক্ শঙ্ক দ্বারা আচ্ছাদিত। যেটী বহু জ্বালাচ্ছাদিত ও যেটী সম্যক্ আবরণ দ্বারা আবৃত—উভয়ই আমরা দেখিতে পাই না—একটীতে আমাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়, অপরটী আমরা চিনিতে পারি না। যাহাদের ক্ষীণ মিট মিটে আলো সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এই মর জগতে আসিয়া পৌঁছে, কেবল তাহাদের দিকে কেহ কেহ তাকায়, অন্যে নানারূপ চিন্তাজালে

জড়িত হইয়া পাশ দিয়া চলিয়া যায়, একবার ফিরিয়াও চায় না। মনে করি তাহারা বড় বুদ্ধিমান, এই সব কেবল সরল প্রাণ লোক দিগের চিত্তাকর্ষক। যাহা হউক কেহ কেহ দেখে বলিয়াই সময় সময় আমরা কোন কোন রত্নের খোঁজ খবর পাই ও স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকি ও ভূয়সী প্রশংসা করি। আমাদের মীরাবাইও ক্ষীণালোকযুক্ত, পুটপাকে শোধিত, শাণযন্ত্রা রোপিত, সুবর্ত্তুলীকৃত, মধ্যমণিতিরস্কৃত একটী রত্ন।

মীরা বাই একটী লুপ্তপ্রায় রত্ন, কখন কখন দুই একটী রশ্মি এ জগতে আসে আবার ক্ষণকাল পরেই লুকাইয়া যায়, কেহ আর দেখিতে পায় না। কিন্তু রত্নটীর নাম অনেকেই জানেন। অনেকেই মীরাকৃত দুই একটী পদও জানেন। অনেকেই "মীরা কহে" ইত্যাদি দুই একটী পঙ্‌ক্তি ভাবিয়া নিজ নিজ উত্তপ্তচিত্তকে ক্ষণকালের জন্য শান্তিবারিতে সিক্ত করেন; কিন্তু কয়জন তাঁহার জীবনী জানেন, কয়জন তাঁহার খবর রাখেন?

আমাদের মীরাবাই রাজপুতানার মধ্যগত মেরোতা জনপদের অধীশ্বর একজন রাঠোর সামন্তের কন্যা। ছোট কাল হইতেই তিনি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার লাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মস্পৃক্‌, হৃদয় দ্রবকারী, প্রচণ্ড তাপে উত্তাপিত সংসার মরুভূমিতে নির্ম্মল শীতল উৎস স্বরূপ হরিনাম গানে তৎপরতার কথাও দিগন্তব্যাপী হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক তাঁহার গান শুনিতে আসিতে লাগিল। একবার, দুইবার, বহুবার করিয়া গান শুনিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সংসারের ভোগ বিলাসের বাসনার ন্যায় গান শুনিবার লালসা পরিতৃপ্ত হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা সংসারের কাজ হইতে অবসর পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া একবার গান শুনিয়া যাইত।

ক্রমে চিতোরের যুবরাজ কুম্ভরাণার কর্ণে মীরার অতুলনীয়

দেহকান্তি ও অভাবনীয় মাধুর্য্যের কথা পৌঁছিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন একদিন যাইয়া অতৃপ্ত চক্ষু ও কর্ণের তৃপ্তি সাধন করি-বেন। কিন্তু তিনি চিতোরের রাজকুমার, কি প্রকারেই বা সামান্য গ্রাম স্বামীর বাড়ীতে অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইবেন, এই চিন্তা করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ঠিক করিলেন মেরোতা মারবার দেশে অবস্থিত ও মারবাররাজ তাঁহার মাতুল, তাঁহার সহিত দেখা করিবার ব্যপদেশে অনায়াসেই মেরোতা যাই-বেন, তাহা হইলেই মীরাকে দেখিতে পাইবেন এবং তাঁহার গানও শুনিতে পাইবেন। মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়া একদিবস রাত্রি-যোগে একাকী বাহির হইলেন—উদ্দেশ্য মীরার সহিত সাক্ষাৎ; কিন্তু পথ চিনেন না, এমন কি মেরোতা দেশ যে কোন দিকে তাহাও জানেন না—হৃদয়ে অদম্য বাসনার প্ররোচনায় ঘরের বাহির হই-লেন। কিন্তু দেবপ্রদর্শিত পথের ন্যায় ঠিক পথ দিয়া রাত্রিতে চলিয়া প্রভাতে একজন লোকের সহিত দেখা হইল—তিনি মীরার গান শুনিতে চলিয়াছেন। রাণা কুম্ভ তাঁহার উদ্দেশ্য জানি তাঁহাকে মীরার সম্বন্ধীয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে করি মেরোতা দেশে গেলেন। গিয়া দেখিতে পাইলেন, আস্তরণ মণ্ডি সুবিস্তৃত প্রাঙ্গন মধ্যে নক্ষত্ররাজি বেষ্টিত চন্দ্রিমার ন্যায়, বালিক সখীগণ মধ্যগত বাসন্তকুসুমালঙ্কৃতা বনদেবতার ন্যায় বসিয়া হৃদয়া-নন্দকারী হরিনাম কুসুমের কর্ণভূষণ সকলকে দিতেছেন। কি সুন্দর রূপ! কি মধুর কথা! বালিকা হরিনাম গান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দও যেন তাঁহার সহিত স্ব স্ব ভাব মিশাইয়া দিয়া ভাব সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে—— কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছে, কাহারও মুখে সাড়া শব্দ নাই।

গানের পর গান হইল। গান শেষ হইবার সময় আসিল, দুই একটী করিয়া সমস্ত লোক স্বস্থানে চলিতে লাগিল। কিন্তু একটী

লোক অগ্রসর হইয়া মীরার কাছে আসিল। তাঁহার মুখ প্রশান্ত, ভ্রূদুটী যেন তুলিতে আঁকিয়াছে, চক্ষু বড় ঢলঢলে, চিকুর ভ্রমর কৃষ্ণ, কপাল প্রশস্ত—মহৎ লোক বলিয়া মনে হয়। তাঁহাকে তথায় দেখিয়া মীরার পিতা বিদেশী বলিয়া বুঝিলেন ও আথিত্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। রাণাও মীরার মনমোহন রূপরাশি দেখিয়া ও হৃদয়োন্মাদক গান শুনিয়া তথায় থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং আতিথ্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন কেন? তাঁহার সেবায় মীরাকে নিয়োজিত করা হইল। অতএব মীরার সহিত আলাপ করিতে রাণার যথেষ্ট সুযোগ হইল ও সাধ পুরাইয়া কথোপকথনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, সপ্তাহ কাল যাবত তিনি সেখানে আসিয়াছেন, আর বেশী দিন তথায় থাকিতে ইচ্ছুক নন। যাইবার দিবস মীরাকে অঙ্গুরীয় দিতে চাহিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া আরও কয়েক দিবস তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন। রাণা কথায় কথায় মীরাকে স্বীয় পরিচয় দিয়া তাহাকে চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে বলিলেন। মীরা তাঁহার পদদ্বয়ে লুণ্ঠিতা হইয়া স্বীয় অপরাধ মার্জ্জনা করিতে বলিলেন। এমন সময়ে মীরার পিতা সহসা সেস্থানে আসিয়া সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন ও মীরাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। মীরা চিতোরের ভাবি রাণী হইলেন।

কালে মীরা রাণী হইলেন। রাণী হইয়া মীরা কয়েকদিন স্বামী সহবাসে সুখ স্বচ্ছন্দে কাটাইলেন। কিন্তু দুই তিন বৎসর পরেই তাঁহার মনে সহসা যে কি এক ভাবের উদয় হইল, কিছুই ভাল লাগে না, জীবন উদাস, বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। স্বামী সেবায় আর সেরূপ সুখ নাই, স্বামী সহবাসে আর সেরূপ মন মজেনা, —প্রাণ যেন কি চায় অথচ পায় না। রাণা বুঝিতে পারিলেন ও মনকে বিষয়ে নিয়োজিত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর প্রেম

পূর্ণ মন কি আর অস্থায়ী, অল্প সুখাস্বাদ, বিষয় সুখে মজে? রাণা কবি ছিলেন, কবিত্বে বেশ পটুতা ছিল। মীরাকে ভাবান্তরিত করিতে ইচ্ছা করিয়া কবিতা লিখিবার উপায় শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। মীরা সুকবি হইলেন। তাঁহার কবিতা প্রসাদগুণে রাণাকে পরাস্ত করিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন আর কয় দিন থাকিবে! আবার অসুস্থ হইয়া পড়িল ও বালিকাবস্থার ন্যায় হরিনাম গান দ্বারা লোকদিগকে তুষ্ট করিবার বাসনা রাণার নিকট প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া রাণা অতিশয় রাগান্বিত হইয়া রোষকষিত নয়নে তাঁহাকে নানারূপ ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন ও অবশেষে মীরা তাঁহার চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন, তিনি আর কখনও স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবেন না। কয়েকদিন পরে রাণার ভাবান্তরিত হইল ও তিনি তাঁহার স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিতে বলিলে মীরা রাজান্তঃপুর মধ্যে গোবিন্দ জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং আগন্তুক বৈষ্ণবদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে অনুমতি চাহিলেন। রাণা ও তাহা করিলেন।

রাণা দেখিতে পাইলেন অন্তঃপুর মধ্যে লোক সকলে অবাধে যাওয়া আসা করিতেছে ও সর্ব্বদা লোকারণ্য থাকিতেছে। তাঁহার আর ভাল লাগেনা, তিনি বিরক্ত হইতে লাগিলেন, ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। এমন কি মীরা সতী কি না সে বিষয়ও সন্দেহ হইল ও শত বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন অনুভব করিতে লাগিলেন। নিজ অবিমৃশ্যকারিতাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। কেন মেরোতা গেলেন, কেন মীরাকে দেখিলেন ও তাঁহার গান শুনিলেন, মীরাইবা কেন তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইয়া এই কষ্টের কারণ হইলেন, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাণা ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। পরিশেষে দারান্তর গ্রহণ করিয়া সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এই সময় রাণাও মীরার শয়নকক্ষে বড় যাইতেন

না, দাসীরা বার বার বলিলে দুই এক দিন যাইতেন, নচেৎ গোবিন্দ জীউর মন্দিরেই রাত্রিযাপন করিতেন। তথাপি রাণা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজ করিতে সাহস করিতেন না ও একদিন তাহা বলিলেন। তিনি তাহা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া বলিলেন, এত দিন প্রভুর সেবা শুশ্রূষা হইত না, তাই তিনি আর এক জন দাসীকে নিযোজিত করিতে ইচ্ছুক, ভালই হইয়াছে'। নিজের সুখের জন্য জিজ্ঞাসা না করিয়া মীরার সপত্নী ভয় উদ্দীপিত করিবার জন্য বলায় মীরা বলিলেন, "দুই জন দাসী একটী প্রভুকে সেবা করিতে নিযুক্ত হইলে কেহই দুঃখিত হয় না বরং সুখী হইয়া থাকে কারণ তাহার কাজ কমিল।" সুতরাং রাণা সম্মতি পাইলেন ও তৎবিষয়ে স্থির সংকল্প হইলেন।

ক্রমশঃ—

ভক্তের ভগবান।

ত্রিভুবনের মধ্যে যাহা যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা নিশ্চয়ই কোন অপ্রাকৃত লোকের প্রতিবিম্ব। সেই উৎকৃষ্টতার সীমা অবশ্যই কোন না কোন স্থানে নিবদ্ধ আছে। অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে সহজেই অনুভব হয়, এমন কোন উৎকৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা আছে, যাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। উপর্য্যুপরি অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি পরিচালিত করিলে শ্রীভগবানেই তাহা পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু সকল গুলির হয় না, অনুসন্ধানে তাহার অন্য পাত্র পরিদৃষ্ট হয়, সে দ্বিতীয় পাত্র ভক্ত। সৌন্দর্য্য একটী উৎকৃষ্ট বস্তু, ইহার পরাকাষ্ঠা ভগবান, তাঁহাতেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য সীমা নিবদ্ধ

আছে; কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের যে অনুভবানন্দ, তাহা ভগবানে নাই, তাহার সীমা ভক্তে। কারুণ্য একটী সুন্দর গুণ, ভালবাসার সারভাগ এই কারুণ্য, ইহা নিষ্কাম, নির্হেতুক, নিঃস্বার্থ এই কারুণ্যের যদি সীমা থাকে, তাহা শ্রীভগবানেই আছে। কিন্তু সেই করুণানুভাবিকাশক্তি ভক্তেই নিহিত, ভগবানে তাহা নাই, ভগবানের করুণা কত ভক্তই জানেন, ভগবান তাহা জানেন না। ভগবৎ করুণানুভাবিকা শক্তির পরাকাষ্ঠা ভক্তি, ভক্তির আশ্রয় ভক্ত, ভক্তের আশ্রয় ভগবান। অতএব এই দুই তত্ত্বে অর্থাৎ ভক্তে ও ভগবানে ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। এই অনিত্য জগতের সার তত্ত্ব ভক্তি, ভক্তির সার ভাব, ভাবের সার প্রেম। এই প্রেম ভক্তিও ভগবানে যুগপৎ সংযুক্ত রহিয়াছে, এই জন্যই শত সহস্র বার স্বীকার করিতে হইবে; এই অনিত্য জগতে যদি কিছু নিত্য থাকে, যদি কিছু সত্য থাকে, যদি কিছু অপ্রাকৃত নির্ম্মল বস্তু থাকে তাহা ভক্ত ও ভগবান। এই উভয় তত্ত্বের অচিন্ত্য সম্মিলনই তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; সৎস্বরূপ তিনি অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব, চিৎস্বরূপে ভক্তই তাঁহার শক্তিতত্ত্ব, এই শক্তির পূর্ণ বিকাশ ভক্তি, এই উভয় তত্ত্বের সম্মিলনই আনন্দ তত্ত্ব। এই জন্যই এই উভয় তত্ত্বে অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ, ভক্তই তাঁহাকে লীলায় নাচায়, নচিলে তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম। যোগিগণ তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপ দেখেন, তাহাতেই লীন হন, কিন্তু ভক্তই তাঁহার স্বরূপ নিত্যমূর্ত্তি প্রকাশ করাইতে পারেন, কারণ সেই নিত্য বিগ্রহে ভক্তই প্রাণ চেষ্টা, ভক্তই তাঁহার লীলা, ভক্তই তাঁহার আনন্দের সীমা। ভক্তের আনন্দ ভগবান, ভগবানের আনন্দ ভক্ত, ভক্ত ভিন্ন তাঁহার অনন্ত করুণাদি গুণ ও অনন্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য পরিস্ফুট হয় না। এই জন্যই যখন যখন ভগবানের আবির্ভাব হয়, লীলা সহচর ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে আবির্ভূত হন, নচেৎ জীবলোকে কেহ তাঁহার আগমন জানিতে পারিত না। সিদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের

সঙ্গে আসিয়া ভগবানকে লইয়া যে লীলা করেন সাধক ভক্ত যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহাই অনুকরণ করেন, তাহাই অনুশীলন করেন, তাহাই প্রাণে গাঁথিয়া লইয়া ভগবানের করুণার পথে অগ্রসর হন। অতএব ভক্ত জীবনের পবিত্র আদর্শ অনুকরণ করাই সহজ সাধ্য ঈশ প্রাপ্তির নিরাপদ পন্থা। আজ আমরা পাঠকগণকে একটী ভক্ত চিত্র দেখাইয়া জীবন ধন্য করিব।

ধন্য রাজা দশরথ, পূর্ণ ভগবান্ রাম চন্দ্র যাঁহার পুত্র। বাৎসল্য ভাবের পূর্ণাবেশে রাজার শ্রীরামচন্দ্রে পুত্র ভাব, ঐশ্বর্য্যানুভব নাই; লীলাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে শ্রীরামচন্দ্রের ঈশ্বরাভিমান নাই। নিখিল জগতের অধীশ্বর অনন্ত মহিম রাম এখন দশরথের প্রাণপুত্র, পিতার আজ্ঞাধীন, পিতৃভক্ত সুকুমার রাজপুত্র।

সূর্য্য গ্রহণ—বিশেষতঃ বৈশাখে—মহাযোগ। রাজা দশরথ গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছেন, সঙ্গে রাজমহিষীগণ, রাজপুত্রগণ, ভৃত্য, মিত্র, অমাত্য চতুরঙ্গ রাজবাহিনী—মহা সমারোহ। চারিদিকে মহোৎসব, মহা আনন্দ স্রোতঃ প্রবাহিত, সকলেই আমোদে—আনন্দে মগ্ন। অদূরে চণ্ডাল রাজধানী শৃঙ্গবের পুর, মদিরামত্ত চণ্ডাল দল নানা বাদ্য বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে গঙ্গাতীরে আসিতেছে, উৎসবের দিন, কাহারও নিষেধ নাই। উন্মত্তপ্রায় চণ্ডালদল উচ্চতীর ভূমি হইতে লম্ফ দিয়া স্রোতে পড়িতেছে, জল ঘুরাইতেছে, সাঁতার দিতেছে, বালকে বালকে, যুবকে যুবকে, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে, জলযুদ্ধ করিতেছে, মহা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। নানাদিকে নানাবিধ আনন্দের পর আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে।

রাজা দশরথ পবিত্র নারায়ণ ক্ষেত্রে স্বর্ণাসনে বসিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেছেন ছত্রধারী শিরে স্বর্ণ দণ্ড রাজছত্র ধরিয়া আছে· অস্ত্রধারী সৈন্যদল গঙ্গা গর্ভ হইতে শিবির পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে কাতারে কাতারে সতর্কভাবে প্রহরিতা করিতেছে, কতকগুলি

চণ্ডাল বালক অদূরে সাঁতার দিতেছে, জল ঘুরাইতেছে, সহসা রাজার অঙ্গে চণ্ডালের পাদস্খলিত জল আসিয়া পড়িল, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শান্তিরক্ষকগণ চণ্ডাল বালকগণকে বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল।

দুই প্রহরের নিদাঘ তপন অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন, অগ্নিময় বায়ু গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বহিতেছে, গঙ্গাসৈকতের বালুকা ভূমিও যেন অগ্নিময় হইয়া তক্ তক্ জ্বলিতেছে। সেই অগ্নিময় সৈকতে কতকগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ চণ্ডালবালক পরিত্রাহি পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে, উত্তপ্ত বালুকায় দগ্ধাঙ্গ হইয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে জল জল শব্দ করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মধারা, চক্ষে অশ্রুধারা, পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক বিশুষ্ক, প্রাণ যায় যায়, কাতরকণ্ঠে প্রহরীদিগকে কত অনুনয় করিতেছে, আবার তাহাদের ভীষণ হুঙ্কারে ভয়ে চুপ করিতেছে, আবার অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাঁদিতেছে, কেহই তাহাদের সে যন্ত্রণা যেন লক্ষ্যই করিতেছে না। ধন্যরে অশান্তিনিলয় শান্তিরক্ষকদল, চিরদিনই কি তোদের এই অক্ষয় নিষ্ঠুরতার একাধিপত্য সজীব রহিয়াছে? দূরে দূরে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, প্রহরীদের ভয়ে নিকটে আসিবার সাহস নাই, বালকগুলিও তাহাদের পিতামাতার রোদন ক্লিষ্ট মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া নিজের প্রাণপাত যন্ত্রণার কথা জানাইয়া জানাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। সেই বালকদলের মধ্যে একটী শিশু কিন্তু সেই উত্তপ্ত বালুকার উপর স্থির হইয়া বসিয়া কাঁদিতেছে; কোন দিকে চাহে না, শত শত অশ্রুধারা প্রবাহে প্রবাহে ঘর্ম্ম ধারার সহিত মিশিয়া অঙ্গ প্লাবিত করিতেছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ শিশুর রোদন স্বতন্ত্র রকমের সে রোদন শ্রবণে যেন কত দুঃখের উপর শান্তিধারা আনিতেছে। চণ্ডাল শিশু একমনে একপ্রাণে গালে হাত দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে—

কোথা রাম রাজীবলোচন।

আয়রে আমার প্রাণের মিতে,

একবার দেরে দরশন ॥

বালক, ডাকিতে ডাকিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে লুটাইয়া পড়িতেছে, আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া, আবার করুণ কণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে।

আয় আমার প্রাণের মিতে দেখা দিয়ে যা।
দারুণ বালুকাতে, রবির তাতে,
মরিলাম আর বাঁচি না ॥
মিতে তোরে দেখ্‌তে এলাম,
খেলায় মেতে ভুলে গেলাম,
তাই বলে কি রামামিতে
আমার কথা শুন্‌বিনা।
একবার আয়রে মিতে আমার কাছে,
তোরে দেখ্‌লে যদি প্রাণ বাঁচে,
নৈলে মলাম মলাম প্রাণের মিতে,
আর কি দেখা দিবে না ॥

ক্রমশঃ—

শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস।
কাতলামারি, মুরশিদাবাদ।

দীর্ঘ জীবন কিসে হয়?

যোগিগণ প্রাণায়াম যোগ সাধন দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। প্রাণায়াম অল্পে অল্পে সাধিতে হয়, একেবারে অধিকক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া রাখিলে বিপদ আছে, প্রাণায়াম সাধনকালে হবিষ্যাশী

জিতেন্দ্রিয় হইতে হয়, খাদ্য বলকারক গ্রহণ করিতে হয়। যিনি দিবারাত্রে পূর্ণমাত্রায় ষোড়শবার প্রাণায়াম করেন, মাস মধ্যে তিনি হংস হন, অর্থাৎ শ্বাস জয়ী হন। সৌরমানের দিবারাত্র অনুসারে মনুষ্যের পরমায়ু নহে, প্রত্যেক মনুষ্যের ২১,০০০ একুশ সহস্র শ্বাস প্রশ্বাসে এক অহোরাত্র হয়, এই পরিমাণে তিন শত পয়ষট্টি অহোরাত্র এক বৎসর, ইহার এক শত বর্ষ মানবের পরমায়ু, যাহার শ্বাস প্রশ্বাস যত দ্রুত সে তত অল্পজীবী, যাহার যত বিলম্বে হয় তাহার আয়ু তত দীর্ঘ। প্রাণায়াম যোগের দ্বারা শ্বাস দীর্ঘ ও হাল্‌কা হয়, এই জন্য প্রণায়াম অভ্যাস দীর্ঘ জীবনের মূল।

সচরাচর দেখা যায়, বাল্য বিধবাদিগের জীবন অতি দীর্ঘ বোধ করি ব্রহ্মচর্য্য বিধানই এই দীর্ঘায়ু লাভের নিদান। একাহার ও অল্পাহার দ্বারা শ্বাস যন্ত্রের প্রশস্ততা বৃদ্ধি হয়, ইহার দ্বারাই প্রকারান্তর প্রাণায়াম কার্য্য কতক পরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে। অত্যাহার, অধিক রাত্রে গুরুভোজন, আয়ুক্ষয় কর। প্রায় দেখা যায় অতি গুরু আহারের পর শ্বাস দ্রুত হয়। সুতরাং অল্পাহার আয়ুর বৃদ্ধি করে ইহা বেশ বোধ হয়। একাদশী ব্রত গ্রহণেও এই প্রাণায়াম কার্য্য কতকটা হইয়া থাকে, উহাতে রসের পরিপাক হেতু স্বাত্ত্বিক গুণ বৃদ্ধি হয় এবং পাক যন্ত্রের ক্ষুদ্রতা হেতু শ্বাস যন্ত্রের পূর্ণতা হয়।

বীর্য্যই মনুষ্যের জীবনী, বীর্য্যরক্ষাই জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে। ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য বীর্য্য রক্ষা, অন্যান্য আহারাদির নিয়ম আনুসঙ্গিক। বীর্য্য বেগ সংযমন হইতেই জীবনী শক্তি বলবতী হয়। কিন্তু বলপূর্ব্বক বীর্য বেগ ধারণ কর্ত্তব্য নহে, উহাতে বিবিধ উৎকট রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। যাহাতে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত না হয় এরূপ আহার ব্যবহার করিলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

যোগাভ্যাস, ঈশ্বর চিন্তা, পূজা, অর্চ্চনাদি, সাধুসঙ্গ, সদাচার,

াহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, সন্তোষ এবং আহার সংযম, বিলাস পরি·
.র, কুচিন্তা ত্যাগ, ইত্যাদি সদনুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল,
াত্ত্বিকতা বৃদ্ধি, ও ইন্দ্রিয় সংযম হইয়া থাকে। আহার দ্বারাই
রীর হইতেই মনের গঠন হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে আহারের প্রতি
ষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, হবিষ্য স্বাত্বিক আহার, যে সকল আহার হবিষ্য
লিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্বত্বগুণ বর্ত্তমান
াছে, সুতরাং হবিষ্য পুষ্ট দেহে স্বাত্বিকতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা
িশ্চিত।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মসুর, মাস, পলাণ্ডু, প্রভৃতি দ্রব্যাহার,
িষৎ চিন্তা, গ্রাম্য আলাপ, সুখসেব্য শয্যা, গন্ধদ্রব্য, সঙ্গীত, স্ত্রী-
ত্য; আমোদ প্রমোদ, পরিহাস প্রভৃতিই ইন্দ্রিয় উত্তেজনার কারণ।
ছুদিন এই সকল বিধি নিষেধ গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই
তেন্দ্রিয়তা আপনিই সংঘটিত হয়, নচেৎ সহস্র চেষ্টাতেও হয় না।
ঙ্গ হইতেই বাসনার উৎপত্তি, অতএব সঙ্গ সৎ করিলেই কুবাসনা
াপনিই খর্ব্ব হইয়া যায়। সঙ্গ দুই প্রকার, সাধু ও শাস্ত্র।
র্বদা সৎসঙ্গে, সদালাপে দিন কাটাইবে, যাহাতে জ্ঞান বা ভক্তির
্কাশ হয় সেই সকল গ্রন্থাদি দেখিবে, তাহা হইলেই ক্রমশঃ চরিত্র
ন্নত হইবে। চরিত্র উন্নত হইলেই সুখ, সুযশ, সারস্থ ও জীবনী
বির্দ্ধিত হয়। যাহার যত চরিত্র উন্নত, তাহার তত চিত্ত প্রফুল্ল,
প্রফুল্লতাই অনেক সময় মহা উপকার সাধন করে। কিন্তু ইহার
প্রবৃত্তি মার্গ গ্রহণ না করিয়া নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ করিবে। ইহাই
মনুষ্যের জীবন দীর্ঘ করিবার সদুপায়। জীবনকে দীর্ঘ করিতে
কলেরই যত্ন করা উচিত।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র পড়্যা।
এক্তারপুর, মদনমোহন বাড়।
পোঃ বাসুদেবপুর, (জেলা মেদিনীপুর)।

আক্ষেপ।

হে দীন সম্বল, কত কাল বল,
আর এই ভবে, হায়,
বৃথা এ জীবন, করিয়া ধারণ,
রহিব অজ্ঞান প্রায়।

পাপের কুহকে, মোহের বিপাকে,
ঘুরিয়া হইব সারা;
লালসার বশে, বিষয়ের আশে,
ছুটিব পাগল পারা!

হিংসার পীড়নে, সব কত দিনে,
দারুণ যাতনা আর,
অপরের সুখে, মন ভরা দুঃখে,
যাচিব অশুভ তার!

আত্ম গরিমাতে, স্ফীত হৃদয়েতে,
থাকিব উন্নত শিরে,
ভ্রূভঙ্গি করিয়া, আঁখি ফিরাইয়া,
লব দীন হীনে হেরে।

তুষিয়া ধনীরে, বাক্য আড়ম্বরে,
গাহিয়া সুখ্যাতি তার,
তাহার প্রসাদ, লভিবার সাধ,
ধরিব ক'দিন আর!

সংসারের রীতি, ওহে বিশ্বপতি,
এ রূপে পালিব বল,
মোহেতে মজিয়া, নয়ন মুদিয়া,
রব আর কত কাল!—
ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলে বিলাসের কোলে,
শুইয়ে সুখের আশ,

ক'দিন করিব, এ রূপে বহিব,
ইন্দ্রিয়ের ক্রীত দাস !
হে বিশ্ব পালক, কবে এ সেবক,
লভিবে নূতন প্রাণ,
ভকতির ভরে, শুধু জোড় করে,
গাহিবে তোমার গান !

দীনেরে দেখিয়া, সান্ত্বনা করিয়া,
তার দুঃখ বিমোচিবে,
আঁখি নীরে তার, অশ্রু কণা'র,
যতনে মিশায়ে দিবে !

পর উপকারে, প্রাণপণ ক'রে,
নিয়ত হইবে রত,--
জীবের মঙ্গল-- সাধনা কেবল,
করিবে জীবন ব্রত !

বিষধর ফণী, সম মনে গণি,
থাকিবে হিংসার দূরে,
লালসা ত্যজিবে, বৃথা না ঘুরিবে,
সুনাম লাভের তরে !

শুধু ও চরণে, সঁপিয়া পরাণে,
লভিয়া সুদিব্য জ্ঞান,
দিবস যামিনী ওহে গুণমণি;
করিবে তোমার ধ্যান !!

শ্রীক্ষেত্র নাথ মিত্র ।

শান্তি লাভের উপায়।

"শান্তি" "শান্তি" বলি শান্তি অন্বেষণে।
সংসার ছাড়িয়া প্রবেশি কাননে॥
কাটাও যদ্যপি অনন্ত জীবন।
শান্তি লাভ তাহে হবে না কখন॥
সুখ বিলাসিতা করিয়া বর্জ্জন।
দুঃসহ দুঃখেরে কর আলিঙ্গন॥
অভাব মোচন কর প্রীতিভরে॥
তবে শান্তি পাবে সংসার ভিতরে।
শান্তিময় এই সংসার আশ্রম।
শান্তিময়ের খেলা ভাব ত্যজি ভ্রম॥
শান্তিময় পদ স্মর অনুক্ষণ।
যদি শান্তি নীরে হইবে মগন॥
বিধৌত হইবে অশান্তি কর্দ্দম।
কাম, ক্রোধ আদি কুসঙ্গ সঙ্গম॥
নির্ম্মল অন্তরে অন্তরের ধন।
শান্তি আসি নিজে দিবে দরশন॥
লক্ষ লক্ষ বাধা বিঘ্ন মাঝে থাকি।
শ্রীহরি চরণে স্থির লক্ষ রাখি॥
কর তাঁর কার্য্য ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যজি।
আনন্দে থাকিবে শান্তি সুখে আজি॥
শান্তিময় ধামে শান্তির অভাব।
না হয় কদাচ হ'লে ভক্তি ভাব॥
ভাবের অভাবে সব অন্ধকার।
তাই শান্তি লাগি সদা হাহাকার॥
সুখ দুঃখ আর মান অপমান।
শীত, উষ্ণ লাভালাভ সম জ্ঞান॥

শত্রু যার মিত্রে অভিন্ন ভাবেতে।
সকল অন্তরে শিবত্ব ভাবিতে ॥

তবে পাবে শান্তি—জুড়াবে হৃদয়।
অশান্তির তাপ হইবে বিলয় ॥

ভ্রমিতে হবে না শান্তি অন্বেষণে।
শান্তি লাভ হবে বসি নিকেতনে ॥

শ্রীভূপতি চরণ বসু।

প্রার্থনা।

এস, এস হে মম হৃদয়ে !-
এস সুন্দর, এস হে শান্ত
এস হে কান্ত হৃদয়ে !

প্রভো ! উচ্চ প্রাসাদ নাহিক আমার
আমি, পর্ণ কুটীর বাসী,
ঝটিকা আঘাতে না হতে জীর্ণ
তুমি, বারেক দেখিও আসি।

মর্ম্ম কুসুম এনেছি তুলিয়া
সাজায়ে রেখেছি অর্ঘ্য,
অর্পণ করি চরণে তোমার
ভূতলে গড়িব স্বর্গ।

নাহি মম রম্য রতন বেদী,
তোমায়, যতনে হৃদয়ে বসাব;

সম্মুখে তব নীরবে দাঁড়ায়ে
নয়ন অশ্রু বহাব।
তোমার, তীব্র জ্যোতির শুভ্র আলোকে
রুদ্ধ আঁধার নাশিয়া,
অর্গলহীন মুক্ত দুয়ারে
দাঁড়াও বারেক হাসিয়া।
এস প্রিয়, এস মঙ্গল ময়
এস হে কান্ত হৃদয়ে
এস এস হে মম হৃদয়ে।
প্রভো! করম বিপাকে জনম লভিয়া
আসি অবনী মাঝারে,
অন্ধ নয়নে ভ্রান্ত পথিক
বন্দ বাধাই আঁধারে।
জাগাও চিত্তে তোমার শুদ্ধ
স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া,
যেন এ দীন ভক্ত হয়গো মত্ত
নিত্য তোমায় স্মরিয়া
নাশ, ইন্দ্রিয়গত অসৎ বুদ্ধি
মনের অন্ধ কামনা,
মোহের গর্ব্ব, কর হে খর্ব্ব
জুড়াই সর্ব্ব যাতনা।
জল উদ্ভূত বুদ্বুদ্ যথা
নীরবে মিলায় জলেতে,
যেন, তোমার দত্ত জীবন আমার
অন্তে মিলায় তোমাতে।
এস সখা এস অন্তর্য্যামিন্
এস হে কান্ত হৃদয়ে,
এস এস হে মম হৃদয়ে।

প্রভো! [illegible]নি আমাকে এ[illegible] সুখের রাজ্য
[illegible]মাদের কাছে তোমার বিশ্ব মাঝারে,
[illegible]লিন না। শ্যা[illegible]বিকার
[illegible]নকুমারী অব্‌ রাখিতে বদ্ধ আঁধারে।
[illegible]ন—'বড় ভাতি ব্যর্থ
[illegible]ক্ষা করিবা ইচ্ছা স্বার্থ সাধিনী,
[illegible]যোগীর গাত্রে ফরে না ত্রাস
গিয়াছে রিপুর বিষম নাগিনী।
প্রভো! জীবন প্রদীপ নিভিবে কখন
কালের বক্র বাতাসে,
যেন, শূন্য হৃদয় মন্দির লয়ে
নারই মগ্ন হতাশে।

এস প্রিয় এস মঙ্গলময়
এস হে কান্ত হৃদয়ে,
এস এস হে মম হৃদয়ে॥

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

মানকুমারী—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

শ্যামাচরণ প্রাঙ্গন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিস্ দেওয়া বন্ধ করিল এবং অনতিবিলম্বে ধীরে ধীরে মানকুমারীর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। মানকুমারী তাহাকে দেখিয়া একটু তফাতে ঘোমটা টানিয়া সরিয়া বসিলেন। শ্যামাচরণ তাঁহার এইরূপ ব্রীড়া-সঙ্কোচ

স্তাব দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, আপ চাহিনা ক্ষণিক ত লজ্জা করেন কেন ? আমরা ডাক্তার মানুষ—আ লজ্জা কিসের ?

মানকুমারী কোন উত্তর করিতে না মত্ত চিত্ত মাচরণ পুনরায় বলিল—ইনি আজ কেমন আছেন ? মা গুণ্ঠনের ভীতা হইতে ধীর কম্পিত স্বরে উত্তর করিলে র সমর্থ, করিলে নয়'।

শ্যামাচরণ তখন রোগীর নাড়ী পব র জন্য আরো একটু সরিয়া বসিল। প্রথমে রো দন্ত প্রহারে স্তার্পণ করিয়া দেখিল—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া শ্যামাচরণের মনে একটু খট্‌কা লাগিল, তাড়াতাড়ি অমনি রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার হস্তোত্তলন করিতে যাইল। কিন্তু হায় কি দেখিল ?—দেখিল হাত যেন উঠিতে চায় না। মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্যামাচরণ বুঝিয়া লইল রোগীর প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা পুত্রবধূ মানকুমারীকে যখন বলিলেন "ভয়হারি হরির কাছে তোমাকে রাখিয়া গেলাম"—তাহার পর সেই যে তিনি পুনরায় মোহ প্রাপ্ত হইলেন, সে মোহ আর ভাঙ্গিলনা। পুত্রহারা শোকাতুরা অভাগিনী জননী সেই যে আঁখী নিমীলিত করিলেন—আর চাহিলেন না। সেই নিদ্রাই তাহার শেষ নিদ্রা হইল; আ জাগিলেন না—আর জাগিলেন না। পৃথিবীর শোক, তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা আর তাঁহাকে কাঁদাইতে পারিবে না।

শ্যামাচরণ ঈষৎ চমকিত হইয়া মানকুমারীকে বলিল, একি দেখি ? এঁর প্রাণবায়ু যে অনেকক্ষণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

মানকুমারী অমনি মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক মা! মা! করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল বায়ু হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া চকিতের মধ্যে প্রতিবাসীবর্গের ঘরে ঘরে সমাচার দিয়া আসিল। কিন্তু হায়, ব্যাপার অবগত হইয়া কেহ আর সে সময়ে ঘরের বাহির হইল না। এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; একটু পূর্ব্বে বেশ এক পশলা

...ষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ এখনও মেঘে সমাচ্ছন্ন; থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। এ দুঃর্য্যোগের সময় নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে কয়জন লোক পরোপকার করিতে ঘরের বাহির হইতে পারে? বাহির হওয়া দূরে যাক, ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায় না। যদিও কোন মহাত্মা ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দেন, কিন্তু পরক্ষণে ব্যাপার অবগত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে বলিয়া ফেলেন, ভাই আমার শবদেহ স্পর্শ করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা আছে—আমার স্ত্রী অন্তঃসত্বা; নহিলে আমি নিশ্চয় যাইতাম। মরি! মরি! এমন একতা আর কোন সমাজে আছে কি? আমরা হিন্দু বলিয়া বড়াই করিয়া থাকি; কিন্তু হায় প্রতি পদে পদে আমরা হিন্দুত্বের পরিবর্ত্তে পশুত্বেরই পরিচয় দিয়া থাকি। তাই আজ আমাদের এমনদুর্দ্দশা।

এই বিপদের সময় নরাধম শ্যামাচরণ মানকুমারীর অবগুণ্ঠন মুক্ত বদন কমল নিরীক্ষণ করিয়া একেবারে মন্মথশরে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। অতিকষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া দুর্বিত্ত মানকুমারীকে বলিল, তুমি কেঁদনা—তোমার কোন ভয় নাই। যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন তুমি মনে করিও তুমি পর্বতের অন্তরালে আছ। আজ হ'তে আমি তোমার ভরণপোষণের ভার লইলাম। দুর্বিত্ত আজ প্রথম মানকুমারীকে 'তুমি' সম্বোধন করিল।

শ্যামাচরণের প্রত্যেক কথাগুলি যেন মানকুমারীর কর্ণকুহরে সূচীকা বিদ্ধ করিতেছিল। সহসা মানকুমারীর চমক ভাঙ্গিল; ভাবিলেন এখন রোদনের সময় নয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেই শেষ কথাটী তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইল—'যার কেউ নাই তার হরি আছেন—'অমনি মানকুমারী যেন কোথা হইতে কতখানি বল পাইলেন। তখন তিনি রোদন সম্বরণ করিয়া শ্যামাচরণকে ধীরে ধীরে বলিলেন, আপনি আমার পিতার স্বরূপ; কন্যাকে আজ এ দায় থেকে উদ্ধার করুন। আপনার নিকট

আমার সকাতর প্রার্থনা, যাতে আমার শাশুড়ি বাসি মরা না হ তার উপায় বিহিত করুন।

শ্যামাচরণ তৎক্ষণাৎ মানকুমারীর কথায় বাধা দিয়া বলিত ছি ছি তুমি অত কথা ব'লচ কেন? আমি এখনি লোকের সন্ধানে যাচ্চি। কিন্তু কথা হচ্চে—তুমি একলা থাক্‌তে পার্‌বে?

মানকুমারী বলিলেন—খুব পার্‌ব।

শ্যামাচরণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ লোকের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

অনতিবিলম্বে দুর্ব্বিত্ত চারিজন লোক সমভিব্যাহারে ফিরি আসিল। ইহারা শ্যামাচরণের অনুচর। সুরাপান করিতে দিব অঙ্গীকার করিয়া শ্যামাচরণ ইহাদিগকে লইয়া আসিয়াছিল শ্যামাচরণের ইঙ্গিতমাত্র ইহারা বৃদ্ধার শবদেহ লইয়া চলিয়া গেল মানকুমারী আর একবার কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎক্ষণা রোদন সম্বরণ করিয়া যথারীতি নিয়মকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক খিড়কী পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া আসিলেন।

হতভাগ্য শ্যামাচরণ এখন পর্য্যন্তও ঘরের দাওয়ায় একা বসিয়া রহিয়াছে। মানকুমারী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন আপ আর বৃথা কষ্ট পান কেন? অনেক রাত্রি হইয়াছে, আপনি বাড়ী যান। আপনার এ ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।

দুর্ব্বিত্ত শ্যামাচরণ তখন মানকুমারীর খুব নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল—তুমি অত কথা ব'লে কেন আমায় লজ্জা দাও; এতো অতি সামান্য উপকার; আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি। আর ঋণ পরিশোধের কথা যা তুমি বলচ সেত তোমারি হাতে; তুমি মনে করলে আজই—এই মুহূর্ত্তেই সে ঋণ——

এই সময়ে শ্যামাচরণের কথায় বাধা দিয়া আকাশ কড় কড় করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাইল। সে

বিদ্যুতালোকে মানকুমারী একবার ভাল করিয়া শ্যামাচরণের আপাদ মস্তক দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন—সেই মুখ—যে মুখ দেখিয়া এক দিন কত আশঙ্কার ছবি কল্পনায় মানস পটে আঁকিয়াছিলেন, সেই ভীষণ মুখ আজ যেন সত্য সত্যই তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। মানকুমারী এক পা এক পা করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাতে সরিতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্ত পুনরায় মানকুমারীকে বলিল 'তুমি অত ভয় পাচ্চ কেন?' আমা হ'তে তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তোমায় আমি যে দিন প্রথম দেখেছি সেই দিন হ'তে আমি তোমায় ভাল বেসেছি। সুন্দরী! যে যাহাকে ভাল বাসে সে কি কখনও তার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে?

ক্রমশঃ—

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

ধর্ম্ম বিদ্বেষিতা

শ্রীভক্তি পত্রিকা সাম্প্রদায়িক পত্রিকা নহে, বরং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষিতা ভঞ্জনই ইহার মূল উদ্দেশ্য। বিদ্বেষ জিনিষটা কখনই ভাল নহে, অজ্ঞতা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহার পরিণতি নরক। যিনি উপাস্য বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব জানিয়াছেন, নিজ উপাস্যে যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলা ভক্তি আছে, মতদ্বেষিতা তাঁহার মনে স্থান পায় না। যেখানে শরতের মেঘ সেখানে কেবল গর্জ্জন মাত্র সার। যেখানে যত অজ্ঞতা, মূর্খতা, অসভ্যতা, সেখানেই তত বিদ্বেষিতার অন্ধকার। বিদ্বেষিতা ব্যক্তিগত কুভাব ও প্রলাপ বাক্য মাত্র। ইহা নিতান্ত সভ্যতা বিরুদ্ধ, ইতর জন নিসেবিত, প্রকারান্তর নাস্তিকতার পরিচয় বিশেষ। উহাতে স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা

বৃদ্ধি হয় না, বরং অতল জলে নিমজ্জিত হয়। কারণ সকল উপ-
সনা নদীই সেই একমাত্র ব্রহ্মসাগরে প্রবেশ করিতেছে, ত
কোনটী সরলভাবে, কোনটী একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া, এইম
প্রভেদ। কিন্তু ভক্তি সকল সম্প্রদায়েরই মেরুদণ্ড। ভক্তিে
অনাদর করিয়া কোন মতই বা কোন সম্প্রদায়ই সাধ্য বস্তু লাভ
করিতে সমর্থ নহে, ইহাতে তর্ক নাই, অতএব ভক্তি কথাটী কাহার
বিদ্বেষের বস্তু হইতে পারে না। সৎশাস্ত্র ও সাধুজনের চরিত্রা
লোচনায় দেখা যায়, তাহাতে বিদ্বেষিতার লেশ মাত্র নাই
তবে ইহার উৎপত্তি যে অজ্ঞতম ব্যক্তির অজ্ঞতা হইতে তাহাে
সন্দেহ কি ?

সত্ত্ব রজ স্তম ত্রিবিধ গুণ, সাত্ত্বিক, রাজস, তামস, ত্রিবিধ প্রকৃ
প্রকৃতিগত আচার ও আচরণও ত্রিবিধ, ত্রিবিধ আচার ও আচ
মধ্যে সাত্ত্বিকতারই শ্রেষ্ঠত্ব আছে; অতএব ব্যক্তিমাত্রেরই স
কতার আশ্রয় গ্রহণই সুমঙ্গল। ভক্তি পত্রিকা সরলভাবে স
মতেরই সেই সাত্ত্বিক ভাগ আকর্ষণ করিয়া বিশুদ্ধভাবে
সজ্জিত রাখিতে যত্নবান, অতএব ইহাতে সাম্প্রদায়িক দ্বিধা ব
বিয নাই।

ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ সহজে নিবারিত হইতে পারে,
কিন্তু বঙ্গ সমাজে আর এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, যাহারা কোন
ধর্ম্মেরই মধ্যে প্রবিষ্ট নহে, কেবল অর্থাকাঙ্ক্ষার দুষ্পূর অনল
যাহাদের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর জ্বলিতেছে তাহাদের ধর্ম্মদ্বেষ নিবারণ
করাই বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। যেমন বনের একটী বৃক্ষে দাবানল
উৎপত্তি হইয়া সমস্ত বন দগ্ধ করে, সেইরূপ ঐ সকল ধর্ম্মদ্বেষী
অর্থলিপ্সু ঘোর সংসারী ব্যক্তি হইতেই যেন সমাজটা দগ্ধ হইতে
বসিয়াছে, এ অনল নির্ব্বাণের উপায় নাই, কারণ উহারা ধর্ম্ম-
গ্রন্থাদি মাত্র নয়নাগ্রে স্থান দেয় না, সদুপদেশ হাস্যে ডুবাইয়া
দিতে চায়, ধর্ম্ম-পত্রিকার বিমল উপদেশ তাহাদের উপর কি কার্য্য

করিবে ? তবে ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা ধর্ম্মপত্রিকা বরং এরূপ সমাজে অনেকটা কার্য্যকারিতা দেখাইয়াছে সত্য কিন্তু সমাজে এখনও আর দুর্দ্দিনের প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।

ধর্ম্মের আলোক যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রদীপ্ত বটে কিন্তু কপটাচারী ধর্ম্মধ্বজীর দল বাদ দিয়া সে পবিত্রালোক প্রভায় অল্প লোকেরই হৃদয় উজ্জ্বল দেখা যায়। আর অধিকাংশ হৃদয়ই ধনাশা বিশুষ্ক মরুভূমি—যেন কামনাকলুষিত মৃগতৃষ্ণিকা পরিব্যাপ্ত—ভীষণ—ভীষণ হইতেও ভীষণতর—কচিদ্বা ভীষণতম বিদ্বেষময় রাক্ষস রাজ্য—কচিৎ ঘোর নাস্তিকতাময়ী ঊষর ভূমি; যদিও অনেক হৃদয়ে প্রেম ভক্তির সুশীতল পূত সলীলা প্রবাহিনী তর তর প্রবাহে প্রবাহিত, কোথাও বা উত্তাল তরঙ্গময় উদ্দাম উৎসাহ প্লাবন যেন হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইবার জন্য উল্লম্ফন করিতেছে, কোথাও ক্ষীণ ধার, কোথাও ফল্গুর ন্যায় অন্তঃসলিলা। কিন্তু হায়! হায়! চারিদিকে ঘোর মরু!! ঘোর দ্বাদশাদিত্য-প্রতাপ প্রতপ্ত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। প্রচণ্ড প্রলয় মার্ত্তণ্ডের অগ্নিময়ী ময়ূখ মালায় ত্রিতাপের ত্রিমূর্ত্তি যে মূর্ত্তিমান হইয়া কত বিশাল ব্যাদিতানন বিস্তার করিয়া আসিতেছে! ভক্তির শান্তিময়ী সলিল প্রবাহ আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না! তাই হতভাগ্য স্বদেশ হিতৈষীগণের হতাশা ভগ্ন হৃদয়ের উন্মত্ত ... বিমূঢ়তার কলঙ্ক অঙ্কিত করিয়া অকালে অবসান প্রাপ্ত হইতেছে। হায়! হায়! বুঝি হিন্দু সমাজের বিশেষতঃ গৌড় মণ্ডলের এ দুর্দ্দিন দুরপনেয়, কেননা বহু শ্রমোপার্জ্জিতা বিদ্যাই যাহাদের অবিদ্যাপ্রসবিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহাদের আর সংশোধনের উপায় নাই। যে রোগী ঔষধ খাইবে না, চিকিৎসক ডাকিবে না, সে মরিবে মরুক, কিন্তু সমাজের উচ্চাসন অবৈধ অধিকার করিলেও এরূপ জন সংখ্যা সমগ্র গৌড়বাসীর নিকট মুষ্টিমেয়। সমাজে যে সকল মহাত্মাগণ ধর্ম্মার্থে জীবন দিতে

প্রস্তুত; এমন যদি কেহ থাকেন অগ্রসর হউন, ধর্ম্মে যাঁহাদে কিছুমাত্র আস্থা আছে সকলে একতা বদ্ধ হউন, যাহাতে অব সৎশিক্ষা স্রোত প্রবাহিত হয়, লোক ধর্ম্ম গরিমা বুঝিতে পারে অধর্ম্ম হইতে বিরত হয়, মঙ্গলময় ভগবানে ভক্তি করিতে শিক্ষা পায়, পরোপকারে অগ্রসর হয়, সমাজ সংস্কারে অর্থব্যয় করিতে শিখে তাহার সুপন্থা আবিষ্কার করুন। যখন সমাজের গতিবিধি যেরূপ, তখন সেইরূপ ভাবেই ধর্ম্মপ্রচার উপযোগী, এই জন্যই ধর্ম্মপ্রচারিণী মাসিক পত্রিকা গুলির বহুল প্রচার আবশ্যক, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! সমাজের উপযুক্ত সহানুভূতি অভাবে এরূপ শুভ জনক সদুপায় ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে অন্ততঃ প্রত্যেক ধর্ম্মপত্রিকায় যদি সহস্র ব্যক্তি গ্রাহক হইয়া সাহায্য করেন তাহ হইলেও ক্রমশঃ সমাজে ধর্ম্মের আলোচনা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, হায়! হায়! নিদ্রিত সমাজে সে চেষ্টা অতি দুরাশা মাত্র।

সহকারী সম্পাদক.

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো বিজয়তে তমাম॥

ঠাকুর শ্রীনরহরি ও মুকুন্দ—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পাঠক! পূর্ব্বে অবগত আছেন যে মুকুন্দ গৌড়ের বাদশাহের নিকট থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর থাকিত। অর্থাৎ তিনি সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেন। যখন তাঁহার মনের এইরূপ অবস্থা তখন একদিন তিনি বাদশাহকে দেখিতে যান। পথিমধ্যে পীড়িত বাদশাহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বাদশাহ তখন টুঙ্গিতে আরোহণ করিয়া বায়ু সেবনের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছিলেন। বাদশাহ মুকুন্দকে দেখিয়া সম্মান-পূর্ব্বক সঙ্গে লইলেন। বাদশাহের অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত

দিয়ায় ভৃত্যেরা ময়ূরের পাখার দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতে ছিলেন। ভাবের সমুদ্র মুকুন্দ, তখন যে বাদশাহের নিকট আছেন, একথা বিস্মরণ হইয়া গিয়াছেন। কারণ তখন তাঁহার হৃদয়ে এক উচ্চ ভাবের উদয় হইয়াছে। তখন তাঁহার এক মহান্ ন মুগ্ধকর চিত্রের কথা স্মরণ হইল এবং নবনীলজলদপটলসন্নিভ একটী রূপ মনে পড়িল।

আর মনে পড়িল—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কণককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে)

স্মরণ মাত্রেই তিনি ভাবে বিভাবিত হইয়া হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ লিয়া টুঙ্গি হইতে ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু মুকুন্দের নিগূঢ় প্রেম মহিমার কথা কি বলিয়াছিলেন শুনুন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম॥
বাহ্যে রাজ বৈদ্য ইহো করে রাজ সেবা।
অন্তরের প্রেম ইহার জানিবেক কেবা॥
এক দিন ম্লেচ্ছ রাজা উচ্চ টুঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥
হেনকালে এক ময়ূর পুচ্ছের আড়ানি।
রাজশিরোপরি ধরে এক সেবক আনি॥
শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হইলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গি হইতে ভূমিতে পড়িলা॥

রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হৈল মরণ॥
আপনে নামিয়া তবে করাইল চেতন॥
রাজা বলে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঁই॥
মুকুন্দ বলে অতি বড় ব্যথা পাই নাই॥
রাজা বলে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তার মহাসিদ্ধ মনে॥

যাহা হউক সতর্ক সন্তর্পণে শীঘ্রই তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ[illegible] নবাব ভাবের বৈভব বুঝিতেন। মুকুন্দের চৈতন্য হইলে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমার একি ভাব?" মুকু[illegible] কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন আমার একরূপ অপস্মার রোগ [illegible] আছে, সেই জন্য মাঝে মাঝে একরূপ মূর্চ্ছা হয়। বাদশাহ [illegible] বলিলেন "মুকুন্দ! অঙ্গে কোন আঘাত লাগে নাই ত?" মুকুন্দ বলিলেন "না"। বাদশাহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মুকুন্দের ইহা প্রেম মূর্চ্ছা। একমাত্র ভক্তির উচ্ছ্বাসেই মুকুন্দের এরকম অবস্থা। সেই হইতেই নবাব হুসেন খাঁর নিকট মুকুন্দের আরও সম্মান বৃদ্ধি হইল। কিন্তু এই ঘটনার পর আর অ[illegible] দিন মুকুন্দকে গৌড়ে থাকিতে হয় নাই। পরে তাহা ব[illegible]ত হইবে। মুকুন্দ যে এক জন গৌরাঙ্গের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তথাহি চৈতন্য মঙ্গলে—

রঘুনন্দনের পিতা শ্রীমুকুন্দ দাস।
চৈতন্য সম্মত পথে নির্ম্মল বিশ্বাস॥

আমরা মুকুন্দের কথা বলিবার সময় তাঁহার পূর্ব্ববিবৃত্ত কিছু বলিব।

ক্রমশঃ—

শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর,
শ্রীখণ্ড চৈতন্য চতুষ্পাঠী। (বৰ্দ্ধমান)।

ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ—(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

ক্ষ্যাপা। দেব! রিপুর উৎপত্তি ও দমন বিষয় সংক্ষেপে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জীবগণ তাহা প্রতি-কার্য্যে সমর্থ হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, রিপুদল দমিত হইলে কি প্রকার ভাবে উহারা সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির দেহে থাকে, বুঝিয়া একেবারেই মরিয়া যায়।

প্রেমা। বৎস! জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির হৃদয়ে কামাদি থাকে বটে কিন্তু তাহাদের পরিবর্ত্তন হয়। প্রথমতঃ উহারা আর স্বাধীনভাবে মনকে চালাইতে পারে না, তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন হইলে নিজ বিক্রম প্রকাশ করে। গৃহস্থ মুনি ঋষিগণ এই ভাবে থাকিতেন, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ক্ষেত্রাদি তাঁহাদের ছিল, পরন্তু তাহাতে একান্ত আসক্তি ছিল না, শাস্ত্রবিধি মত সংসার করিতেন, রিপুর উত্তেজনায় কাতর হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ কামাদির লক্ষ্য একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন পরম বৈরাগ্যপ্রাপ্ত ভক্তগণে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সকলই থাকে পরন্তু অন্যভাবে, যেমন সাধারণ ব্যক্তিগণের কাম আত্মপ্রীতি ও নশ্বর সম্ভোগের জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া, ধর্ম্মকর্ম্ম কুলশীলাদির প্রতি লক্ষ্য রাখে না, কিন্তু পরম বৈরাগ্যপ্রাপ্ত ভক্তগণের কামরিপু পরম বন্ধু হইয়া তাঁহার একান্ত প্রাপ্য শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য সতত চেষ্টাপর, অন্য চিন্তা, অন্য চেষ্টা এমন কি কুল, শীল, মান, মর্য্যাদা পালন ও পরিত্যাগ করাইয়া ভগবল্লাভোন্মুখ করিয়া দেয়; তখন কাম-নার বস্তু সেই প্রেমাকর শ্রীভগবানই হন। সাধারণ ব্যক্তির যেমন বিষয় সম্বন্ধে, ভক্তের ভগবৎ সম্বন্ধে সেইরূপ চেষ্টা হয়। তাঁহাকে পাইবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল, আবার না পাইলে অস্থির ও উন্মত্ত প্রায় হন। অজিত অবস্থায় কাম যেমন অনিষ্টকর, সর্ব্বথা দুঃখকষ্টদায়ক জিত অবস্থায় সর্ব্বোত্তম বন্ধু হইয়া জীবন জনম সফল করিয়া পরম

পদ পাওয়াইয়া দেয়। বৎস! এই প্রকারে কাম যদি প্রে পরিণত হইল, ক্রোধ তখন আপন ভীষণ মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া শ ভাবে সাধকের হৃদয়ে থাকেন, পূর্ব্বে কামের যেমন দুইটী অবস্থ বলিয়াছি ক্রোধেরও সেইরূপ, জিতেন্দ্রিয়গণ প্রয়োজন হইলে ক্রোধকে নিজ বিক্রম প্রকাশে অনুমতি দেন ক্রোধ অমনি আদেশ পালন করে পূর্ব্বতন ঋষিগণ দুষ্ট দলনের জন্য পা পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখাইতে ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া অভিসম্পা করিতেন। আর বিরক্ত ভক্তগণের নিকট ক্রোধ বৈরাগ্য অভিহিত হন; কামনার যাহা বিরোধী কামুক যেমন তাহার ক্রোধ করিয়া তাহারই নাশ করে বা তাহার সঙ্গ একেবারে পরি করে, ভক্তের কামনার বিষয় শ্রীভগবত্তত্ত্ব, যাহা তাহার প্রতিকূল ক্রোধ বৈরাগ্যরূপে সেই সেই ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাসক্তি দেখাইয়া ভক্তের পরমোপকার সাধন করে, অসৎ বস্তুর প্রতি প্রবল বৈরাগ্য ভাব সঞ্চিত না হইলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না, সাধন পথে বৈরাগ্য যেমন সহায় এরূপ আর কেহই নয়। ক্রোধ যেমন হিতাহিত জ্ঞানের বিলোপক, বৈরাগ্য তেমনই হিতাহিত জ্ঞান বিস্তার করতঃ সাধ্য বস্তু শ্রীভগবানে জীবকে অতিশয় আকৃষ্ট করিয়া রাখে, অনেক মহাত্মা তাই বলিয়া থাকেন "সাধন চলিতে হইলে বৈরাগ্য অসি হাতে সর্ব্বদা রাখিবে"। অতএব বৎস! যদি বুঝিয়া চলিতে পারে তবে; যাহা অনিষ্টকর তাহাই হিতকর হয়, যে বিষ প্রাণ হরণ করে সেই বিষ আবার অবস্থা বিশেষে জীবন রক্ষাও করিতে পারে। কামাদি নষ্ট হয় না, কেবল জয় করিয়া অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ ও সংযম করিতে হয়।

বৎস! লোভ অজ্ঞ জীবকেই অভিভূত করিয়া রাখে। শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে ঐ লোভ ভাবান্তরিত হইয়া নামে রুচি ও সাধুসঙ্গলিপ্সা নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি দ্বারা যেরূপ রসনার তৃপ্তি সাধিতে, যত্নবান হইত ভক্তি ভাবের

দয় হইলে শ্রীভগবানের নাম গ্রহণে ও ভক্ত সঙ্গে ততোধিক তি লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত দিবারাত্র রসনা দ্বারা শ্রীনাম ও াদি উচ্চারণ করিয়া অমৃত রস আস্বাদন করেন। লোভ হইতে যেমন অপর সকল রিপুর উদয় হয় ঐ লোভের পরিণতি নামে রুচি াম কীর্ত্তন হইতেও ভক্তের সকল সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়া থাকে।

হও ঐরূপ। আমার গৃহ, আমার পুত্র, আমার কলত্র ইত্যা-ভাবে গৃহাদিতে অত্যন্ত আকৃষ্ট মুগ্ধ জীব যেমন ধর্ম্মালোচনায় লের জন্যও যোগ দিতে সময় পায় না, কেহ সাধু সঙ্গের বলিলে অমনি উত্তর করে "মহাশয়! কখন যাইব সময় নাই।" প ভুবন মোহন শ্রীভগবানের সেবায় একান্ত নিষ্ঠাই ভক্তের াহ কেহ যদি পার্থিব বিষয়ালোচনার নিমিত্ত ডাকে বিনীতভাবে গদ্গদস্বরে বলেন "বন্ধুগণ কখন যাইব আমার সময় নাই" তিনি মোহকে জয় করিয়া ভগবৎ সেবায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন, কাজেই দিবারাত্র অষ্ট প্রহর সেবার কার্য্য ...েন। মোহ বিমুগ্ধ জীব আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্রাদি করিয়া অহর্নিশ মত্ত থাকে ঐ মত্তা-স্থায় যমদূত আসিয়া সজোরে বন্ধন করিয়া লইয়া যায় "আমার নাই কি এক্ষণে আমি যাইব না" ইত্যাদি কাতর বাক্যে ও করে না, কিন্তু শ্রীভগবৎ সেবাপরায়ণ ভক্ত যখন ইষ্ট সেবায় নিযুক্ত ও বিমুগ্ধ থাকেন, তখন যমদূতের সাধ্য হয় না তাঁহাকে স্পর্শ করে। ঠাকুর সেবার কার্য্যও মোহ বটে বিষয় মোহের ন্যায় দুঃখদ নয় কিন্তু ইহা পরমানন্দপ্রদ ও পরিণামবিরস দুঃখজনক অজ্ঞতার বিকাশক। তাই ভক্ত প্রার্থনা করেন "বিষয়ী যেমন বিষয়ে মুগ্ধ, হে পতিতপাবন! কবে আমি সেইরূপ তোমার কার্য্যে, তোমার সেবায় বিমুগ্ধ হইব।"

বৎস! মদ বলিতে অহঙ্কার পূর্ব্বে শুনিয়াছ, ঐ অহঙ্কার যে রম শত্রু তাহাও জান। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে অহঙ্কারও

অন্য রূপ ধারণ করে, "আমি ভগবানের দাস," আমি "শ্রীহরির সখা," আমার কৃষ্ণ ইত্যাদি অভিমানের উদয় হয়। দাস্য, সখ্য, মধুর ও বাৎসল্যাদি ভাবের পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইলে এই মদের (অহঙ্কারের) উদয় হয়, ঐরূপ ভাবের নিষ্ঠায় ভক্ত মহা বলবানের ন্যায় বলিয়া থাকেন "রে কামাদি রিপুগণ! আমার প্রতি তোঁদের অ[illegible] নাই, আমি হরিদাস।" বৎস! বলিবার সময় হইল না, সং[illegible] বলিলাম, তোমরা আলোচনা করিয়া বিশদরূপে ভক্তগণকে [illegible]ইয়া দিও ভাবের নিষ্ঠায় যে অহঙ্কার হয় তাহা সকল বিঘ্ন, বিপত্তি নাশ করে।

এইবার মাৎসর্য্য। মাৎসর্য্য ভক্তের শরীরে অন্যভাবে স্থান করে, ভক্ত নিজের পাপ স্মরণ করিয়া হতাশ হয় আব[illegible] শ্রীভগবান অসংখ্য পাপীকে উদ্ধার করিয়াছেন মনে কর[illegible] ঈর্ষ বশত প্রাণের আবেগে বলেন, পতিতপাবন! তুমি আমা[illegible] দয়া করিবে না কেন? তুমি মহাপাপী অজামিলকে তরাইয়[illegible] বালক ধ্রুবকে দেখা দিয়াছ, বিদুরের ক্ষুদ খাইয়া প্রীতিলাভ কর[illegible]য়াছ, চণ্ডালকে কোল দিয়াছ, অতি কপট খল কালীয়কে চ[illegible] দিয়াছ, আমায় দিবে না কেন? এইরূপ ঈর্ষাভাবে ভক্তের শরী[illegible] মাৎসর্য্য বাস করে, বৎস! এই সংক্ষেপে তোমাকে ষড়রি[illegible] যাহা বলিলাম শ্রদ্ধার সহিত যে ব্যক্তি ইহার তত্ত্ব চিন্তা করিবে নিশ্চয় কামাদি রিপুর হাতে তাহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে না, এক্ষণে বুঝিলে রিপু মরে না, ঐরূপে থাকে। বৎস ক্ষ্যাপাচাঁদ! এক্ষণে বিশ্রাম কর, আজ আর সময় নাই, নিত্যক্রিয়ার সময় হইয়াছে পরে যাহা জানিবার থাকে জিজ্ঞাসা করিও।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

ভক্তি।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্নকর্ত্তৃকসম্পাদিত।

শ্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

খণ্ড ফাল্গুন মাস ১৩১০। ৯ম সংখ্যা।

হাবড়া, রিলায়ান্স প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভক্ত মণ্ডলীর সাহায্যে—ভবানীপুর—

শ্রীভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দ রূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা

অপার সংসার সমুদ্র-মধ্যে
নিমজ্জতোঽনন্ত বিপত্তরঙ্গে॥
বিপন্নবন্ধো কৃপয়া ত্বদীয়ে
পাদারবিন্দে শরণং বিধেহি?

হে দীননাথ! আমি ঘোর সংসার সমুদ্রে নিপতিত, নানাবিধ বিপদরূপ-তরঙ্গে সর্ব্বদাই তরঙ্গায়িত হইতেছি, কি করি—কেমন করিয়া এই তরঙ্গের তীব্র আঘাত হইতে রক্ষা পাইব তাহা জানিনা; এক একবার একটুক যেমন স্থির হইব হইব মনে করি অমনি ভয়ঙ্কর বেগে তরঙ্গ আসিয়া একেবারে কোথায় লইয়া যায় তাহার সীমা থাকে না, অনন্তকাল ভাসিতেছি তবু পার পাই না এই দুনিবার বিপদ তরঙ্গে স্থির থাকিবার অবলম্ব কিছু আছে কি না জানিনা, এক একবার স্থির হইব বলিয়া যাহাকে ধরিতে যাই বা ধরি—আমারই ভাগ্যদোষে তাহাও আমারই মতন চঞ্চল ও বিপন্ন। হে বিপন্নবন্ধো! তোমা ভিন্ন বিপদে রক্ষা করে এমন আর কেহই নাই, আমায় তোমার শান্তিময় অভয় পদে আশ্রয় দাও তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় পাইয়া চিরদিনের মত আমার মন স্থির হউক—প্রাণের আশা পূর্ণ হউক শান্তিলাভে হৃদয় শীতল হউক, আশা যাওয়া ঘোরাফেরা বন্ধ হইয়া যাউক----

বুঝিতেছি আমার সাধন ভজন নাই সেই জন্যই দুঃখ পাইতেছি

কিন্তু কৈ পাতকীতারণ হে অনাথ নাথ! তুমি কৃপা করিয়া সৎপ্রবৃত্তি দাও, আর ঘুরিতে পারিনা, আর যন্ত্রনাও সহেনা, কতকাল ঘুরিলাম কত ভাবিলাম, কত কি কর্ম্ম করিলাম, ও কর্ম্মফল ভোগ করিলাম, কিন্তু কৈ? কর্ম্মের শেষ নাই দুঃখের অবধি নাই ঘোরারও বিরাম নাই। তাই বলি মনের দুঃখ বুঝিতে প্রাণের ভাব জানিতে যথার্থ অভাব ঘুচাইতে তোমা ভিন্ন আর আমার কেহই নাই তোমার শ্রীচরণে শরণ লইলাম আশ্রয় দাও কিম্বা যাহা করিতে হয় কর আমি আর ভাবিতে পারিনা। মনের ভাব সকলই বুঝিতেছ তোমায় আর বলিয়া কি জানাইব? হে দীনবন্ধো! এই দীনহীন তোমারই ভরসায় তোমারই কৃপার প্রতি চাহিয়া আছে দীনের তুমিই আশা, তুমিই ভরসা, তুমিই সহায় তুমিই সম্পদ, দেখ যেন আমা হ'তে তোমার দীনশরণ নামের কলঙ্ক না হয়।

দীনবন্ধু

সংসারে সুখ।

সংসারে থাকিয়া বিমল সুখ লাভ হয় কিনা; ইহাই আমার প্রশ্ন। উত্তরে সন্ন্যাসী বলিবেন হয় না, গৃহাসক্ত বলিবেন হয় না, কিন্তু ভক্ত বলিবেন, যে বিমল সুখ অনুসন্ধান করে, তাঁহার সংসার বা সন্ন্যাস কি? সর্ব্বত্রেই তাঁহার সুখ। সংসারী দুই প্রকার, বদ্ধ সংসারী ও মুক্ত সংসারী। বদ্ধ সংসারীর সুখ বাসনা নানা মুখে ধাবিত হয়, তাঁহার দুঃখ তাড়ণাও নানামুখে আগমন করে। যে সুখ নশ্বর পরিনামী বস্তু সম্বন্ধীয়, তাহা ক্ষণিক অথচ দুস্পূর, একটীর ভোগে তৃপ্তি আসিলে আর একটীর জন্য লালসা হয়। যে খানে লালসা সেখানেই উদ্বেগ, সেখানেই হতাশা নিরাশা, তবে আর সুখ কৈ? সংসারীর সুখের প্রলোভন এত অধিক যে প্রতি মুহূর্ত্তে এক একটী ভোগ করিয়াও শেষ হয়না। আত্ম ভোগ ইচ্ছা মাত্রেই পূর্ণ হয়না, উহা সুকৃতি অর্থাৎ পুণ্য সাপেক্ষ। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত

পুণ্য ফলে, ফলানুরূপ ভোগ হয়। যাহার যেমন ভাগ্য তাহার তেমন ভোগ আপনিই সংযোজিত হয়, সুতরাং ভোগ যখন কর্ম্মায়ত্ত্ব ইচ্ছায়ত্ত্ব নহে, তখন ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। লোভ বাড়ে, আশা বাড়ে, কিন্তু সুকৃতি বাড়েনা; লব্ধব্য বস্তু যাহার যেমন ভাবী, তাহার তেমন লভ্য হয়, অতএব উত্তরোত্তর সুখাশা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন বদ্ধ সংসারীর একটী কষ্টময় নরক মাত্র।

মুক্ত-সংসারী সর্ব্বকাল সর্ব্বাবস্থাতেই সুখী, যাহার সুখ বাসনা নিত্য বস্তুতে নিবদ্ধ, সে নিত্য সুখী অসম্ভব কি? মুক্ত সাংসারীর সুখ হরিতে আত্ম সমর্পণ, হরিতে আত্ম- ভোগা- র্পণ, কৃষ্ণ সুখে সুখ বোধ। ঐহিক সুখের অসারত্ব জ্ঞান, নিত্য সুখানুসন্ধান, কুচিন্তায় অবসর, হরি চিন্তায় কালক্ষেপ, নশ্বর বস্তু বিরাগ, হরি নিষ্ঠা, আশাবদ্ধ, দর্শনাকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্ত্যুপায়ানুসন্ধান, রূপ ধ্যান, গুণানুবাদ লীলা স্মরণ, নাম গুণ লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মৃতি মননাদি, অর্চ্চনা, শাস্ত্রালাপ, সৎসঙ্গ, সদাচার, সদালাপ, কুসঙ্গে বিরাগ, কুবাসনা ত্যাগ, ইন্দ্রিয় দমন, চিত্তশুদ্ধি,, কৃষ্ণ নির্ভর, অর্থোপার্জ্জন লালসা সংক্ষেপ, যদিচ্ছা লাভে সন্তোষ, মিতব্যয়, সদুৎসব করণ, ইত্যাদি মুক্ত সাংসারীর সুখ।

সংসার ত্যাগ করিলে, সংসার ত্যাগ হয় না, সংসার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে। ঘর, বাড়ী, ক্ষেত্র, বিত্ত, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, ব্যবহার্য্য প্রিয় দ্রব্য, ইহারই মিলিতকে সংসার বলে, অনেকে ইহা ছাড়িয়াই সন্ন্যাসী হইতে চাহেন, কিন্তু উহাই প্রকৃত সংসার নহে, সংসার আত্ম সুখ রত নিজের দেহ, দেহের সম্বন্ধেই ইহাদের সহিত বদ্ধ সম্বন্ধ। আত্ম সুখী দেহ লইয়া এ সকল ছাড়িয়া বাহির হও, ঐ পাপ দেহ আবার সংসার পাতিয়া লইবে। অতএব অগ্রে আত্ম সুখ কামনা ছাড়, তবে সংসারে থাকিয়াই সুখী হইতে পারিবে।

অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ কর, নিস্পৃহ হও, আছে বেশ,

যাইলেও দুঃখ নাই। যাহা শরীর ধারণোপযোগী, যাহাতে কোন প্রকারে নির্ব্বাহ হয়, তাহাই যথেষ্ট, অধিক প্রত্যাশা নাই। আত্ম সুখ স্পৃহা শূন্য হইয়া ভগবৎ ভৃত্য বোধে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ, নিত্য পোষ্য পোষণ কার্য্যে কৃষ্ণ নিয়োগ জ্ঞান, পরোপকারার্থ জীবন ধারণ, পুত্রোৎপাদন মাত্র স্ত্রী সঙ্গ প্রয়োজন, দেহ রক্ষা জন্য আহার, শীতাতপ বৃষ্টি নিবারণ জন্য গৃহ, পর পোষণার্থ অর্থোপার্জ্জন, অভাবে সন্তোষ, অধিক লাভে নিস্পৃহতা, সমভাব, মিষ্টবাক্য, ক্ষমা, দোষ পরিহার, পর গুণানুবাদ, পর গুণে প্রীতি, প্রত্যুপকার, উপদেশে আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, সারল্য, কাপট্য বর্জ্জন, হিত কথন, পর নিন্দাত্যাগ, শত্রু মিত্রে সমভাব, মনেও পরানিষ্ট কল্পনা ত্যাগ, দুর্ব্বাক্য ত্যাগ, দুর্ব্বাক্য বাদীকে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, সদানন্দ ভাব, এই সকল গুণ মুক্ত সাংসারীর সুখের হেতু। সুখ দুঃখ মনের বিকার মাত্র, যাহার মন নির্ব্বিকার তাহার মনে সদানন্দ ভাব নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

কতকগুলি এমন ভয়ঙ্কর বদ্ধ সাংসারী ব্যক্তি আছেন, কেবল স্বার্থ আর বিদ্বেষ মাত্র তাঁহাদের সঙ্গী। উহারা স্বার্থ জন্য বিনা কারণে অনায়াসে সৌহৃদ্য ভঙ্গ করে, পৃথিবীতে কেহই তাহাদের মিত্র নাই, হাতে পাইলে তাহারা কাহারও অনিষ্ট করিতে ছাড়েনা। সেই সকল ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রায় হিংস্র ব্যক্তি অতি কুটিল স্বভাব, সহস্র উপকার, সহস্র সৌহৃদ্য, সহস্র দান, সহস্র আনুগত্য কর কিছুতেই তাহারা কাহার বাধ্য নহে, মৌখিক মিত্রতা তাহারা সকলের সহিতই করে, কিন্তু তাহাদের অনিষ্ট কার্য্য করিয়া কাহারও পরিত্রাণ নাই। মুক্ত সংসারীগণ প্রায় এই সকল সর্ব্বভুক হিংস্র প্রাণীর গ্রাসে পতিত হন, কারণ সরল ব্যক্তি দেখিলে তাহারা তাঁহাকে নিজের স্বার্থ নিমিত্ত পীড়ন করে। পল্লী গ্রামেই ইহা অধিক দেখা যায়, সভ্য স্থানে কিছু কম। অতএব এরূপ হিংসকের হস্তে সরল সদ্‌গুণ সম্পন্ন মুক্ত সাংসারীগণ নিশ্চয় পতিত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইবেন না, যে ব্যক্তি উপদ্রুত

হইয়াও উপদ্রব করে না, ভগবান তাহার প্রতি উপদ্রব কারীকে ভয়ঙ্কর নিগ্রহ করেন। মুক্ত সাংসারী ব্যক্তি সমুদয় ঐহিক সুখ দুঃখ পদে দলিত করিয়া নিত্য সুখময় রাজ্যে বিচরণ করেন। গৃহী মাত্রেরই ইহাঁদের আদর্শ অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত সুখের মুখ দর্শনে ইহাই প্রকৃষ্ট সদুপায়।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র পড়িয়া —
এক্তার পুর মদন মোহন বাড়।
পোঃ বাসুদেব পুর। মেদিনীপুর

বৈষ্ণব ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

দেখিতে হইলে হিন্দুর কি ধর্ম্ম সমাজ কি লৌকিক সমাজ সমস্তই কাল মাহাত্ম্যে বা নৈতিক অনবধানতা ও স্বার্থপরতা দোষে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। আমাদের এ প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব সমাজ, অতএব বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও অন্য সামাজিক আলোচনার অবকাশ নাই। সকল ধর্ম্ম সমাজেই যদিও বিশিষ্ট গুরু পদবীর প্রয়োজনীয়তা অক্ষুণ্ণ, কিন্তু বিশেষ প্রবেশ করিয়া দেখিলে বৈষ্ণব সমাজের ভজন ব্যাপারে প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ সকল অবস্থাতেই গুরুর সহিত ওতঃপ্রোতঃ সম্বন্ধ। বৈষ্ণবের ইহ পর লোকে সমানভাবে গুরুর অনুগতি। বলিতে হইলে গুরু লইয়াই বৈষ্ণবের সব কিন্তু গুরু শিষ্য উভয় দলেই ইহার অব্যবহার ও অপব্যবহার দেখিতেছি। বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজ যেন এই মুল তত্ত্বে উদাসীন কতকগুলি উৎপথ গামী, ভ্রান্ত ও নারকীয় বিলাস পর। উপযুক্ত গুরু, শিষ্য, সাধন ও শাস্ত্রানুশীলন অভাবে বৈষ্ণব সমাজ ক্রমে এই ভ্রষ্ট দশায় উপনীত হইয়াছেন। গুরু অনুগত সাধন, সাধনানুগত সিদ্ধি, বৈষ্ণব সমাজ ইহা বিস্মৃত হইয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ ও বেশ মাত্র সম্বল হইয়াছেন, সাধন রাজ্য হইতে বহুদূরে উড়িয়া পড়িয়াছেন, পক্ষবল হারাইয়া কেবল দুর্ব্বল

পক্ষপুট নারিয়া ঝটাপটী করিতেছেন, উর্দ্ধগতির শক্তি নাই। কি গুরু কি শিষ্য কি গৃহী কি উদাসীন কোন স্থলেই আর সিদ্ধবল নাই, যে সমাজ এক সময় জ্ঞানাকাশ ছাড়াইয়া চিদাকাশের অন্তঃসীমা দর্শন করিয়াছেন, সেই সমাজ এখন অবশ দুর্ব্বল পক্ষ লইয়া ভণ্ডামীর কর্দ্দমে পড়িয়া লটাপটী করিতেছেন। অন্তরের উন্নতি সাধনে অনাদর করিয়া বাহিরের উন্নতি প্রদর্শন প্রয়াসকে ভণ্ডামী বা কাপট্য বলে, ইহাতে লিপ্ত নির্লিপ্ত কে তাহা একবার বৈষ্ণব মাত্রেই মনে মনে বুঝিয়া বিশুদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবেন এ আশা কি আমরা করিতে পারি? যদি সে আশার কোন আশ্বাস থাকে, তাহা আমরা সুশিক্ষিত সমাজেই প্রত্যাশা করি যাঁহারা কেবল নাচিয়া গাইয়া মচ্ছব খাইয়া বৈষ্ণবত্ব পালনের প্রয়াসী, তাঁহাদের নিকট আমাদের কোন আশা নাই। কিন্তু এক সময় এমন দিন ছিল, সেদিন পণ্ডিতে মূর্খে সমান উন্নত হৃদয় বহন করিত। সেকালে কনিষ্ঠাধিকারী উত্তমাধিকারীর অনুগত হইতেন, এখন সেদিন নাই, এখন পণ্ডিত হইলে বৈষ্ণব সমাজের চক্ষুর বালী হইতে হয়, বৈষ্ণবের সাধারণ বিশ্বাস বিদ্যাটা একটা ভজন কণ্টক। হায় হায়! এই মহান্ সমাজের পূর্ব্ব গৌরব যিনি কিছুমাত্রও অবগত আছেন, এই সকল দুরবস্থা দেখিয়া তিনি না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন কই? কিন্তু কই? কাহারও নয়নেত সে বারিকণা দেখি না? অধিকন্তু অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন। তবে কি বাধ্য হইয়া বলিব বৈষ্ণব সমাজের অপূর্ব্ব পূর্ব্ব গৌরব সমাজের অগোচর? ইহার অধিক আর অবনতি কি? মিথিলা হইতে সুদূর উড়িষ্যার সমগ্র দক্ষিণ প্রান্ত যে ধর্ম্মের প্রবল তুফানে এক সময় সমান তরঙ্গিত হইয়াছিল পশ্চিম রাজস্থানের প্রবল প্রতাপ স্বাধীন রাজগণও একদিন যে পূত বারি মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ভারত ব্যাপী বৈষ্ণব ধর্ম্ম, যাহার প্রবাহে ভজন রাজ্য কাশীধামও টলিয়া গিয়াছিল, সেই গৌড়দেশের গৌরব সীমা বৈষ্ণব ধর্ম্ম এখন

গোড়ীয় সমাজের বিদ্বেষ নিদান কেন হইল? এমন অবনতির মুল নিদান কি? একবার কি কেহ তাহার জন্য ভাবনা করিবেন না? আহা! এরত্নের কি আর অনুসন্ধান হইবে না?

এখন আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব ও দেখাইব, কাহার দোষে ইহা অন্যান্য সমাজের নিকট বিদ্বেষের বস্তু হইল? কি কারণেই বা এই মহান্ ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ঘটিল। এই সকলের কারণ মুলে প্রধানতঃ গোস্বামী বংশ ও ঠাকুর সন্তান গণ দায়ী। একেত তাঁহারা স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্ম্মের আচরণ বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুশীলন ছাড়িয়া দিলেন, তাহাতে আবার সমুদয় বৈষ্ণব শাস্ত্র গুলি তাঁহাদেরই হস্তে অব্যবহার্য্য রূপে অবরুদ্ধ রহিল, সুতরাং তাঁহাদের প্রধান কার্য্য যে "আচার ও প্রচার" তাহা বিলুপ্ত হইল। গুরুবংশে সকলেই যে বিদ্যা শূন্য তাহা নহেন, অনেকেই পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু অর্থলিপ্সা লোকরঞ্জন আর অতত্ত্বগ্রাহিতা দোষে তাঁহারা বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছাড়িয়া গৌণ উদ্দেশ্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন; গোস্বামী শাস্ত্র ডোর বদ্ধই থাকিলেন, ভক্তি শাস্ত্রের মধ্যে থাকিলেন কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা, উহাতে শ্রীমদ্ভাবতের কাহিনীর ভাব লইয়া কেবল মুখ ভাগবতি হইত; ভক্তিসিদ্ধান্ত নিরস বলিয়া পরিত্যক্ত হইত গলাবাজিতে যাঁহার কৃতিত্ব তিনিই সমাজে আদর পাইতেন ইহা যেন একটী সংগীত রসের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল কথকেরাও মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত লোকানুরঞ্জন আর অর্থোপার্জ্জন মাত্র ফল পাইতেন। যাই হউক কথকতা বা মুল ব্যাখ্যা যে কোন প্রকারে কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যবসাটী রহিল, গুরু বংশগণ ইহাতেই অধিক লাভ দেখিয়া, কেবল ভাগবত লইয়াই ব্যবসা করিতেন। কোন অর্থবান্ ব্যক্তি যদি কখন কোন কালে প্রভূত টাকা দিতে পারিত তাহা হইলেই সকলে কিছু শুনিতে পাইত। এরূপ কালে ভদ্রে কচিৎ আলোচনা আলোচনাই নয়, উহাতে কেহ কোন ফল আছে বলিয়া বিশ্বাস করিলেও, আমি বলি

কালে ভদ্রে ভোজ বাড়িতে একদিন ঘৃত দুগ্ধ খাইয়া যদি তাহার পুষ্টিকবস্থ সাধিত হয়, তবে এইরূপ কালে ভদ্রে একদিন ভাগবৎ শুনিনয়াও লোকেরফল হইতে পারে। বলবান হইতে সাধ করিলে নিত্য ঘৃত খাইতে হয়, পুষ্ট হইতে বাসনা হইলে নিত্য দুগ্ধ পান আবশ্যক, শুদ্ধ ভক্তিলাভের ইচ্ছা রাখিলে নিত্য ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়, এবং তাহার [illegible] করিতে হয় ভক্তি লাভ অতি দুর্ল্লভ বস্তু, উহা এত সহজ সাধারণে করা ভক্তিকে অনাদর করা মাত্র। এরূপ একটী পাঠ দেওয়া কেবল বাহাদুরী করা, আর এরূপ একদিন পাঠ শুনিয়া ভক্তিলাভ করা কেবল বিডম্বনা মাত্র। প্রণয়াশক্ত যেমন প্রেমাস্পদকে তিল মাত্র বিস্মৃত হইতে পারে না নিয়ত তাহারই কথা লইয়া থাকে, ভক্তও সেই রূপ ভগবানের কথা লইয়া কাল কাটায়, তিলার্দ্ধ ভুলিতে পারেনা, ইহাই ভক্তি। চতুঃষষ্ঠী প্রকার ইহার সাধনাঙ্গ, এই সাধন ভক্তির সাধন করিয়া সিদ্ধ ভক্তি লাভ করিতে হয়, অতএব উহার আচার প্রচার কিরূপ গুরুত্ব যুক্ত গুরুগণ তাহা একবার মনে স্থানও দিতেন না, দিবার আবশ্যক বোধও করিতেন না, তাঁহাদের জীবোদ্ধার প্রবৃত্তি থাকিলে এরূপ অর্থোপার্জ্জন পথ প্রশস্ত করিবার প্রবৃত্তি হইত না।

যাহা হউক ভক্তি শাস্ত্রের মধ্যে থাকিলেন কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা। কিন্তু যাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের সারতত্ত্ব সঙ্কলিত আছে, যাহাতে ভজন তত্ত্ব নিরূপিত আছে, যাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর প্রভৃত সর্ব্ব জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা আছে, সেই সকল সাধক সুহৃদ গোস্বামি শাস্ত্রের অনুশীলন না থাকায় সাধন পথ বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল। এমন কি হরিভক্তি বিলাস বৈষ্ণব স্মৃতি, যাহা বৈষ্ণবের নিত্য প্রয়োজনীয় তাহাও সকলে ভাল করিয়া দেখিত না। অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থের কথাই কেহ জানিত না, গোস্বামী গ্রন্থ ভিন্ন আরও ভক্তি শাস্ত্র যাহাতে শ্রীনরোত্তম, বিশ্বনাথ প্রভৃতি

পরবর্ত্তি মহাত্মাগণ জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ভাবী কালের জন্য বৈষ্ণবের ভজন ক্রম, সুবোধগম্য ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহার কতকগুলি ভাষা কতকগুলি সংস্কৃত কিন্তু সকল-গুলিই ক্ষুদ্রাবয়ব। এই অপরাধে সেই সব অমূল্যরত্ন বড় বড় গ্রন্থের পশ্চাতে পড়িয়া পচিতে লাগিলেন, তাহার সন্ধানই রহিল না।

যাঁহাদের হস্তে শাস্ত্র, তাঁহারা শাস্ত্রালোচনাটা কেবল অর্থাগম পন্থা বলিয়া মনে করিলেন, আরও মনে করিলেন অনেক টাকা না পাইলে ইহা কাহাকেও শুনাইতে নাই, কিন্তু যে সকল মহান্‌গণ উহার জন্য জীবন পাত করিয়া লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের ভাবী ব্যবসার সাহায্যার্থ তাহা করেন নাই। আহা! পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ একবার ভাবিলেন না যে, জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শাস্ত্রকারগণ কি নিঃস্বার্থ ব্যবহার করিয়াছেন, আর আমরা কি করিতেছি। এই অর্থাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়াই তাঁহারা অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রের অনুসন্ধান মাত্রও রাখিলেন না, সুতরাং অর্থাগম সুলভ ভাগবৎ মাত্র নানা আকারে চলিত রহিল, আর সমস্তই লুপ্ত হইল। শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থে ভক্তির প্রকৃষ্টতা যতদূর নিরূপিত হইয়াছে, অন্য কোন শাস্ত্রই তাহার তুলনার যোগ্য নহে, ভক্তি সিদ্ধান্ত এক শ্রীমদ্ভাগবতেই যথেষ্ট লাভ করা যায়, তথাপিও যখন এত শক্তি দিয়া শ্রীমহাপ্রভু গোস্বামী-গণকে গ্রন্থ লেখাইয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহার কোন বিশেষ রূপ প্রয়োজনীয়তা সম্ভব; অকারণে গোস্বামী শাস্ত্রাবলি নির্ম্মিত হয় নাই। বৈষ্ণব, ভক্তির সিদ্ধান্ত অবগত হইলেই কার্য্য হইলনা, ভক্তির সাধনের আবশ্যক। সেই আবশ্যকীয় সাধন ক্রম প্রদর্শনই গোস্বামী শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। গোস্বামী শাস্ত্রে, কেবল সাধ্য সাধন তত্ত্ব ও সাধন ক্রম, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহাই মাত্র নহে, রাগ মার্গীয়

ভক্তির সাধন জানিতে হইলে গোস্বামী শাস্ত্র ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এখন গোস্বামী শাস্ত্রের সংগোপনেই বৈষ্ণব সমাজের অধঃপতন, ইহা কে না স্বীকার করিবেন, সুতরাং সে দোষের বোঝা আমাদের প্রভুপাদগণের উপর না চাপাইয়া কাহার উপর চাপাইব ?

দ্বিতীয়তঃ অভ্যাগত বৈষ্ণবগণও ইহাতে দোষশূন্য নহেন, শ্রীপাদ গোস্বামীগণ যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অভ্যাগতগণও সেইরূপ বৈষ্ণব সমাজের আদর্শ, আদর্শে দোষ পড়িলে তাহা অতি শীঘ্রই বহু ব্যাপক হইয়া পড়ে, নানা কারণে তাহাই হইল। একতঃ তাঁহারা অধিকাংশই নিরক্ষর, তাহাতে আবার গুরুবংশ নিস্প্রভ হওয়ায় তাঁহারা অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া পড়িলেন সুতরাং বৈষ্ণব সমাজে পণ্ডিত দ্বেষিতার বীজ তাঁহাদের কর্ত্তৃকই প্রথম রোপিত হয়। ইহাঁরা জাতি, বিদ্যা, মহত্ব প্রভৃতিকে ভক্তিকণ্টক বলিয়া বড়াই করিতেন, কারণ এসকলের বড়াই থাকিলেতাঁহাদের বড়াই থাকে কই ? বেশের গুণে আর দেশের গুণে সেই কথাই বেশ মিষ্ট হইল, বিদ্যাশূন্য প্রতিষ্ঠা প্রিয় গৃহস্থ বৈষ্ণবগণও দেখাদেখী সেই ধুয়া ধরিলেন। অধিকন্তু গৃহস্থ বৈষ্ণব মহাত্মাগণ গুণাপেক্ষা বেশের ও অন্তঃশৌচাপেক্ষা বাহ্য শৌচের আদর অধিক দেখাইতে লাগিলেন, রাগ পথের মানসী সেবা, মানসী ভজন, ছাড়িয়াদিয়া কেবল বাহ্যিক মৌখিক ভজনের পক্ষপাতী হইলেন, রাগের ভজন গেল। কেবল তিলক, ছাপা, কণ্ঠী, শ্বেত বস্ত্র,উর্দ্ধবস্ত্র, স্থূল শিখা ধারণ, মালার ঝুলি হস্তে ভ্রমণ ও দশ পাঁচজন একসঙ্গে বসিয়া জপমালা হস্তে খোষগল্প, ক্বচিৎ কীর্ত্তনের গানের বা ভাগবতের কথকতার সভায় দুই চারিটী সঞ্চারী ভাবাভাস প্রকাশ, সংকীর্ত্তনে অহংগ্রহ বুদ্ধিতে দম্ভময় উল্লম্ফন, আর সময় সময় চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, মহাপ্রসাদ সেবন ইহাই মাত্র বৈষ্ণবীয় ভজন, আর দম্ভময় বাহ্যশৌচ, বৈষ্ণবে অস্থায়ী প্রীতি, তদিতরে স্থায়ী বিদ্বেষ, এইমাত্র বৈষ্ণবাচার, এই প্রকারের বৈষ্ণবতা মাত্র

—সমাজে বৈষ্ণবতা বলিয়া পরিচিত রহিল; মুখ্য মুখ্য ভজনাঙ্গ, বিশুদ্ধ রাগের অনুগত ভজন পথ বিলুপ্ত হইয়াগেল। রাগানুপথ ভক্তিই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্য, গাঢ় অনুরাগে ইষ্ট সেবন ও অনুরাগ নয়নে ইষ্টমূর্ত্তি স্ফূরণ, ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃষ্টতা, এই মহৎ গুণের নিকটেই ভারতের অন্যান্য ধর্ম্ম সমাজ হেট মুণ্ড হইয়া ছিলেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব জীবের কলি রোগ শান্তির ইহা মহৌষধ স্বরূপ দান করিয়া বৈধী শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুপান স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু বিকৃত বৈষ্ণব সমাজ মহৌষধ হারাইয়া অনুপানের মধু টুকু লেহন করিতে লাগিলেন। রোগ শান্তি হইবে কেন? রোগত বৃদ্ধি হইলই, অধিকন্তু বিবিধ উপসর্গের উৎপত্তি হইয়া অধঃপতনের পথ আরও প্রশস্ত হইল। অতএব এই অধঃপতন মূলে গোস্বামী, ঠাকুর সন্তান, অভ্যাগত, গৃহস্থ বৈষ্ণব, কেহই দোষ শূন্য নহেন।

ক্রমশঃ।

সহকারী সম্পাদক।

নাম-গান।

কালের বাতাস আসে, প্রাণ কাঁপিছে ত্রাসে,
পারের তরে, কি লইলি ভাইরে।
ভাবরে ভাই, ধন জন, কিছু নহে আপন;
একা আসি একা চলে যাইরে॥
পদ্ম পত্রে যথা জল, জীবন চঞ্চল,
দেখিতে দেখিতে হবে লয়রে।
অন্তিমের সম্বল কি করেছ বল,
এড়াতে শমন শাসন ভয়রে॥
অমৃত আকর, মধুর রস সার,
হরি নাম ধর ধর ভাইরে।

নাম তরণী নিলে,　　অনায়াসে যাবে চলে,
নাম বই আর কিছু নাইরে॥
নামে ত্রিতাপ হরে　　পুলক সঞ্চারে,
হরষে ভরে হিয়ে মনরে।
নাম সুখ, নাম শান্তি,　　নামে ঘুচে মোহ ভ্রান্তি,
নাম স্বর্গ, নাম তপ ধনরে॥
দেখ ভাই নামের বলে,　　কতপাপী অবহেলে,
চলে গেল ভবপারে ওইরে।
নাম মহামন্ত্র পেয়ে,　　যতনে ধর হৃদয়ে,
নাম বিনে গতি আর কইরে॥
বল রাধাকৃষ্ণ নাম,　　আনন্দে অবিরাম,
পূরিবে সর্ব্বকাম ভবেরে।
নামে রতি মতি কর,　　পিয় সুধা অনিবার,
দুঃখ শোক জ্বালা দূরে যাবেরে।
বিষয়ের অভিমানে,　　আর কতদিন অহংজ্ঞানে,
মত্ত হ'য়ে রবে বল আররে।
বিষেতে অমৃত জ্ঞান,　　কর ভ্রমের অবসান,
বিষয় নয় বিষের আধাররে॥
নামের প্রদীপ হাতে,　　লয়ে চল এজগতে,
পাপ-তিমির রাশি যাবেরে।
সদানন্দ মহাজ্যোতিঃ,　　প্রেম ভাবের মহাদ্যুতি,
হৃদয় আকাশে ফুটি রবেরে॥
ভ্রান্ত মন জোড় করে,　　বলি তোরে বিনয় ক'রে,
রাধাগোবিন্দ নাম বলরে।
জীবে দুর্ব্বল দেখে,　　গৌর নিতাই মহাসুখে,
এনেছে রসাল এই ফলরে॥
নানা বৃক্ষের নানা ফল,　　খেয়েছরে অবিরল,
তাহে হলো কিবা ফলোদয়রে।
হরিনামামৃত ফল,　　খেলে পাবে দিব্য ফল,
এক ফলে চারি ফল হয়রে॥　　(শ্রীরসিকচন্দ্র দে)

অমলা—ক্ষুদ্র গল্প।

সাগর তরঙ্গ কে রোধ করিতে পারে? কলনাদিনী নদী-স্রোত সামান্য তৃণ খণ্ডে কে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? পূর্ণিমার রজনীতে চন্দ্র উঠে ধরা দীপ্তিময়ী হাস্যময়ী হয় কে তাহা বারণ করে? ফুল নিত্য ফুটে গন্ধ বিস্তার করে, কে তাহা গণনা করে? তেমতি অমল ধবলা অমলার ভক্তিস্রোতের, সে সৌন্দর্য্যের, সে সৌরভের বিনাশ করিতে আজও পর্য্যন্ত কেহ যত্ন করে নাই।

ফেনমালা পরিভূষণা কলনাদিনীর উন্মুক্ত তটে, যেখানে আলু-লায়িত কুন্তলা অস্ফুট কমল-শুভ্র-সৌন্দর্য্যময়ী—ধূলি ধূসরিতা—মেঘাবৃত শশী দীপ্তিবৎ কৌমার্য্যময়ী, ভক্তিপ্রেমে রুদ্ধস্রোতা যমুনার ন্যায় অমলা নীলনদী জলে উষাস্ফুটালোকে আঁধারে—নীরবে অথচ গম্ভীরভাবে, ধর্ম্মোদীপ্ত প্রাণে মুক্তি পথাবলম্বিনী অমলা স্বীয় ইষ্টদেবের পূজা করিতেছিল। সেই থানে সুনীল তরঙ্গিনীর সলিলে তরঙ্গ ভঙ্গ হইতেছিল। মৃদু উষাবায়ু সুধীরে বহিতেছিল।

অমলা কি করিতেছিল? পূজা! পূজোপযোগী দ্রব্য কৈ? তাহা নাই! তবে এ কেমন পূজা? বিশ্বপ্রেমিকার পূজা! অমলা সেই নদী জলে তাহার পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিতেছিল! তাই একদৃষ্টে—স্থির—নীরবে—গম্ভীরে দেখিতেছিল। ভক্তির প্রগাঢ়তায় সে এক মহান্ গীতি—নদীকল্লোলে শ্রবণ করিতেছিল। উষার প্রভাতী সুরে সে করুণাময়ের করুণ বংশীস্বর শুনিতেছিল। ধীরা—স্থিরা—দেবী প্রতিমা!

অমলা কানন বাসিনী—দরিদ্রা—সংসারে এক মা ভিন্ন তাহার আর কেহ ছিলনা। সংসারের প্রবঞ্চনা, কুটিলতা, শঠতা সে কখনও দেখে নাই—তাই সে সরল! মানব কোলাহল পরিপূরিত সহর দেখে নাই—বিলাসের প্রস্রবণ তাহাকে কখনও আকর্ষণ করে

নাই—তাই সে নিষ্পাপ! জগতে চিনে সবে মাত্র তাহার এক মা! আর চিনে কাননের অনন্ত বিস্তার অন্ধকারাস্ফুটালোক। আর কানন বিধাতা কুল বিমোহিতা নীল-তটিনী। কিন্তু তবু সে দেবী প্রতিমা! বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী কখনও তাহার নিষ্ঠুরাচরণে ব্যথিত হয় নাই! এমন কি একদিনও একটী বৃক্ষের শাখা বা লতাগ্র ছিন্ন করে নাই, তাহার কারণ আছে, ওই যে একদিন এক সন্ন্যাসী তাহাকে শিখাইয়া ছিলেন "সর্ব্বজীবে শ্রীকৃষ্ণ আছেন। বৃক্ষ লতা প্রভৃতিতেও সচেতন আত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ আছেন। কাহারও ধ্বংস করিতে নাই বা যাতনা দিতে নাই।" তাই সে জানিত সবাই তাহার সমান। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী নর প্রভৃতিকে সে কখনও ভয় করিত না। প্রেমপুলকিতচিত্তে সে সকলকে আপনার ন্যায় দেখিত। সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ আছেন তাই সে গাঢ়প্রেমে সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হইত। সকালে ও সন্ধ্যাকালে জল সেচন করিয়া পরে আপনি আহারাদি করিত। এইই তাহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে প্রধান!

অমলা পূজা করিতেছিল। অস্ফুট ঊষালোকে নীল সমুদ্রে শ্বেত তরঙ্গ ভঙ্গে কেমন সে বিমুগ্ধা হইয়াছিল। সিক্ত কেশদাম পৃষ্ঠোপরি আলুলায়িত। শরীরের জ্যোতি গঙ্গামৃত্তিকার মধ্য হইতে বেশ ফুটিতেছিল। সৌরভময়ী হইতেছিল। সে বেশ সুন্দর শতদলদ্বয় ভ্রষ্ট-নেত্রদ্বয় নীল-নদীজলে কাহাকে খুঁজিতেছিল। তাই সে অবসন্না—স্থির নেত্রা!

দেখিতে দেখিতে ঊষাজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! পূর্ব্বাকাশে রক্তিম ছটা প্রকাশ পাইল। নদীজলে নীল তরঙ্গে সুস্থির বিদ্যুদাভাবিকাশ করিয়া উঠিল। বেগে বাতাস বহিল—বিপর্য্যস্ত কল্লোল উঠিল—উর্ম্মীমালা বেগময়ী হইল—শত স্বর্ণজ্যোতি বিভিন্ন হইতে লাগিল—অমলা তাহাই দেখিতেছিল। পাখীরা কুজন করিয়া উঠিল—নৈশনিস্তব্ধ শান্ত কানন ভূমি আরাবময়ী হইল।

কিন্তু অস্ফুটময়ী—জাগরিতা। বৃক্ষাগ্রে সূর্য্যকিরণ জ্বলিতেছিল।

একখানি বজরা প্রভাত পবনে আন্দোলিত হইয়া—গঙ্গাম্বু-বিহারী সমীরণে হেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া চলিল। বজরায় বন্দুক-ধারী পাহারা ছিল। উপরিভাগে—ছাদে কার্পেট বিমণ্ডিত শয্যো-পরি বসিয়া বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাবের প্রধান কর্ম্মচারী আফজল খাঁ! মীরজাফরের শক্তি তখন হ্রাস—আফজল খাঁই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার একজন উপশাসক। ইংরেজের প্রিয়বন্ধু।

গঙ্গার সুস্থির তরঙ্গ রাজীর স্বর্ণ প্রক্ষেপ বিচ্ছিন্ন করিয়া তরণী খানি চলিল। উষার বাতাসে—বড় স্ফূর্ত্তি যুক্তমনে সুনীল নিশান উত্তোলিত করিয়া মাঝিরা সারি গাহিতেছিল। নিশান সূর্য্য কিরণে জ্বলিতেছিল—মৃদুপবনে হেলিতেছিল। আফজল খাঁ একপ্রাণে সারি শুনিতেছিল—একমনে ভাবিতেছিল গত রাত্রের বেগমের দুর্ব্বাক্য গুলি।

যেখানে অমলা ছিল—সেইখানে গঙ্গার মধ্যে বজরা মৃদুগতিতে চলিল। আফজল খাঁ অমলাকে দেখিল। চকিতে উঠিয়া বসিল—ভাবিল "একি? স্বপ্নের অনির্দ্দিষ্ট—কল্পনাতীত এ কি ছবি? স্থিরা নিশ্চলা গাম্ভীর্য্যময়ী। একি স্ফুটিত শতদল? একটী নয়—শত শত সহস্র সহস্র উপর্য্যুপরি স্থাপিত করিয়া কে যেন বর্ষাকুলিত গঙ্গার তরঙ্গ সঞ্জাতোৎপন্ন শ্বেত ফেন পুঞ্জের উপর ভাসাইয়া দিয়াছে—তাই ঈষৎ কম্পিতা—তাই হিল্লোলিতা। একদৃষ্টে আফজল খাঁ দেখিতেছিল—"ওই আভা ফুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে—কোথায় বালার্ককর—অথচ প্রশান্ত। ওই নেত্র সুন্দরাঙ্কিত—জগন্মোহক! ওই কটাক্ষের লহর লীলা—অথচ মৃদু। ধীরে সমীর বাহিত সরোবর! ওই সুগঠিত অঙ্গ লাবণ্যময়—সুভঙ্গী যুত! সুঠাম! ওই আলুলায়িত কুন্তল—তাহার মধ্যে ওই দেবী প্রতিমা! অমাবস্যার রাত্রে উদিত চন্দ্রমা সম! মরি! মরি! কি সুন্দর! জগতে এরূপ নাই - স্বর্গের!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আফজল খাঁ মাঝিদিগকে বলিল "মাঝি বজরা তীরে লাগাও।"

মাঝিরা বলিল "খোদাবন্দ! ওখানে ডাকাতের ভয়!"

আফজল খাঁ ভাবিল "তবে এখন থাক—সৈন্য লইয়া আসিব।"

বজরা বহিয়া চলিল।

বজরা চলিয়া গেল—অল্প রৌদ্র উঠিল—নীলজল দ্রবীভূত স্বর্ণবৎ জ্বলিতে লাগিল। অমলা উঠিল না—ঠিক একভাবে নীল-জলে কৃষ্ণরূপ দেখিতেছিল। এমত সময়ে অমলার মাতা সেখানে আসিলেন; বলিলেন "অমল তোর কি কোন ভয় নাই?"

অমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল "মা দেখনা, কেমন নীল জলে রোদ পড়েছে! যেন আমার শ্যামের বামে রাধা! এর চেয়ে জগতে কি সুন্দর আছে?"

মাতা বিমুগ্ধ হইয়া কন্যার সজল প্রশান্ত বদনে তাকাইলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

আফজল খাঁ কত কি ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া চলিল, একবার ভাবিল কি সুন্দর। এত সুন্দরও জগতে থাকে? বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ তার উপর বিদ্যুৎ! স্থির অথচ উদ্দামময়ী প্রভা! ওবিদ্যুৎ কি ধরা যায় না? যায় বৈকি? মেঘে বিদ্যুৎ থাকে আমি মেঘ! মেঘ কাল—আমিও কাল—হাঃ—হাঃ—আফজল খাঁ মনে মনে হাসিয়া উঠিল।

এইরূপ অনেকক্ষণ চলিল! কখনও রহস্য কখনও বা মর্ম্মো-চ্ছ্বাস। সমস্ত দিন চলিল। কাজ কর্ম্ম সব পড়িয়া রহিল। আহার বিহার শয়ন সমস্তই বন্ধ হইল, কেবল ভাবিতেছিল "কি দেখিলাম—আহা! কেমন সুন্দর।

আফজল খাঁ ক্রমে গভীর চিন্তাসাগরে ডুবিলেন। বাহ্যসংজ্ঞা ক্রমে বিলুপ্ত হইল।

এইখানে বড় একটী রাহসিক ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল।

আফজল খাঁর পত্নী মজুয়া বিবি বড় সতী! তিনি আবার জাতিতে আরমানী রমণী। বুদ্ধিটা কিছু মোটা ছিল। বিগত রাত্রিতে তিনি স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া মান করিয়াছিলেন, খাঁসাহেব সে মান ভাঙ্গিবার অবকাশ পান নাই। শেষরাত্রেই তাঁহাকে কার্য্যান্তরে যাইতে হইয়াছিল। কার্য্যে গিয়া তিনি ভীষণ অকার্য্যের দাস হইয়াছিলেন। স্বপ্নরাজ্যে সেই কল্পনাতীত ছবি দেখা পর্য্যন্ত তাঁহার চেতনা সেই গঙ্গাকুলে, যেখানে অমলা উন্মুক্তকেশে বিদ্যুৎ প্রভা সঞ্চালিত করিয়া পথ হারা পান্থ আফজল খাঁকে ধাঁধা দিয়াছিল। এখনও সেই ধাঁধা চক্ষে পূর্ণরূপে বিরাজমান! মজুয়ার মানের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মজুয়া ভাবিল কোনও অসুখ হইয়াছে, সে পরিচারিকা দ্বারা হাকিমকে ডাকাইল।

সন্ধ্যার পর আফজল খাঁ গৃহে বসিয়া ভাবিতেছিল—এমত সময়ে হাকিম আসিয়া উপস্থিত হইল।

হাকিম আসিয়াই নাড়ী টিপিতে চাহিল। আফজল খাঁ চমকিয়া উঠিল, বলিল “সেকি? আমারত কোন অসুখ হয় নাই।”

হাকিম। বিবিসাহেব বলিয়াছেন আপনার অসুখ হইয়াছে—আমাকে ডাকাইয়াছেন।

আফজল খাঁ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন আমার এরোগের ঔষধ অন্য কেহ জানেনা।

হাকিম, খাঁসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন জগতে সুন্দরীর সৃষ্টি কি জন্য? যদি সৃষ্টি তবে তাহা বড় মানুষের চক্ষে পড়ে কেন?

আফজল খাঁ মৃদু হাসিল বলিল “জগতের রীতি সবই মঙ্গল?” হাকিম উঠিয়াগেল।

মজুয়া সব শুনিতেছিল বলিল আবারকাহার সর্ব্বনাশ করিবে?

বর্ষাকালের দীপ্তদিনমণি পুনর্মেঘাবৃত হইল।

আফজল খাঁ কত সোহাগে কত আদরে মজুয়াকে ডাকিল। মজুয়া উত্তর দিল না। কেবল তাহার দুইটী চক্ষু জলে পোরা হইল।

খাঁসাহেব দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়—তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। বহির্ব্বাটীতে গিয়া সেনাপতিকে ডাকিলেন।

সেনাপতি আসিলেন। আফজল খাঁ বলিলেন "প্রাতে পাঁচ হাজার সৈন্য আমার সঙ্গে দিতে হইবে।"

সেনা। "কি জন্য?"

আফ। একদল ডাকাইত, লোকের বড় সর্ব্বনাশ করিতেছে।

সেনা। তা আপনি যাবেন কেন? আমরা ত আছি?

আফ। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—আমাকেই যাইতে হইবে।

সেনাপতি একটু ভাবিল। তর্কটী সু নহে কু—যেহেতু নবাব তখন দুর্ব্বল। অবশেষে সেনাপতি চলিয়া গেল।

এদিকে অন্দরে মজুয়া ভাবিল পুরুষগুলা বড় নির্ব্বোধ, সুন্দরী দেখিলে অমনি আত্ম প্রাণ বলি দেয়! আর ছাই! হিন্দুর ঘরে এত সুন্দরীও থাকে? যাহ'ক একবার তাহাকে দেখিব সে কেমন সুন্দরী।

ভাবিয়া বাঁদীকে ডাকিয়া বলিল তুই এক কাজ করিতে পারিস?

বাঁদী। কি কাজ?

মজুয়া। একখানি নৌকা ভাড়া করিতে হইবে---কল্য ভোরে যাহাতে ছাড়ে।

বাঁদী। কেন?

মজুয়া। শেষে দেখিস—

বাঁদা। নৌকা যাবে কোথায়—নবাবের বাড়ী?

মজুয়া ক্ষুদ্র একটী কিল মারিল—অলঙ্কার দীপ্তিতে দীপালোকে বিদ্যুৎ বিকাশিত করিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ বন্ধ রহিল।

পরে বলিল "মহাবনে"।

বাঁদী সে আবার কি? সেখানে যে সৈন্য যাবে?

মজুয়া। সৈন্য, কার সৈন্য?

বাঁদী। নবাবের সৈন্য।

মজুয়া চমকিয়া উঠিল। বলিল "কি জন্য"?

বাঁদী। ডাকাত দমনের জন্য!

মজুয়া। কে যাবে বলিতে পারিস?

বাঁদী। খোদ কর্ত্তা!

মজুয়ার বদন মণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল। বলিল "ভালই হইয়াছে"। বাঁদী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মজুয়া বলিল "কি চাই? অর্থ?" বাঁদী চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া মজুয়া স্বীয় কণ্ঠহার উন্মোচিত করিয়া তাহাকে দিয়া বলিল "কাজ ঠিক হলে আরও পাবি"।

বাঁদী চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চানন ঘোষ—আগর দাড়ী—

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্?

আমরা জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় ভোগে নিয়তই আসক্ত হই। রূপ, রস, স্পর্শ শব্দ ও গন্ধ এই পঞ্চবিষয়ের রস সর্ব্বদাই আমরা আস্বাদন করি। যতই ঐ সকল বিষয় ভোগে রত হই, ততই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের আশক্তি দিন দিন খরতর ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। আসক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবার বহু পরিমাণে বিষয় ভোগেচ্ছা বা ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং আশা

আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আর কোনই সম্ভাবনা থাকেনা। অতএব আমরা যে সততই আশাপাশে দৃঢ়তর ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু এই আশা বা আকাঙ্ক্ষার বাগুরা ছিন্ন করিয়া, আমাদিগের নিত্য বস্তু প্রাপ্তির উপায় কি করিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারি, তাহার চিন্তায় আমাদিগের চিত্ত ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হয় না কিসে অর্থ পাইব, কিসে আরও বিষয় উপভোগ করিতে পাইব, কিসে আমাদিগের বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষা মিটিবে, তাহাই আমরা অহর্নিশি বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছি। কিন্তু একটীবারও ভাবিতেছিনা যে এই ভব সংসারে আমরা কি করিতে আসিয়াছি, কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে এসংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রাতঃকালে (জীবনের প্রথম দিনে) এখানে পিতার কোন্ আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি ও সন্ধ্যাকালে (জীবনের শেষ দিনে) কি বস্তু এখান হইতে লইয়া গিয়া, পিতা মাতার চরণ সমীপে উপহার স্বরূপ উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা ক্ষণকালের জন্যও আমাদিগের মনোমধ্যে উদিত হয় না। আমরা নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া, বলিয়া বসি, পরকাল, পরমেশ্বর পূর্ব্ব-জন্ম, এসকল কিছুই নহে। আমরা স্বভাবের বলে উদ্ভূত হইয়াছি, স্বভাবের বলেই জীবন বিসর্জ্জন করিব ইত্যাদি। কিন্তু একটীবারও মনে হয় না যে, যে স্বভাবের দোহাই দিয়া, আমরা উহা উড়াইয়া যাই, সেই স্বভাব কি? স্বভাবই যে স্বভাব তাহা বুঝিয়া দেখিলে, আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা, প্রসূতি মাতা, তাঁহাদিগের আবার পিতা মাতা, এইরূপ ক্রম পরম্পরায় উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ পরম পিতা জগত্পিতা ও আদ্যা-শক্তি জগন্মাতার কথা অবশেষে আসিয়া পড়ে। হয়ত কেহ কেহ ফস্ করিয়া আপত্তি করিবেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ত দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের অস্তিত্ব ত কৈ আমরা উপ-

লব্ধি করিতে পারিতেছিনা। তবে উহা স্বীকার করিব কেন? সুতরাং পরম পিতা ও পরম মাতাও মরিয়াগিয়াছেন। তাঁহারা ইহা বলিলে ইহার মীমাংসা করা একটু কঠিন হইলেও অতি সরলের উপরই সে সমস্যা বিদ্যমান আছে। সুতরাং আমাদিগকে এক্ষণে সেইটীই অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, কি উপায়ে সেই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। প্রথমে দেখিতে হইবে, কোথা হইতে কি কি বস্তু সংযোগে আমরা এই দেহ লাভ করিয়াছি, ইহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, দেখিতে পাইলাম শাস্ত্রে বলিতেছেন—

> " সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি অবয়বাস্তু
> জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং
> বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি।"

(বেদান্তসার)

অর্থাৎ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বায়ু এই সপ্তদশ পদার্থের সমষ্টিতেই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। আর এই সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টির দ্বারা উপস্থিত চৈতন্যের নামই প্রাণ। তাই শাস্ত্রে বলেন,—

> "এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণ
> ইতি চ উচ্যতে।"

(বেদান্তসার)

এখন এই প্রাণ সর্ব্বদেহেই বর্ত্তমান আছেন। আবার দেহান্তে সেই মহাপ্রাণেই সংমিলিত হইবে। আমার এই সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত মানব দেহখানি—ইহার মধ্যেও যে পরিমাণে প্রাণ আছেন আর একটি সামান্য কীটের দেহাভ্যন্তরেও সেই পরিমাণেই প্রাণ বিদ্যমান আছেন, প্রভেদ কেবল দেহের। অতএব অখণ্ড-মণ্ডলাকার পরমগুরু পরমেশ্বর শূন্যাকারে ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনি নিরাকার আবার অণু হইতেও অণুপরি

মাণে সকল জীবেরই দেহ কোটরস্থ হইয়া ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। অতএব অংশরূপে দেহধারী জীব মাত্রেই তাঁহার আকার, আবার দেহান্তে শূন্যাকারে মহাপ্রাণে মিলিত হইলেই তিনি নিরাকার। কীটাণু সদৃশ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রাণ সমূহ শূন্যমার্গে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। অণুবীক্ষণ সাহায্যে আমরা অনায়াসে সে সকল প্রাণ দেখিতে পাই। আবার যোগাভ্যাসের দ্বারা আমাদিগের এই মানব চক্ষু সেই অণুবীক্ষণের ন্যায় দীপ্তিশালী করিয়া লইতে পারিলেই, এই চক্ষুতে তাঁহাদিগকে দেখা যায়। যাহাহউক ঐ সকল প্রাণই দেহ ধারণ করিলেই প্রাণী নামে অভিহিত হয়েন। আর এই সকল প্রাণসমষ্টিই আমাদিগের পরম পিতা পরমেশ্বর। এতক্ষণে প্রাণ কি, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু প্রাণী কি তাহাও বুঝা আবশ্যক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দেহ ধারণ করিলেই প্রাণী নাম দেওয়া যাইতে পারে। এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন দেহ কি কি বস্তু সংযোগে হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলাম শাস্ত্রে বলিতেছেন,-

"মাংসাসৃক পূয়বিন্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থি সংহতৌ।
দেহেচেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়োনরকে ভবিতাপি সঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ কেবলমাত্র মাংস, রক্ত, পূঁয়, বিষ্ঠা ও মূত্রাদির সংহতি একটা পদার্থই দেহ, সুতরাং তাহাতে আর নরকে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। অতএব দেহ ধারণইযে নরক বাস, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন আমরা বার বার এই নরকবাস করি কেন? বাসনাই নরকবাসের একমাত্র মূলীভূত কারণ। অতএব যদি এই বাসনা রাশি একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারি, তবেই যদি আমরা নরকবাস হইতে রক্ষা পাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, আমরা নিয়ত এই মৃত্যু জন্ম, জরা, প্রভৃতি দর্শন করিয়াও ভীত

হই না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার রাশিই আমাদিগকে ঐ বাসনায় বিমুগ্ধ করে, তাই শাস্ত্রও বলেন যে,—

"ধীরোঽপ্যতি বহুজ্ঞোঽপি প্রবুদ্ধোঽপি মহানপি।
তৃষ্ণয়া বধ্যতে জন্তুর্দন্তী শৃঙ্খলয়া যথা॥" (যোগবাশিষ্ঠ)

অর্থাৎ ধীরই হউন, বহুজ্ঞই হউন, প্রবুদ্ধই হউন আর মহানই হউন না কেন, শৃঙ্খলদ্বারা বৃহৎকায় বারণের বন্ধনের ন্যায় তৃষ্ণারূপ শৃঙ্খলদ্বারা সকলকেই বদ্ধ হইতে হয়। অতএব বাসনাই যে আমাদের মুক্তিপথের একমাত্র কণ্টকস্বরূপিণী, তাহা আর বোধ হয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না। যাহাহউক আমরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, লোকের সুখ দুঃখের পরিণাম ও শ্মশানে চিতা-শয্যায় শায়িত শবদেহের অবস্থা দর্শনে আমাদিগের পরিণাম চিন্তা না করিয়া, কেবল অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, সতত যমের নিকট মৌরসা পাট্টা পাওয়ার ন্যায় বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া, বিচরণ করি ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? তাই শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—

"অহন্যহনিভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥" (মহাভারত)

অর্থাৎ জীব মাত্রেই প্রতিনিয়ত যমালয়ে গমন করিতেছে ইহা দেখিয়াও কাহারও চৈতন্য হয় না। অতঃপর ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে?

যোগেন্দ্রনাথ ভক্তি-বিনোদ।

সংসার শ্মশান।

শ্মশান! শ্মশান সম এ ভব সংসার। নাহি জানি কেবা আমি—
কিবা আশে কোথা হ'তে এসেছি কোথায়!
আমারও হইবে বুঝি এই হেন দশা।
বিধাতার সৃষ্টিমাঝে কত শত জীব, বিচরিছে কত তার নাহিক সীমানা।
কোথা হ'তে কেবা আসে কোথা চলে যায়।

কেবা কার করিবে নির্ণয় ? কেবাকার আমার বা কে ?
ভাই বন্ধু আত্ম পরিজন কেহ কার নয়।
স্বার্থ সনে আছে গাঁথা মানবের মন স্বার্থ বিনা নাহি কিছু এভবসংসারে।
পিতামাতা প্রাণপণে বাসে ভাল তনয় রতনে
কালে তার পেতে ভালবাসা
বন্ধুজন বাসে ভাল কালে তার পেতে প্রতিদান।
সেইরূপ বনিতা রতন, প্রাণসম বাস ভাল যারে
স্বার্থের সাধন তরে ভালবাস স্বধু॥
কোথা হ'তে আসিয়াছি, কোথা চলে যাব, কিছুমাত্র নাহিক নির্ণয়।
কেহ কার নয়—কেহ না হইবে সাথী সেই পরিণামে।
তবে আর কেন ? চল চলে যাই আকাশের পানে,
যথা ঐ শোভে তারা দল ঈশ্বরের সৃষ্টি ঐ মাণিক মণ্ডল।
ত্যজ ভাই! ছাড় সুখ আশা; সংসারের অন্তরালে বসিয়া বিরলে
একান্ত মনেতে কর প্রেমের সাধন।
সেই প্রেমে কেনা বেচা নাই সে প্রেমে নাহি কপটতা।
কেহ কার নয় অনুক্ষণ করহ স্মরণ প্রেমশিক্ষা কর অন্তরেতে
প্রেমে বশীভূতহয়ে — প্রেম পাবে শান্তিধন অমূল্য রতন।
এই বিশ্বমাঝে প্রেমরূপে যিনি বিগুমান বিশ্বপ্রেমে বাঁধা যাঁর চিত
সেই প্রেমময়ে মগ্ন থাক সদা; ম'জনা ম'জনা যেন দেখিয়া বিভব।
স্বার্থে পূর্ণ মানবের মন; স্বার্থে দিয়ে বিসর্জ্জন
মন প্রাণ বিশ্বময়ে কর সমর্পণ।
জানাওনা অন্তরের কথা মানবের কাছে স্বার্থ ভিন্ন চলেনা মানব।
স্বার্থে দিয়ে জলাঞ্জলী বিশ্বময়ে সমর্পিয়া চিত
সংসারের অন্তরালে—থাকি চল কুতূহলে বিরলে বসিয়া।
একা ভবে আসিয়াছি একা চ'লে যাব অন্তে কেহ সঙ্গী নাহি হবে।
পান্থ যথা পথিমাঝে করে আলাপন পক্ষী যথা নিশাভাগে যাপে একযোগে
কিন্তু কাল! হ'লে সমাগত একে একে সবে চ'লে যায়;—
সেইমত এই বিশ্বমাঝে ভাই বন্ধু সনে হয় মায়ার বন্ধন,
কিন্তু ভাই! আসিলে সে দিন অপেক্ষা না রবে কভু মুহূর্ত্তের তরে।

শ্রীসত্যচরণ দেবশর্ম্মণঃ—

উপাসনা তত্ত্ব।

" বলিষ্টৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারো পেক্ষণাং নহি ॥"

অথ দশবিধ সংস্কার।

" জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং রোধনং তথা।

অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ॥

তর্পণং দীপনং গুপ্তি র্দশৈতা সংক্রিয়া ॥" শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

"জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ণ, তর্পণ, দীপন, ও গোপন এই দশটী মন্ত্রের সংস্কার।" শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে ইহার আবশ্যক নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে আর কিছু লেখা হইলনা।

সকলের শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করাই উচিত। শাস্ত্র বলেন— .

"তস্মান্মনোত সৎ শিষ্যো গুরুং কৃষ্ণ পরায়ণং।

সুদূর মপি গন্তব্যং যতঃ কৃষ্ণাত্মকো গুরুঃ ॥" বৃহদ্ গৌতমীয়।

অর্থাৎ সৎ শিষ্য কৃষ্ণ পরায়ণ গুরু করিবে। যদি নিকটে না পাওয়া যায়, দূরদেশেও গমন করিবে, যেখানে তাদৃশ গুরু পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের মাহাত্ম্যই খুব বেশী। শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—

"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেব মুপাসতে।

ত্যক্তামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষং ॥" শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

ভগবান্ বাসুদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যে মূঢ় অন্য দেব উপাসনা করে, তাহার পক্ষে অমৃত পরিত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ ভোজন করা হয়। মহাভারতে লিখিত আছে—

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্য মুপাসতে।

স হেম রাশিমুৎসৃজ্য পাংশু রাশিং জিঘৃক্ষতি ॥"

ইহার অর্থ— যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য দেবের উপাসনা করে, সে সুবর্ণরাশি ত্যাগ করিয়া পাংশু সমূহকে ইচ্ছা করে। শ্রুতি বলেন—

"কৃষ্ণ এব পরোদেব স্তং ধ্যায়েৎ।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমদেব। অতএব তাঁহার ধ্যান ও জপ করিবে।

"হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্ব সংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণু মন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবং॥" হরিবংশ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে বিপ্রগণ! তোমরা সাত্ত্বগুণাবলম্বনে একমাত্র হরিরই আরাধনা কর। এবং তাঁহারই মন্ত্র পাঠকর, ও তাঁহাকেই ধ্যান কর।

"মন্ত্রান্ শ্রীমন্ত্র রাজাদীন্ বৈষ্ণবান্ গুর্ব্বনুগ্রহাৎ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যং জপন্ প্রাপ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥" হরিভক্তিবিলাসধৃত আগম

শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহে মন্ত্র দিগের রাজা বৈষ্ণব মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া জপ করিলে, সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ করতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ হয়।

সর্ব্বেষাং মন্ত্র বর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
বিশেষাৎ কৃষ্ণ মনবো ভোগ মোক্ষৈক সাধনং॥" বৃহদ্ গৌতমীয়।

যত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে সামান্য ভোগাদি সিদ্ধির কথা কি, মোক্ষ পর্য্যন্ত অনায়াসে সিদ্ধ হয়। অগস্ত্যসংহিতা বলেন—

"সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠঃ বৈষ্ণব মুচ্যতে॥"

প্রশ্ন। গুরুকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। তাঁহার চরিত্র যেমনই হউক না কেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে হয় না। গুরুবাক্যই মন্ত্র। গুরু লইয়া কি মন্ত্র লইয়া বিচার কেন?

উত্তর। একটীবৃক্ষকে যদি ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার উপাসনা করা যায়, তাহা হইলে বৃক্ষই ভগবান রূপে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। যেহেতু ভগবানের সত্ত্বা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "বিষ্টভ্যাহমিদং বৎস মেকাংশেন স্থিতোজগৎ।" স্তম্ভ সূত্রকে ইহার উদাহরণের জন্য আনিলেও আনিতে পারা যায়। গুরুকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া

তাঁহার নিকটে সরলান্তঃকরণে মন্ত্র গ্রহণ করিলে মুক্ত হইতে বা উদ্ধার হইতে পারা যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সদ্‌গুরু ব্যতীত সে বিশ্বাস প্রায়ই হয় না। দ্বিতীয়তঃ সে বিশ্বাসে প্রণালী অনুযায়ী ভজন হইতে পারেনা। কাহারও যুগল উপাসনা করিবার প্রয়োজন হইল, কাহারও সখ্যভাবে, কাহারও বা দাস্য ভাবে উপাসনা করিবার প্রয়োজন হইল; বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সকলে এক ভাবে ভজিলে চলিবে কেন? উপাসনা ভেদে মন্ত্রভেদ, মন্ত্রভেদে গুরুভেদ কি সম্ভব নহে?

হরিনাম মহামন্ত্র। ইহা সকল উপাসনাতেই লাগে। ইহা কলির তারক ব্রহ্মনাম। সকল গুরুদেব মহাপ্রভুর ব্যবস্থা মত সকল রকম লোককে ইহা উপদেশ করিতে পারেন। এই মন্ত্রের ঐশ্বর্য্য অসীম। ইহা ছোট করিয়াই হউক, বা বড় করিয়াই হউক, উচ্চারণ করিতে পারাযায়। ইহাতে শুদ্ধাশুদ্ধি সম্বন্ধে কোন বিচার নাই। ইহা কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত সকলেরই উদ্ধারের উপায়। উপাসনা ভেদে কৃষ্ণ মন্ত্রের বিভিন্নতা আছে, কিন্তু হরিনামের কোন বিভিন্নতা নাই। গুরুর নিকট হরিনাম মহামন্ত্র সকল সময়ে সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন। অপরাধ শূন্য হইয়া ব্যবস্থা মত নাম লইতে পারিলে আপনই প্রেমের উদয় হয়। কিন্তু কোন ভাবের—কোন রসের উপাসনা করিতে হইলে, তদুপযুক্ত গুরু, তদুপযুক্ত মন্ত্র ও তদুপযুক্ত নিজে হওয়া চাই।

এখনকার একটী প্রকৃত ঘটনা বলিতেছি, একজন বাল্যকালে পিতার আদেশে গুরুর নিকট যুগল মন্ত্র গ্রহণ করে। তাহার পরে যখন তাহার আটত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন সে গুরুদেবের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্র প্রার্থনা করে। (তাহার বিশ্বাস, গুরুদেব শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয় বংশে জন্মিয়াছেন, সেই বংশের সকলেই গৌরাঙ্গ মন্ত্র জানেন; সুতরাং তিনিও জানেন।) শিষ্যের প্রার্থ-

নায় গুরুদেব বলিলেন, "আমিও তোমাকে অল্পবয়সে মন্ত্র দিয়েছি, মন্ত্র ভুল হইয়াছে, তাহা মন্ত্র নহে। এক্ষণে পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ কর।" এই বলিয়া শিষ্যকে পুনরায় যুগল মন্ত্র প্রদান করিলেন। শিষ্য বাল্যকাল হইতে যাহকে মন্ত্র জানিয়া জপিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে গুরুদেবের আদেশে তাহা ত্যাগ করিল। ত্যাগ না করিয়াই বা করে কি? তাহাত মন্ত্র নহে, শিষ্য যুগল মন্ত্র বলিয়া যাহা পাইল, তাহাই কি প্রকৃত যুগল মন্ত্র? শিষ্য দেখে মন্ত্রে কৃষ্ণনামের ছন্দাংশও নাই; যাহা আছে, তাহা রাধা নাম। যুগল মন্ত্র বলিয়া শিষ্যের বিশ্বাস হইল না। শিষ্যের এক্ষণে কর্ত্তব্য কি কেহ বলিতে পারেন কি? গুরু ও শিষ্যের মধ্যে নির্ব্বাচন প্রথা কিছু না থাকিলে, এইরূপ বিপদ অনেক ঘটিতে পারে।

এখন দেখিতে পাই, গুরু ও শিষ্য পরস্পর মোকদ্দমা করিয়া ফেরার হইতেছে, এবং পরস্পর মনান্তর হওয়ায়, গুরুদেব শিষ্যকে শাপ দিতেছেন, শিষ্যও গুরুকে গালাগালি দিতেছে। এখন দেখিতে পাই, গুরুর সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় ও শিষ্যের সাংসারিক অবস্থা খারাপ হওয়ায়, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে একটা গোলযোগের প্রবাহ চলিয়াছে। এখন দেখিতে পাই, বংশহীন গুরুর অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী কেহ আসিয়া গুরুপদ অধিকার করিতেছেন, এখন দেখিতে পাই, গুরুদেব স্বেচ্ছাচার পরায়ণ হইয়া বেশ্যার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, শিষ্যও তাঁহার পথানুসরণ করিতেছে। এখন দেখিতে পাই, গুরুদেব পরদার ও পরদ্রব্য অপহরণ করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন, শিষ্যও সে বিষয়ে কম নহে। এখন দেখিতে পাই, গাঁজা, গুলি ও মদের দোকানে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই আড্ডা হইয়াছে। এখন শুনিতে পাই, গুরুদেব শিষ্যপত্নী হরণ করিতেছেন, শিষ্যও গুরুপত্নী হরণ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্বভাবতই মনে উদয় হয় যে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কোন রকম একটা পরীক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলেই ভাল হয়।

মন্ত্রের স্বরূপ জানিবার ও গুরু চিনিবার প্রয়োজন নাই, শুধু মন্ত্র লইলেই হইল। এই বলিয়া হে জীব! যদি তুমি মন্ত্র গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমার ভজন সাধন লইয়া কোন উৎপাৎ নাই। গুরুদেবের নিকট মন্ত্র লও, আর তাঁহাকে পয়সা দাও। তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের জন্য, এবং তোমার গুরুদেব ও তাঁহার পরিবার্গের জন্য যাবজ্জীবন অর্থ চিন্তা করিলেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। কিন্তু তুমি যদি প্রার্থনা কর—

"ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসার বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টং চ ত্বামহং শরণাংগতঃ॥" বৈষ্ণবতন্ত্র।

"হে জগতের উদ্ধার কর্ত্তা গুরো! সংসার রূপ ঘোরতর বহ্নিতাপে সর্ব্বদা সন্তপ্ত, কালসর্পদিষ্ট আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার শরণাগত হইলাম।" তাহা হইলে তোমার গুরু না চিনিলে বা মন্ত্র গ্রহণের তাৎপর্য্য না বুঝিলে চলিবে কেন?

মহাপ্রভু সনতন গোস্বামীকে গুরু লক্ষণ, শিষ্য লক্ষণ, ও গুরু ও শিষ্যের পরীক্ষা এবং মন্ত্রের বিচার করিতে বলিয়াছেন।
যথা চরিতামৃতে—

গুরু লক্ষণ শিষ্য লক্ষণ দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান সব মন্ত্র বিচারণ॥
মন্ত্র অধিকারী মন্ত্র শুদ্ধ্যাদি শোধন॥ ইত্যাদি।

প্রশ্ন। কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, গুরুদেব শিষ্যের গুণাবলী আলোচনা না করিয়াই শিষ্যকে মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। এমত স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, গুরুদেব শিষ্য পরিক্ষা না করিয়া নিয়মের অন্যথাচরণ করিলেন কেন?

উত্তর ১ম।—মন্ত্র শক্তি সকলস্থানে সমভাবে ক্রিয়া করিতে পারেনা বলিয়া পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সে পরীক্ষা কোনস্থানে বিলম্বে হয়, কোনস্থানে শীঘ্র হয়। শাস্ত্রে তাহার জন্য সাধারণতঃ এক বৎসর সময় নিরূপিত আছে। যদি গুরুদেব সহজেই নিজের

বল ও শিষ্যের বল জানিতে পারেন, তবে তিনি পরীক্ষার জন্য বিলম্ব না করিলেও করিতে পারেন। মন্ত্র গ্রহণের জন্য যাহার অত্যন্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছে, যে মন্ত্র না পাইলে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত, মন্ত্র ও গুরুর প্রতি যাহার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, এবং যাহার অন্তঃকরণ মন্ত্রগ্রহণের যোগ্য হইয়াছে বলিয়া সহজেই বোধ হয়; এমন ব্যক্তিকে গুরুদেব অনেক স্থলে কালাকাল বিচার না করিয়া মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন।

২য় উত্তর।—অগ্নি যেমন সকলকে নিজমূর্ত্তি ধরায়, সেইরূপ যিনি পাপীকেও স্পর্শমাত্র নিজমূর্ত্তি ধরাইতে সক্ষম, অর্থাৎ পবিত্র করিতে পারেন, এবংমন্ত্রশক্তি যাঁহাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি অনেক স্থলে মন্ত্রার্থীকে কোন রূপ পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্র দিয়া পবিত্র করিয়া থাকেন।

জগতের মধ্যে মন্ত্রদাতাগুরু একজন, কিন্তু শিক্ষাগুরু অনেকেই হইতে পারেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।

একজনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মন্ত্রের অনুকূল ক্রিয়াদি করার জন্য অন্যের নিকট উপদেশ লইতে পারা যায়। মন্ত্রগুরু ছাড়া যুগল উপাসককে সখীদেহের ক্রিয়া কিম্বা নাম, রূপ ও বয়স অন্যে দিতে পারেন না। মন্ত্রগুরুই গুরুরূপা সখী। সুতরাং তাঁহার অনুগতা সখী তিনি পছন্দ করিয়া দিবেন। অন্যে ভজনের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে পারেন মাত্র। গুরুর গুরু তাঁর গুরু এই ক্রম মন্ত্র গুরুকে লইয়াই।

গুরু, শিষ্য ও মন্ত্র সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিয়া, এক্ষণে গুরু সন্তোষ ফল ও গুরু সেবার কথা কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গুরুতন্ত্রে বলেন—

"গুরু সন্তোষ মাত্রেণ তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতা॥"

অর্থাৎ গুরু সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন।

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী।
ইন্দ্রাদয় স্তথাদেবা যক্ষাদ্যাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ গন্ধর্ব্বাঃ সর্পজাতয়ঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চান্যে পর্ব্বতাঃ সার্ব্বভৌতিকাঃ ॥
এতে চান্যেচ তিষ্ঠন্তি নিত্যঃ গুরু কলেবরে।
শ্রীগুরো স্তৃপ্তি মাত্রেণ তৃপ্তিরেষাঞ্চ জায়তে ॥" গুরু তন্ত্র।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, পার্ব্বতী পরমেশ্বরী, ইন্দ্রাদি দেবগণ, যক্ষাদি পিতৃদেবতা, গঙ্গাদি নদী সকল, গন্ধর্ব্বজাতি, নাগজাতি, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই শ্রীগুরুর দেহে নিত্য বাস করেন। অতএব শ্রীগুরুর তৃপ্তিতে এই সকলের তৃপ্তি হয়।

"কিং দানেন কিং তপসা কিমন্য তীর্থসেবয়া।
শ্রীগুরৌ রচ্চিতৌ যেন পাদৌ তেনার্চ্চিতং জগৎ।
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড মধ্যেতু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
গুরোঃ পাদতলে তানি নিবসন্তি হি সন্ততং ॥" গুপ্তসাধন তন্ত্র।

যিনি গুরুপাদ পূজা করেন, তাঁহার অন্নদান, তপস্যা ও তীর্থ সেবার কি আবশ্যক? কারণ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত তীর্থ আছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীগুরুর চরণতলে সর্ব্বদা বাস করেন।

"গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টো রুষ্টে রুষ্টস্ত্রিলোচনঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্ট স্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং ॥"

গুরুদেব সন্তুষ্ট থাকিলে মহাদেব সন্তুষ্ট থাকেন, এবং গুরুদেব রুষ্ট হইলে মহাদেব রুষ্ট হন। যাঁহার গুরুদেব সন্তুষ্ট, তাঁহার প্রতি হরি সন্তুষ্ট হন।

ন লঙ্ঘয়েদ্ গুরোরাজ্ঞা মুত্তরং ন বদেৎ তথা।
দিবারাত্রৌ গুরোরাজ্ঞাং দাসবৎ প্রতিপালয়েৎ ॥" রুদ্রযামল।

শ্রীগুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না, এবং অন্যায় বোধে উত্তর প্রত্যুত্তরও করিবে না। দিবারাত্র গুরুর আজ্ঞা দাসবৎ প্রতি-পালন করিবে।

"অশক্তাহি সুরাঃ সর্ব্বে অশক্তা মুনয়স্তথা।
গুরুশাপ মৃতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥" গুরুগীতা।

গুরু শাপগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেবতা সকলে ও মুনিগণেরাও কোন মতে উদ্ধার করিতে পারেন না। গুরুশাপগ্রস্ত ব্যক্তি অবশ্যই ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

"হরৌকষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তাস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥" হরিভক্তি বিলাস।

হরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব সর্ববতো-ভাবে শ্রীগুরুকে প্রসন্ন রাখিবে।

"গুরৌ মানুষ বুদ্ধিন্তু মন্ত্রে চাক্ষর বুদ্ধিকম।
প্রতিমাসু শীলা বুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥" জ্ঞানার্ণব।

যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর এবং দেবপ্রতিমূর্ত্তিকে শিলাজ্ঞান করে, সে নরকে গমন করিয়া থাকে।

"গুরৌ মনুষ্যতাবুদ্ধিঃ শিষ্যাণাং যদি জায়তে।
নহি তস্য ভবেৎ সিদ্ধিঃ কল্পকোটী শতৈরপি॥" গুরুতন্ত্রে।

যদি শিষ্যের গুরুর প্রতি মনুষ্য বুদ্ধি জন্মে, তবে শত কোটী কল্পেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেনা।

"যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি।

ইষ্টদেবে ও গুরুদেবে যাঁহার তুল্য ভক্তি হয়, সেই মহাত্মারই তত্ত্বস্ফূর্ত্তি পায়।

"গুরো পাদ রজো যস্তু সুধী মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ।
সতীর্থ কোটীজ ফলাৎ ফলং দশগুণং লভেৎ।
গুরো পাদোদকং যস্তু নিত্যং পিবতি ভক্তিতঃ।
সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থানাং ফলং স লভতে ধ্রুবং॥" গুরু তন্ত্র।

পুনশ্চ গুরুতন্ত্রে—

"গুরোরুচ্ছিষ্টকং দেবি ভক্তি মুক্তি প্রদং ভবেৎ॥"

যে ব্যক্তি শ্রীগুরুর পদরজো মস্তকে ধারণ করে, সে ব্যক্তি কোটীতীর্থ জন্য ফল হইতে দশগুন অধিক ফল লাভ করে। যে গুরু চরণামৃত প্রতিদিন পান করে, সে সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থের ফল লাভ করে। গুরুর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলে ভক্তি মুক্তি লাভ হয়।

ভক্তি।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

শ্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

২য় খণ্ড চৈত্র মাস ১৩১০। ৮ম সং[illegible]।

হাবড়া, রিলায়ান্স প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভক্ত মণ্ডলীর সাহায্যে—

শ্রীভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

ঠিকানা—হাবড়া—কোঁড়ার বাগান শীতলা তলা।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দ রূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা

কৃষ্ণ ত্বদীয় প্রেমাব্ধৌ মাং নিমজ্জয় সর্ব্বথা
সংসার তাপ তপ্তোঽস্মি স্বৈনৈব কর্ম্মণা বিভো।

হে ভগবান্ আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঞ্চিত নিজেরই দুষ্কর্ম্মবশতঃ নিরন্তর সংসার তাপে তাপিত, জুড়াবার স্থান নাই, যাহা যাহা সুখের ও আপন বলিয়া মনে করিতেছি সেই সেই মায়িক পদার্থই আমায় অশান্তি দহনে দগ্ধ করিতেছে, কাহাকে জানাইব, কে শান্তি প্রদান করিবে, কে এমন অকিঞ্চন-বন্ধু আছে যে, আমার দুঃখ বুঝিয়া আপনা হইতে আমার শান্তিলাভের উপায় বলিয়া দিবে—আর যাহা কিছু বুঝিয়াছি তাহাও তোমারই অসীম ভাল-বাসার জন্য, নতুবা আমার এমন কোনই সাধন ভজন বল নাই যাহাতে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করি, তুমি যে কত ভালবাস তাহার অন্ত নাই, তোমার ভালবাসা সিন্ধু হইতেও অনন্ত তাই দীনহীনের এই প্রার্থনা যে তোমার প্রেমসাগরে সর্ব্বদার জন্য আমায় ডুবাইয়া রাখ, তাহাহইলে আর কোন তাপই থাকিবেনা প্রাণ মন শীতল হইয়া যাইবে, জীবন জনম ধন্য হইবে, আর অধিক বলিয়া কি জানাইব, দীনের প্রতি দয়া কর।

(দীনবন্ধু শর্ম্মা)

———

তুমিই সব—তোমাতেই সব।

যং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বৈদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যর্থ জৈন শাসন রতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং যো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রৈলোক্য নাথো হরিঃ॥

শৈবগণ, যাঁহাকে শিব, বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম, বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তা, জৈনগণ অর্হৎ, মীমাংসকগণ কর্ম্ম, নামে উপাসনা করেন, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি তোমাদিগকে স্ব স্ব অধিকারানুরূপ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুন।

তুমিই সব, জ্ঞান বিশ্বাস ভেদে তোমাকে যে যাহাই বলুক, কিন্তু তুমিই সব। একমাত্র এই জগতের মূল সত্যে একটী মাত্র বস্তু দেখা যায়, সেই মৌলিক উপাদান একমাত্র তুমি! তোমাতেই এই মায়াময় জগৎ প্রতিষ্ঠিত, তোমাতেই উৎপত্তি; তোমাতেই স্থিতি, তোমাতেই অবসান। অতএব শত সহস্র নাম ভেদ থাকুক, শত সহস্র মত ভেদ থাকুক, শত সহস্র মূর্ত্তি ভেদ থাকুক, শত সহস্র উপাসনা ভেদ থাকুক, মূল সত্যে একটী ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, সে বস্তু তুমি, অতএব তুমিই সব, তোমাতেই সব।

সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে তুমিই গুরু, উপদেশ ভেদে কেহ তোমাকে শুক্ল, কেহ পীত, ভাবনা করুন, কিন্তু তুমি এক, দুই নহ। যোগীগণ তোমাকেই পরমাত্মা বলিয়া চিন্তা করেন, কেহ জ্যোতির্ম্ময় দেখেন, কেহ ব্যাপক ব্রহ্ম দেখেন, কেহ শুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বলিয়া উপাসনা করেন, কিন্তু তুমিই সব।

ব্রহ্মজ্ঞেরা তোমার জ্যোতিকেই ব্রহ্ম বলেন, কিন্তু বৈষ্ণবেরা সেই জ্যোতির অভ্যন্তর অনুসন্ধান করিয়া তোমার কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করেন, সে সাকার নিরাকার মত ভেদ একমাত্র তোমাতেই পর্য্যবসান! বৈকুণ্ঠে, কারণোদকে, গর্ভদকে জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে,

ক্ষীরোদে শ্বেতদ্বীপে, যে যে খানেই যে মূর্ত্তিতে তোমায় জানুক, তুমি এক।

ব্রহ্মা তোমারই নাভিপদ্মে উৎপন্ন, সে ব্রহ্মাও তুমি। তুমিই ব্রহ্মা হইয়া চরাচর সৃষ্টি করিয়াছ। তোমারই ললাট হইতে রুদ্র হইয়াছেন, সে রুদ্রও তুমি, তুমিই জগৎ সংহার জন্য কালাগ্নি রুদ্র মূর্ত্তিধর। তুমিই রজস্তমঃগুণ দ্বয়কে পৃথক করিয়া মধ্য স্থলে সত্ত্ব তনু বিষ্ণুরূপে চরাচর রক্ষা করিতেছ। শৈব গণের পরম দেবতা শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, শাক্তের শক্তি, সৌরের সূর্য্য, গাণপত্যের গণপতি, বৌদ্ধের বুদ্ধ, চণ্ডালের শ্মশান কালী, যবনের আল্লা, ইংরেজের গড্, বেদিয়ার মনসা, ডোমের শীতলা, গণকের নবগ্রহ, কর্ম্মীর পঞ্চদেবতা, একা তুমিই সব। অগ্নি নানা আকারে প্রকাশ পাউক, বস্তু এক। নদী যতই বক্রগামী হউক, সাগর সকলেরই গম্য স্থান, ভূমি যতই সীমায় নির্দ্দিষ্ট হউক, পৃথিবী বহির্ভূত নহে, উপাস্য উপাসনা যতই বিভিন্ন হউক, তুমি এক ভিন্ন দুই নহ।

যদি মূলে এক বস্তুরই প্রতিষ্ঠা, তবে এ নানাত্ব কেন? এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে এই নানাত্বের মধ্যে কোন একটী সত্য, অপর গুলি ভ্রান্তি, সম্প্রদায় নিষ্ঠ সাধক মণ্ডলীতেও এই ভ্রান্তি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, সেই ভ্রান্তিই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষিতার হেতু। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে সঘৃণ বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখেন, স্বীয় উপাস্যেতর উপাস্য নিষ্ঠ উপাসককে নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন, অপর সম্প্রদায়ও ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকেন। যদি ইহা ভ্রান্তি বলিয়া নিশ্চিত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সকল ব্যক্তিই নরকে যাক্। আমার মতে যদি তোমার নরক হয়, তবে তোমার মতেই বা আমার নরক হয় কেন? ইহা নহে, নিশ্চয়ই নহে, যে যেরূপেই ভজুক, ভজে সেই এক জনকেই। তবে ইহা, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে উপাস্য—উপাসনা ভেদে গতির তারতম্য আছে, যাহার যেমন মতি, তাহার তেমনি রতি, যাহার যেমন রতি,

তাহার তেমনি গতি। কবি রাম প্রসাদও কালীর উপাসক, ডাকাইতেও কালীর উপাসক, কিন্তু উভয়ের কি গতি এক? ইহা কেহই বলিবেন না যে—উভয়েরই গতি এক।

একটা কথা মনে পড়িল, কোন ব্রাহ্মণ বহুবৎসর ধরিয়া এক বনে মহাকালীর আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, কিন্তু—কালী সাক্ষ্যাৎ হইলেন না, একদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় ব্রাহ্মণ দেখিলেন, উল্কাহস্ত একদল দস্যু এক বৃক্ষ মূলে, উল্কা প্রোথিত করতঃ মদ্য মাংস লইয়া কালী সাধন করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল মধ্যেই অন্তরীক্ষ ভেদ করিয়া লক্ লক্ জিহ্বা, এক কালী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া দস্যু দলের পূজা গ্রহণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ "অভিষ্ট সিদ্ধি হউক" বলিয়া বর দিলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ দেবী সমক্ষে গমন করিয়া গললগ্নী বাসে কহিলেন "মা! আমি এত দিন ধরিয়া যে তোমার উপাসনা করিতেছি, তাহা তুমি জানিলেওনা, আর এই দস্যুরা ক্ষণকাল মধ্যে তোমাকে পাইল, ইহার করণ কি মা?"

দেবী কহিলেন "বাবা, তুমি যাঁহার উপাসনা করিতেছ, আমি কত কালে তাঁহার দর্শন পাইব জানি না, আমিও সেই মহাশক্তির তপস্যায় এই শ্মশানে শ্মশানে কালারূপে কাল কাটাইতেছি, অতএব বাবা! গুরুদেবতার দর্শন স্বল্প উপাসনায় হয় না।"

কালীকা অন্তর্দ্ধান করিলেন, ব্রাহ্মণ স্ব স্থানে আসিয়া জপে নিযুক্ত হইলেন।

সত্যই হউক বা উপন্যাসই হউক, উপাস্য উপাসনা তত্ত্বে এরূপ একটা নিগূঢ় তত্ত্ব আছেই আছে। উপাসকের কামনা বা ভাব অনুসারে উপাস্য তত্ত্বে লঘুত্ব গুরুত্ব কিছু আছে। অতএব শাস্ত্রের বাক্য পরস্পর সামঞ্জস্য শূন্য হওয়া বিদ্বেষ প্রসূত নহে, তবে উপাসকে উপাসকে বিদ্বেষ অজ্ঞতা মূলক সন্দেহ নাই।

উপাসনা পথ তিনটী,—জ্ঞান পথ, কর্ম্ম পথ, ভক্তি পথ। কর্ম্ম পথের সাধকগণ ক্ষুদ্র প্রার্থী, সুতরাং তাঁহাদের অভীষ্ট দাতা ক্ষুদ্রা-কারেই তাঁহাদের নিকট আসিবেন, তাহার সন্দেহ কি? মুক্তি ভিক্ষা দিতে প্রধান কোষাধ্যক্ষ স্বয়ং আগমন করেন না। উপা-সনা জগতে কর্ম্মী সাধক মুষ্টি ভিক্ষুক মাত্র। জ্ঞানী মুক্তি চাহেন, মুক্তি দিতে সমর্থ এমন কোন মূর্ত্তি তাঁহাদের সমক্ষে অবশ্য আই-সেন। ইহারাও স্থূল ভিক্ষুক, সুতরাং নিস্বার্থ রাজ দর্শন ইহাদেরও ঘটেনা, কর্ম্মচারী হইতেই ইহাঁদের বাসনা পূর্ণ হয়। কিন্তু ভক্ত নিস্কাম, তাহারা ভোগ বা মোক্ষ কিছুই চাহেনা, তাহারা চায় কেবল সেবা। সুতরাং তাঁহাদের অভীষ্ট, স্বরূপ মূর্ত্তিতে দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না। তবে কোন উপাসক কোন একটা উপাসনা পথ স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারেন না, তাহা অসম্ভব। যে পথ আছে, তাহা চিরদিনই আছে, নূতন কিছু করিতে কাহারও শক্তি নাই, এই জন্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, এই চারি দিকের যে পথ তাহাই প্রশস্ত পথ। ইহা ছাড়া যদি কিছু নূতন পথ হয়, তাহা নিশ্চয় অপথ।

ঈশ্বর চন্দ্র পড়্যা।
এক্তারপুর, মদনমোহন বাড়।
মেদিনীপুর, পোঃ আঃ বাসুদেবপুর।

অমলা—ক্ষুদ্র গল্প—[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

যাহার জন্য এত বর্ণসজ্জা সে কিন্তু কোনরূপ আয়োজন করি-তেছে না। সে সেই নদীকূলে আলুলায়িত কুন্তলে সকালে ও সন্ধ্যায় নীল জলে অভীষ্ট দেবতা সন্দর্শন করিতেছিল। কিন্তু তাহার যে অস্ত্র আছে, আফজল খাঁ এমন সহস্র ভারত সম্রাটের তাহার শতাংশের একাংশ ছিল কি না সন্দেহ।

রাত্রি প্রভাত হইল অমলাও অমলভাবে সেই নদীতীরে বসিয়াছিল। সেইখানে পূর্ব্ববৎ তরঙ্গ ভঙ্গ হইতেছিল।

একখানি তরী, ঊষার জল কল্লোল ভঙ্গ করিয়া তীর-বেগে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তীরে লাগিল। তরণীতে দুইজন মাত্র স্ত্রীলোক ছিল। তাহারা তীরে উঠিল।

একজন বলিল "দিলজান! এই সেই মহাবন?"

প্রশ্নকর্ত্রী-আফজল খাঁর পত্নী। দিলজান দাসীমাত্র।

দিলজান বলিল "এই! এখানে কাজ কি?"

মজুয়া। একটা পাখী ধরব!

দিলজান। ফাঁদ কৈ?

মজুয়া। ফাঁদ কি করিতে? আমার একটা পখী ছিল, সে শিকল কাটিয়া এই বনে উড়িয়া আসিবে, তাই ফিরাইব।

দিলজান। শিকল কাটা পাখী ধরা দিবে কেন?

মজুয়া। ফাঁদ পাতিয়া লুকাইয়া থাকিব?

দিলজান। এখন যাবে কোথায়?

মজুয়া। এখানে খোঁজ দেখি কোথায় একটী সুন্দরী পক্ষিণী আছে?

দিলজান। কেন?

মজুয়া। সেইই আমার পাখিকে ভুলাইয়াছে?

উভয়ে বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন, নদী তীরে অস্ফুট কান্তি শত শতদল, মজুয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। মনে ভাবিল সহজে কি মরে? আমি যদি পুরুষ হইতাম!

দিলজান বলিল "কি লা? তুইও যে মজিয়া গেলি!"

মজুয়া। হেরে শশধর কান্তি মানবে পায় ভ্রান্তি

কেবল চকোরের শান্তি এ কেমন জগতের রীতি বলনা!"

দিলজান হাসিতে হাসিতে বলিল "বটে! এতখানি!"

মজুয়া। দিলজান! আমাকে ঐ রূপে সাজাইয়া দে'না!

এই বলিয়া রাজরাণী অলঙ্কারাদি দূরে ফেলিয়া অমলার মত বেশভূষা ধারণ করিল। এবং সেই খানে নদী তীরে বসিয়া রহিল।

সহসা "গুড়ুম গুড়ুম গুম্!"

কাননের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কামান গর্জ্জিল, গুড়ুম! গুড়ুম! গুম্! প্রভাতের তরল বাতাসে, সমুদ্র কল্লোলে ছড়াইয়া ডাকিল গুড়ুম! গুম্।

মজুয়া ডাকিল "দিলজান!"

দিলজান। "নবাবের কামান!"

রক্তবলী একটী বন্দুকের গুলি ছুটিয়া আসিয়া দিলজানের বক্ষে লাগিল। দিলজান মূর্চ্ছিতা হইয়া নদীজলে পড়িল।

দিলজান যদি মরিল মজুয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িল। এমত সময়ে আফজল খাঁ দ্রুতবেগে বন্দুক হস্তে সেইদিকে ছুটিয়া আসিল। মজুয়া যে কৌশল করিয়াছিল, অত্যন্ত ভয়ে সে, সে কৌশল ভুলিয়া গেল। আফজল খাঁকে দেখিবামাত্র রোদন করিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদ মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র মস্তক লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আফজল খাঁ বিস্মিত হইল। বলিল "সে কি? তুমি মজুয়া!"

মজুয়া রোদনাপ্লুতচক্ষে আফজল খাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আফজল খাঁ বলিল "তুমি। এখানে কেন?"

মজুয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল "আপনি এখানে কেন?"

আফজল খাঁ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "আমার দরকার আছে—তোমার এখানে কি?"

মজুয়া বলিল "আপনার এখানে বিপদ! আমি তাই বারণ করিতে আসিয়াছি!"

আফজল খাঁ অপেক্ষাকৃত ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল তোমার সাধ্য কি আমাকে রক্ষা কর! "তুই পাপীয়সী!"

মজুয়া তেজোৎফুল্ল হইল বলিল "সে আপনার মিথ্যা ভ্রম! আমি জানি জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কখনও পাপ করি নাই কিংবা মনে স্থান দিই নাই! আপনি আমাকে আর যা বলেন বলুন মিথ্যা অপবাদ দিবেন না।"

আফজল। ও সব আমি বুঝি! তোমার রাজপুরী প্রবেশ নিষেধ।

মজুয়া আছড়াইয়া খাঁসাহেবের পাদমূলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

অনেকক্ষণ পরে মজুয়ার চৈতন্য হইল। মজুয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে আফজল খাঁর মুখপানে তাকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মজুয়া বলিল "আপনি স্বামী, আমি স্ত্রী! আপনার আদেশ অবশ্য পালন করিব! আপনি মরিতে বলিলে এখনি মরিব! কিন্তু মিথ্যাপবাদ দিবেন না। ও জাঁহাপনা। আপনি বিচার করুন! বিচারে দোষী হইলে কেন না মরিব! ও দেবেশ্বর! কি আজ্ঞা করিলে; রাজপুরী প্রবেশ নিষেধ! সেত সামান্য কথা! আপনি সমস্ত দেশের বিচার করেন আর এ দুঃখিনীর বিচার কি হইবে না? স্বর্গ আছে; নরক আছে, আপনার শপথ- যদি পাপ করিয়া থাকি তবে অবশ্য নরকে যাইব।"

মজুয়া জনৈক হিন্দুরমণীর নিকট পতিভক্তি শিক্ষা করিয়াছিল।

আফজল খাঁর পাষাণ হৃদয় কোমল হয় নাই! সে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

আফজল খাঁ বলিল "তুই পাপীয়সী; নরকেও তোর স্থান নাই।"

মজুয়া কাতর স্বরে বলিল "যদি পাপিয়সী হইয়া থাকি—তবে তোমার জন্য—মজুয়া দীপ্তা হইল—তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য, স্ত্রীলোক যেন এরূপ পাপিয়সী হয়।"

আফজল খাঁ সক্রোধে বলিল "কি? পাপিয়সী! নিজ মুখে পাপ স্বীকার কল্লি—ইচ্ছা হয় এই বন্দুকে তোকে মারিয়া ফেলি! কিন্তু আমি মরিব না—শৃগাল কুকুরে তোর মাংস খাইবে। অৰ্দ্ধ-

প্রোথিত অবস্থায় থাকবি। তবে তোর পাপের উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু তবুও নরক আছে।”

এই বলিয়া আফজল খাঁ দ্রুত বেগে স্বীয় কটীস্থ তরবারী আমূল মজুয়ার বক্ষে বসাইয়া দিল।

মজুয়ার বাকশক্তি তখন প্রতিরুদ্ধ ছিল, কেবল উৰ্দ্ধদৃষ্টিতে কাঁদিতেছিল। তাহার সে ক্রন্দন কেহ শুনিল না, আফজল খাঁ দ্রুত বেগে চলিয়াগেল।

আবার সব নীরব হইল। অস্ফুট কল্লোলে সমুদ্রেও তখন সে রোদন বাজিতেছিল। বড় মর্ম্মোচ্ছ্বাসে সমুদ্রও যেন কাঁদিতে-ছিল। প্রভাতবায়ু বহিতেছিল, তাহারও মধুর হিল্লোল যেন নীরব ক্রন্দনময়।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চানন ঘোষ—আগর দাড়ী—

ভক্ত চরিত্র—পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর।

তৃতীয় উদাহরণ—অম্বরীষ চরিত্র।

পুরাকালে অম্বরীষ নামে একজন নৃপতি ছিলেন। তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও অতুল সম্পত্তিকে স্বপ্ন কল্পিত বস্তুর ন্যায় মনে করিতেন! ধন, জন, গজ, বাজি কিছুতেই তাঁহার আশক্তি ছিলনা। শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া তাঁহার এমনই একটী ভাব জন্মিয়াছিল, তিনি এমনই একটী শক্তিলাভ করিয়া-ছিলেন যে, পার্থিব সম্পদ তাঁহার নিকটে অতি তুচ্ছ বলিয়াই পরি-গণিত হইয়াছিল!

সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করিতে হইবে, একথা আমরা শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি, কিন্তু সেই সমান জ্ঞান লাভ বড়ই সাধন সাপেক্ষ। সর্পে দংশন করিবে, অথচ দংশন জ্বালা অনুভূত হইবে

না, ইহা কঠিন নহে কি? বিষয়ের মধ্যেও থাকিলেও বিষয়াশক্তি থাকিবে না বিষয়ের জ্বালা যন্ত্রনা অনুভূত হইবে না, ইহা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার আদর্শ অতি বিরল। মহাত্মা অম্বরীষ নৃপতি এই শ্রেণীর আদর্শ ভক্ত।

ভক্তগণ স্ত্রী পুত্রাদি হইতেও অতি প্রিয়বস্তু ভগবানের পাদপদ্মের মধু দিবানিশি পান করিয়া থাকেন। শিশু যখন মায়ের স্তন মুখে দিয়া দুগ্ধ পানে বিভোর থাকে, তখন যদি শিশুকে কেহ মাতৃ বক্ষ হইতে কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে শিশুর যেরূপ কষ্ট হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ হইতে ভক্তগণের মন কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হইলে ভক্তগণেরও সেইরূপ বা তদপেক্ষা বেশী কষ্টানুভব হইয়া থাকে। অম্বরীষ মনকে শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে একান্ত অনুরক্ত রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার যত ইন্দ্রিয় সমস্তকেই মনের অনুগত করিয়াছিলেন! শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

সবৈ মনঃ কৃষ্ণ পদার বিন্দয়ো,
বৈব্রাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানু বর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির মার্জ্জনাদিষু,
শ্রুতিঞ্চকারচ্যুত সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ,
তদ্ভৃত্য গাত্র স্পর্শেহঙ্গ সঙ্গমং!
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ সরোজ সৌরভে,
শ্রীমত্তুলস্য রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানু সর্পণে,
শিরোহৃষিকেশ পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কাম কাম্যয়া,
যথোত্তম শ্লোক জনাশ্রয়া রতিঃ॥

ভগবদ্ভাবে অম্বরীষের সমস্ত অধিকৃত হইয়াছিল। তিনি বাক্যকে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনার জন্য, করদ্বয়কে হরি মন্দির মার্জ্জনের

জন্য এবং শ্রবণকে শ্রীকৃষ্ণের সৎকথা শ্রবণের জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি নয়নদ্বয়কে ভগবানের মূর্ত্তি ও ভগবানের মন্দির দর্শন করিবার জন্য, অঙ্গসমূহকে ভগবানের দাস সমূহের অঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবানের চরণপদ্মাস্থিত তুলসীর সৌরভ গ্রহণের জন্য এবং রসনাকে ভগবানে অর্পিত বস্তুর স্বাদ অর্থাৎ ভগবৎ প্রসাদের স্বাদ গ্রহণ জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি চরণ-দ্বয়কে হরিক্ষেত্র পদানুসর্পণে এবং মস্তককে ভগবানের চরণ বন্দনের জন্য নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভাদীর বশীভূত ছিলেন না, কেবল কর্ত্তব্য বোধে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে—প্রত্যেক বিষয়ে ভগবদ্ভক্তি প্রকাশ পাইত! তিনি যে কার্য্য করিতেন, তাহার ফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিতেন। তিনি বহুতর অশ্বমেধাদি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ ভগবানানুষ্ঠ, তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে তিনি রাজ্য পালন করিতেন। তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ স্বর্গ সুখকেও তুচ্ছ করিয়া কেবল ভগবচ্চরিত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তনে রত থাকিতেন।

অম্বরীষ রাজা প্রকৃতই যেন ভক্তির বিগ্রহ। তাঁহার যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিক হইতেই ভক্তির স্নিগ্ধ জ্যোতি আসিয়া প্রাণ শীতল করে। অনেকের সংস্কার আছে, রাজা হইলে ভগবানের উপাসনা করিবার অবসর থাকে না। একথা কিছুই নহে; অভক্তের মুখেই একথা শোভা পায়। ভক্ত বড় চতুর, তিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিলেও বিষয়ে ডুবেন না, বিষয়ের উপরে থাকিয়াই অনাসক্ত চিত্তে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। অম্বরীষ রাজা সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া হরিভক্তিরসে দিবানিশি মত্ত থাকিতেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই ভক্তিময় হইয়াছিল। তাঁহার ভক্তি যোগে ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ভক্তরক্ষক চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। ভক্ত চরিত্রে এমন অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা

অনেকে সহজে বিশ্বাস করিতে পারেনা। অম্বরীষ চরিত্রেও সেরূপ একটি ঘটনা আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

অম্বরীষ রাজা হরির আরাধনা বাসনায় সংবৎসর যাবৎ সস্ত্রীক দ্বাদশীব্রত ধারণ করিয়া একদিন ব্রত শেষে কার্ত্তিক মাসে ত্রিরাত্র উপবাসের পর স্নান করিয়া যমুনার ধারে মধুবনে ভগবান হরির পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তিমান্ নৃপতির পূজা অঙ্গহীন হইবার নহে, পূজা যথাবিধি সম্পন্ন হইতে লাগিল। রাজা মহাভিষে-কের সকল উপচার দিয়া অভিষেক করিয়া বসন, ভূষণ ও গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা একাগ্র মনে কেশবের পূজা করিলেন। পূজার পরে সিদ্ধার্থ মহাভাগ ব্রাহ্মণ দিগকেও ভক্তির সহিত পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি সাধু ও বিপ্রদিগের গৃহে বহুতর অল্পবয়স্কা দুগ্ধবতী গাভী পাঠাইয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি ব্রাহ্মণ দিগকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাদের অনুমতিক্রমে স্বয়ং পারণের উপক্রম করিলেন।

রাজা পারণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ভগবান দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া অতিথি হইলেন, পারণ থাকিল, রাজা তৎক্ষণাৎ দুর্ব্বাসা ঋষির পাদমূলে পতিত হইয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ভোজনের জন্য বলিলেন। তাঁহার প্রার্থনায় দুর্ব্বাসা সম্মত হইয়া যমুনায় নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে গমন করিলেন।

দুর্ব্বাসা কালিন্দীর জলে ব্রহ্ম চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুক্ষণ রহিয়াছেন, এদিকে দ্বাদশী যায় যায়, অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে, পারণ না করিলে নয়, অম্বরীষ মহাবিপদে পতিত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ভগবানকে স্মরণ করতঃ জল মাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণের আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ জলমাত্র ভক্ষণকে ভক্ষণও অভক্ষণ দুইই বলিয়াছেন।

দুর্ব্বাসা ঋষি স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া জ্ঞানবলে রাজার ব্যবহার জানিতে পারিলেন। রাজা ঋষিকে দেখিয়া আহ্লাদিত

হইলেন, কিন্তু ঋষির আর কিছু ভাল লাগিল না। তিনি ক্রোধভরে রাজাকে নানারূপ তিরস্কার করিতে করিতে মস্তক হইতে জটা উৎপাটন করিয়া তাহা হইতে কালানলতুল্য এক কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই প্রজ্বলিত কৃত্যা খড়গ হস্তে রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজা এই ব্যাপার দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভক্তরক্ষক সুদর্শন চক্র ঐ কৃত্যাকে স্বীয় তেজে দগ্ধ করিয়া দুর্ব্বাসাকে আক্রমণ করিল। দুর্ব্বাসা চক্র ভয়ে পলায়নপর হইলে চক্র তাঁহার পাছে পাছে তাড়াইয়া চলিল। মুনিবর ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া যখন কোন স্থানে চক্র হইতে উদ্ধারের উপায় না পাইলেন তখন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বিধাতঃ! হরিচক্র হইতে আমায় রক্ষা করুন।" ব্রহ্মা কহিলেন, আমি যাঁহার আজ্ঞাবহ, তুমি তাঁহার ভক্তের অপকার করিয়াছ, তোমাকে রক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত। মুণিবর আর কি করিবেন, তিনি তথা হইতে শিবলোকে গমন করিলেন, এবং মহাদেবের শরণাগত হইলেন। তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া মহাদেব কহিলেন, "হে বৎস! সেই মহান্ পরমেশ্বরের উপর আমার প্রভুত্ব নাই, অতএব তুমি তাঁহার নিকটে যাইয়া শরণাপন্ন হও, তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন।" মহাদেবের উপদেশে দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। বৈকুণ্ঠে গিয়া ঋষি ভগবানের পাদমূলে পতিত হইয়া দৈন্য সহকারে বলিলেন, "প্রভো! আমি আপনার প্রভাব না জানিয়া আপনাব ভক্তের দুঃখ উৎপাদন করিয়াছি, আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে রক্ষা করুন।" ভগবান কহিলেন, "হে দ্বিজ! আমি ভক্তাধীন, ভক্তই আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। যেমন সাবিত্রী তাহার সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ সাধু সমুদয়ে আমাতে হৃদয় বন্ধন করিয়া আমাকে বশীভূত করে। ভক্তগণ আমা ব্যতীত কাহাকেও জানে না, আমিও ভক্ত ব্যতীত কিছুই জানি না।' অতএব বিপ্র! যাও, সেই

অম্বরীষের নিকটে যাও। অম্বরীষকে ক্ষান্ত করিলে তোমার মঙ্গল হইবে।”

এদিকে দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলে অম্বরীষ সেই জলবিন্দু মাত্র পান করিয়া বৎসরাবধি অনাহারে রহিয়াছেন। দুর্ব্বাসা ভগবানের আদেশে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া পতিত হইলেন। ব্রাহ্মণে চরণ ধরিলে অম্বরীষ লজ্জিত ও কৃপাপরবশ হইয়া চক্রের স্তব করিতে লাগিলেন। সুদর্শন অম্বরীষের স্তবে ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্ন হইল। অনন্তর অম্বরীষ দুর্ব্বাসাকে ভোজন করাইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজে ভোজন করিলেন।

ভক্তদিগের ঐশীশক্তি জন্মে। যাঁহারা ভক্তের ঐশীশক্তির কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বোধ হয়, এই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত—বলিতে সাহসী হইবেন না। যাহা হউক, মহাত্মা অম্বরীষ শেষকালে সন্তানগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে প্রবেশ করতঃ জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন! চরিত্র লেখক মহাভক্ত অম্বরীষের শ্রীচরণে নমস্কার করিরা এই স্থানেই ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইল।

মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র হইতে—কি কি শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাইতেছে।

১। বিপুল সুখ সম্ভোগের মধ্যে থাকিয়াও যিনি শ্রীহরির উপাসনা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই কোন এক অনির্ব্বচনীয় পরম সুখে বঞ্চিত থাকেন।

২। ভগবদ্ভক্তের নিকট রাজ্য সুখ কি স্বর্গ সুখ সুখের মধ্যে গণ্যই নহে।

৩। রাজা হইলেও ভগবানের উপাসনা করিতে পারা যায়। স্বধর্ম্ম প্রতিপালন ও ভগবানের উপাসনা ভক্তেরই কর্ম্ম।

৪। ভক্ত বড় চতুর। ভক্ত কিছুতে লিপ্ত না হইলেও সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন।

৫। বৈষ্ণবাপরাধের নিকট ব্রহ্মতেজ দুর্ব্বল হইয়া যায়। বৈষ্ণবের সম্মান প্রদর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

৬। এখন "বৈষ্ণব" এই কথাকে লোকে যে সে কথার মধ্যে ধরিয়া লইয়া যে সে ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব কদাচিৎ কেহ হইতে পারেন।

৭। শ্রীহরির উপাসনা করিলে সকলেরই শক্তি জন্মিতে পারে, অতএব হরিভজন মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

৮। আমরাও ভগবানের উপাসনা করিলে অম্বরীষের তুল্য শক্তিমান্ হইতে পারি।

অম্বরীষ চরিত্র হইতে এই কয়টী মাত্র উপদেশ সংগ্রহ করিয়া অম্বরীষ চরিত্রে ভক্তশিক্ষা সমাপন করিলাম।

শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস,
কাতলামারি—(মুর্শিদাবাদ।)

—০—

জ্ঞান ও ভক্তি।

অনেকে হাটীতে পারে, দুই একজন নাচিতেও পারে। অনেকেই কহিতে পারে, দুই একজন গাহিতেও পারে। তুমি যে হাটীতে কহিতে পার, উহা তোমার—জ্ঞান; তুমি যে নাচিতে গাহিতে পার, উহা তোমার—ভক্তি। বৃক্ষে অনেক আঁব ধরে ঝরে, কয়েকটী পাকে; যে কয়েকটী পাকে তন্মধ্যে দু'একটী ঠাকুর সেবায় লাগে। আঁব যে পাকে, উহা—জ্ঞান; ঠাকুর সেবায় যে লাগে, উহা ভক্তি। অনেকেই বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করেন, দুই জন (ব্রাহ্মণ হইলে) মন্দিরে প্রবেশও করেন। তুমি বাহিরে থাকিয়া দেবতা দর্শন করিতেছ, তুমি জ্ঞানি; আর তুমি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিতেছ, তুমি—ভক্ত। অই যে গগণে তেজোময় ভানু, উনি—জ্ঞানের ছবি; আর অই যে নৈশগগনে চাঁদ

ফুটিয়াছেন, উনি—ভক্তির ছবি। অই যে গগনে ঘন মেঘ সাজিয়া ঘোর ঘর্ঘরনিনাদে দিঙমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছেন, উনি—জ্ঞান; আর অই যে অম্বুময়ী ধারা ধরাকে সুশীতল করিতেছেন, উনি—ভক্তি। অই যে প্রভঞ্জন পথের কণ্টক বৃক্ষ ভঞ্জন করিয়া চলিয়াছেন উনি—জ্ঞান; আর অই যে মৃদুমন্দ সমীরণ পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া অন্তরে বাহিরে আমোদ মাখিয়া দিতেছেন, উনি—ভক্তি। অই যে গোয়ালা গাভী দোহন করিতেছেন, উনি—জ্ঞান, আর অই যে গোয়ালিনী ক্ষীর মন্থন করিয়া ঘন নবনীত তুলিতেছেন, উনি—ভক্তি। অই যে খনক বহু প্রয়াসে মণি ও সুবর্ণাদি ধাতু খনি হইতে তুলিতেছেন, উনি—জ্ঞানী; আর অই যে মণিকার বসিয়া মনের সুখে অলঙ্কার গড়াইতেছেন, উনি—ভক্তি। অই যে অপারবিপুল তরঙ্গায়িত লবণাক্ত সিন্ধু দেখিতেছেন, উনি—জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি; আর অই যে অমৃতপ্রবাহিনী মৃদুমন্দসুহাসিনী কল্লোলিনী কুলু কুলু নাদে প্রবাহিতা, উনি—ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি। তোমার যে মস্তক, উহা—জ্ঞান; তোমার যে হৃদয়, উহা—ভক্তি। পিতা পালন শাসন তাড়ন করিতেছেন, উনি—জ্ঞান; মাতা ক্রোড়ে বসাইয়া অধরে স্তন্য, কপোলে চুম্বন ও কপালে তিলক দিতেছেন, উনি—ভক্তি।

জ্ঞান কথাটায় ভক্তগণ বিরক্ত হন। তবু তাঁহাদের দয়ার শরণ লইয়া এই অপরাধ স্কন্ধে লইতেছি। কারণ প্রাণের কথাটা না খুলিলে, প্রাণ জুড়ায় না। সুতরাং আমার এই দোষ মার্জ্জনীয়।

পতাকা উড়ানই উদ্দেশ্য; পতাকাই লোকে দেখে এবং পতাকারই বর্ণ, ভঙ্গী ও বৈচিত্র লইয়া উহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করে। কিন্তু তবু দণ্ড ভিন্ন পতাকা উড়েনা। তেমন জ্ঞান বৈ ভক্তি তিষ্ঠে না। বিচার ছাড়া কর্ম্ম চলে না, কর্ম্ম বিনা মুক্তি ফলে না। মুক্তি শুক্তি তেই ভক্তি মুক্তার উদ্ভব। কারণ মুক্তি মনের অনাবিল অবস্থা। "মনের খুটনাটি দূর করিয়া হরিবোল"—মন পরিস্কার

না হইলে নাম স্ফূর্ত্তি পায়না, ভক্তির উৎস খোলে না। জ্ঞান ভক্তিরসের ইক্ষুদণ্ড, ইক্ষু না থাকিলে যেমন মধুরতা জন্মে না, তদ্রূপ জ্ঞান না থাকিলে ভক্তিসুধারসের সঞ্চার হয় না। ভক্তির গোড়া ভগবৎকৃপা বটে, কিন্তু ভগবৎকৃপায় যখন হৃদয় ভিজে তখন তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা জ্ঞান দাঁড়ায়। ভক্ত বিজ্ঞানময়, অজ্ঞান নয়। তবে কিনা উপাসনায় নিজ প্রকৃত্যনুযায়ী কেহ জ্ঞানের দিকে একটু অধিক গড়ায়ে পড়ে, আবার কেহ বা ভক্তির দিকে একটু বেশীমাত্রায় এগিয়ে যায়। কাঁচা আঁব মিঠে হয় না, খে'লে উদরাময় জন্মায়। কাঁচা ভক্তিরও রস নাই, পদে পদে পতনের আশঙ্কা বেশ আছে। "মূর্খের অশেষ দোষ"—ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তবে কাঁচামিঠে হাজারে কয়টা মিলে ?

"বৈষ্ণব হইতে বড় সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকে পরমাদ॥"

ঘড়ীর কাঁটার মত যার কর্ম্ম চলিতেছে, সেই কর্ম্মরূপ অভ্যাসযোগবলে যিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইয়াছেন, তিনি নামমন্ত্রের অধিকারী, ভক্তির শিষ্য। "পিতা এসেছেন" না বলিয়া যিনি "পিতা এসেছে" বলেন তাঁহার বাক্য শুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু দেখুন একটা বিচার ভিন্ন ও কর্ম্ম ব্যতীত উহার সংশোধন হয় না। আবার দেখুন যিনি (১) এক এর পুচ্ছ টানিতেছেন, মুখে "কালী কালী, হরি হরি" নামের বুদ্‌বুদ্ তুলিতেছেন, তাহার কর্ম্মশুদ্ধ হয় নাই। অশুদ্ধ কর্ম্ম—অশুদ্ধ মনের অনুজ্ঞায় সম্পাদিত হয়। মন দুর্ব্বাসনার বন্ধনে পড়িয়াই তাহার কর্ম্মকে মলিন করিয়া দেয়। অতএব মনঃশুদ্ধিরূপ মুক্তি হইতে ভক্তির উদ্গম। তৃণাদপি সুনীচ ব্যক্তি ভক্তির অধিকারী; কিন্তু সেই তৃণাদপি সুনীচ হইতে যাইয়া জ্ঞানাশ্রয়ে সমস্ত গীতাসমুদ্র আলোড়িত করিতে হয়। তবে কি না ইহার ভিতরে একটা ভাল কথা আছে :—জ্ঞান ছাড়িয়া যদি ভক্তি একটী পদার্থ থাকিতে পারে, তবে উহা

গোলাপ বিলোপে আতর, কিন্তু উৎপত্তি গোলাপে। ইক্ষুদণ্ডে মধুর রস জন্মে, কিন্তু সেই ইক্ষুই আবার ছোবড়া হয়। এই সত্য অবলম্বন করিয়াই অধিকারীর মুখে জ্ঞাননিন্দা। মহাত্মাগণের পক্ষে উহা সাজিলেও, অল্পাধিকারী অনাত্মতত্ত্ব ভক্ত জ্ঞানের লঙ্ঘন করিতে পারেন না। রস গ্রহণ না হইতেই ইক্ষু ছোবড়া হয় না, তাহা পরিত্যাগ করাও যায় না।

দীনৈকদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে জ্ঞানের মুণ্ডে সবলে পুনঃ পুনঃ পদপ্রহার করিয়াছেন, সেই জ্ঞান এই জ্ঞান নহে। ফুলে মধু আছে, ফুল চিবাইলে মধুপান হয় না। মধুপানের ক্রম ভিন্ন। সেই ক্রম শিখাইতেই তিনি কলি ধন্য করিয়াছেন। আঁবের ভিতর কীট হইয়া যেমন সেই আঁবকেই অসার করিয়া তুলে, ভক্তির ভিতরও তেমন একটা পোকা জন্মিয়া বসে। সেইটা ভক্তি-খেকো—জ্ঞান। উহা—চিদাত্মক জ্ঞান নহে। জ্ঞানও পেচকের ন্যায় লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী, দ্বিবিধ। ঈশ্বর (ধনী) বলিতে ঈশ্বর (মহেশ্বর) বুঝিয়া লওয়ার মত অলক্ষ্মীর নিন্দাকে লক্ষ্মীর নিন্দা ধরিয়া বৈষ্ণব সমাজের নিম্নস্তরে হাইল ছাড়া নৌকার ন্যায় একটা এলোমেলো লাগিয়া গিয়াছে। তত্ত্বের কথা উঠিতেই যাহারা জ্ঞান নিন্দার তথা আমূল পরিধবনা না করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতাদি গ্রন্থের বড় বড় দুই চারিটা পদ ঝড়ের মত অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যান আর "জ্ঞান" কথাটা, শুনিতেই কর্ণে হস্ত দিয়া বসেন, এরূপ লোকের অভাব নাই। এমন কি তাহারা "ব্রজের রস নাই" সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতি নাক মোচড়াইয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না, "সচ্চিদানন্দ" এর চিদংশে জ্ঞান এরূপ শাস্ত্রে বিশদ ব্যাখ্যাত আছে। এই দোষ-টুকুই আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহলের দুরবস্থার মূলীভূত। এই কারণেই ভিত্তি কাঁচা হইয়া পড়িয়াছে। মূর্খ করিয়া রাখিবারও একটা প্রথা প্রচলিত দেখা যায়।

ভক্তিশাস্ত্রের নিন্দিত জ্ঞান ও চিদাত্মক জ্ঞান দুটি পৃথক্ পদার্থ। চিদাত্মক জ্ঞান মেঘের ন্যায় ভক্তি বরিষণ করে, আর ভক্তিশোষক জ্ঞান বালুর ন্যায় তাহা শোষণ করে, হৃদয় ভিজিতে দেয়না। সাগরশোষক অগস্ত্যের ন্যায় উহা গণ্ডূষে ভক্তি দিয়া জলযোগ করে। এখন বিদ্যামূলক জ্ঞানের কথা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অবিদ্যাজনিত আপাতমধুর সুতরাং বিষকুম্ভ-পয়োমুখবৎ এই ভক্তিবোধক জ্ঞানকেই জ্ঞানপদের বাচ্য ধরিয়া উহার দোষ দর্শাইতে এবং কি জন্য উহা ভক্তিপরিপন্থী তাহার হেতু স্থাপন করিতে বৈষ্ণবজনের আশীর্ব্বাদ লইয়া চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

বৈষ্ণব জনানুগত—শ্রীকালীহর বসু।

ভাগ্যকুল—ঢাকা—

—০—

ভক্ত জীবন—প্রস্তাবনা।

এক্ষণে ভারতবর্ষের অধীশ্বর ইংরাজ জাতি। তাঁহারা বর্ত্তমান কালের একটী সভ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়া তাঁহারা জগতের মধ্যে সভ্যতার উন্নত সোপানে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমরা ভারত-বাসীগণ তাঁহাদের অধীন প্রজা। দয়া করিয়া আমাদের উন্নতির জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাও এদেশে প্রচলন করিয়াছেন ও সেই শিক্ষার ফলে আমাদের দেশেও ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে এবং ঐরূপে শিক্ষিত পণ্ডিতগণও আপ-নাদের সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। আমাদের ইংরাজ রাজ-পুরুষগণ, আমাদের দেশীয় পাশ্চাত্য শিক্ষানভিজ্ঞ ব্যক্তিপুঞ্জকে অসভ্য বলিয়া থাকেন—সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দেশীয় পণ্ডিতগণও তাহাদের তাই বলিয়াই অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হন না।

ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষও একদিন সভ্যতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন সভ্যতাও শিক্ষা ষোল আনা বজায় থাকুক বা নাই থাকুক, কিছু কিছু যে এখনও বর্ত্তমান আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন সভ্যতা ও শিক্ষার এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষাও সভ্যতার সহিত সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার ফল অত্যন্ত অশুভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হইবারই কথা। কারণ ঐ দুই সভ্যতা ও শিক্ষার প্রকৃতিগত বিশেষ প্রার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ দুই শিক্ষাকে সম্মিলিত করিয়া দেশের হিতসাধন করিবার জন্য চেষ্টাবান হইয়া থাকেন; কিন্তু যাহার প্রকৃতিগত এরূপ বিরুদ্ধভাব তাহার পরস্পর কিরূপে মিলন হইবার সম্ভব—ফলে একরূপ কিম্ভূত কিমাকার ভাবই ধারণ করিতেছে। মোটামুটী এক কথায় বলিতে গেলে ঐ দুই শিক্ষার বিভিন্নতা এই যে প্রাচীন শিক্ষার উদ্দেশ্য পার্থিব উন্নতিতে অনাস্থা পূর্ব্বক পারমার্থিক উন্নতিতে মনোনিবেশ করা, আর এক্ষণকার নূতন শিক্ষার উদ্দেশ্য পার্থিব উন্নতিই সর্ব্বস্ব জ্ঞানে বিশেষরূপে তাহার পরিপুষ্টিসাধন করা। কাজেই হিন্দুর প্রেমভক্তি, ও ধর্ম্ম ব্যাকুলতা ও শাস্ত্রবিহিত পূজার্চ্চনাদি যাহা জীবনের সার কার্য্য বলিয়া ধারণা ছিল, বর্ত্তমান কালের শিক্ষামতে সে সকল এক প্রকার পাগলের কার্য্য বলিয়া তদনুষ্ঠানে আমাদের লজ্জা বোধ হয়। এক্ষণে একটী গল্প মনে পড়িল—গল্পই বলি কেন—প্রকৃত ঘটনা। কলিকাতার সন্নিহিত কোন এক জেলার একজন প্রধান উকিল (যিনি এক্ষণে পরলোক গত হইয়াছেন) ১৮৮৭ সালের পূজার বন্ধে পশ্চিমে তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি শ্রীমথুরার কেশীঘাটে শ্রাদ্ধাদি করিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন যে তাঁহার

একজন বন্ধু (যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জনৈক প্রধান উকিল) সেই কেশীঘাটে যাত্রীদিগকে দেখিয়া বেড়াইতেছেন। বলিবার প্রয়োজন নাই যে ইনিও ঐ পূজার বন্দে পশ্চিম প্রদেশে বেড়াইতে গিয়াছিলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য দেশ ভ্রমণ ও স্থানে স্থানে কৌতুক দশন। ঐ জেলার উকিল বাবু তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজেই বলিয়াছিলেন যে যখন তিনি শ্রাদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার হাইকোর্টের উকিল বন্ধুকে দেখিতে পাইলেন, অমনি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন—মনে এই ভয় উদয় হইল পাছে তাঁহার ঐ বন্ধু তাঁহাকে ঐরূপ মস্তকমুণ্ডন অবস্থায় শ্রাদ্ধ করিতে দেখিতে পান।

এই পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। দেশ মধ্যে বহুতর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ও সেই সকল বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। কাজেই ঐ সকল বালিকাগণ সেই সকল শিক্ষা লইয়াই যুবতী হইয়া আমাদের গৃহবধূ হইয়া প্রবেশ করেন। এখন ঘরে ঘরে স্ত্রীলোকেরা নাটক নভেল পড়িতে পারেন ও বিজ্ঞানও কিছু কিছু না জানেন এমত নহে এবং শিক্ষিত পুরুষের মত কোন কোন স্ত্রীলোকেরও সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক অর্থ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের শিক্ষাফলে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে তত আস্থাবতী হইতে পারেন না ও তাঁহারা জননী হইলে সন্তানদের আর হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ দিবার অধিকারিণী হইতে পারেন না। প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে সামাজিক ও গার্হস্থ ঐরূপ দৃশ্য ভাল দেখায় না বটে, কিন্তু শিক্ষিত পুরুষদের তাহা বড়ই আনন্দ প্রদ। আমাদের কালেজের শিক্ষিত যুবা বিবাহ করিলেন। ঐ রূপ শিক্ষিতা বালিকা বা যুবতীর সহিত তাঁহার মিলন হইলেই তিনি সুখী হন।

এখনও এমন হিন্দুমাতা অনেক আছেন, যাঁহারা আপনাদের বালিকাগণকে ছেলেবেলা হইতে নানাপ্রকার ব্রত, শিবপূজা, বিষ্ণু-

পূজাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইরূপ মাতৃ উপদেশে চালিতা কোন বালিকা, আমাদের এখনকার কোন শিক্ষিত যুবকের স্ত্রী হইলেই তাহার স্বামী আপনাকে বড় অভাগ্যবান জ্ঞান করেন—দেব দেবী মানে এমন একটা অসভ্য স্ত্রী লইয়া কি তাহার সুখ হইবার সম্ভাবনা!

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে, কি পুরুষ কি স্ত্রী-সমাজে অত্যন্ত বিলাসীতা বৃদ্ধি হইয়াছে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যেমন পুরুষদের মধ্যে নানাপ্রকার সার্ট, কোট, মোজা, পেণ্টলুন চলন হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও সেইরূপ নানাপ্রকারের জুতা, মোজা, বডি, সেমিজ প্রভৃতিও প্রচলিত দেখা যায়। অলঙ্কার সম্বন্ধেও কত প্রকার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, তাহা বলা যায় না। আর খাড়ু, বাউটী, কণ্ঠমালা পাঁচনরী সাতনরী নাই—এখন ব্রেসলেট্, নেকলেস্ চেইন হার না হইলে স্ত্রীলোকদের মন উঠে না।

এক্ষণকার রমণীগণের দৈনিক কার্য্য কলাপ বিষয়ে আর বলিবার প্রয়োজন নাই—তাঁহারা কি কার্য্য লইয়া দিন অতিবাহিত করেন তাহা সকলেই প্রায় আপনাপন ঘরে দেখিতে পাইতেছেন। ও তাহাদের পতিভক্তি ও গুরুজনসেবা ও ভক্তিও কতদূর, তাহাও প্রায় সকলে দেখিতেছেন। যাহার স্ত্রী একালে রন্ধন করিয়া পরিজন দিগকে খাওয়ান এরূপ লোকের সংখ্যা বোধ হয় অতি অল্প। পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকগণ কিরূপে কালযাপন করিতেন, তাহার একটী চিত্র নিম্নে দেওয়া যাইতেছে, পাঠক মহাশয় পাঠ করিয়া বলুন দেখি এখন কয়টী গৃহে সেরূপ দৃশ্য দেখিতে পান—চিত্রটী বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে অঙ্কিত হইল। যে রমণীরত্নের সেই চিত্র, তিনি আর কেহ নহেন, নবদ্বীপের ভাগ্যবতী শচীমাতার পুত্রবধূ—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রথম পক্ষের রমণী লক্ষ্মী দেবী।

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু ঘরে।
যার যেন প্রভু যোগ্য দেন সবাকারে॥

কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ॥
একেশ্বরী লক্ষ্মী দেবী করেন রন্ধন।
তথাপিও পরম আনন্দযুক্ত মন॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাড়ে অতি॥
উষাকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম।
আপনি করেন সব এই তাঁর ধর্ম্ম॥
দেবগৃহে করেন যত স্বস্তিক মণ্ডলী।
শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবনে তাঁর মন॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু না বলেন সন্তোষ অন্তর॥
কোন দিন লই লক্ষ্মী পতির চরণ।
বসিয়া থাকেন পাদমূলে অনুক্ষণ॥

তবে পল্লীগ্রামে, যেখানে এখনও স্ত্রী-শিক্ষার স্রোত বড় প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় নাই, সেখানে এখনও অনেক হিন্দু পরিবার মধ্যে মহিলাগণ অতি ভক্তিমতী দেখিতে পাওয়া যায়—হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক পূজা অর্চ্চনাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সহর ও উপ-সহর অঞ্চলেও, পুরুষেরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় অলঙ্কৃত হইলেও অন্তঃপুর মধ্যে অটুটভাবে হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়া থাকে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রধান ভিত্তিই বিশ্বাস—সেই বিশ্বাস স্ত্রীলোকের যেরূপ হইবার সম্ভাবনা, পুরুষের সেরূপ হইবার নহে। তমোগর্ব্বিত পণ্ডিতাভিমানী পুরুষের মনে নানারূপ তর্ক উদিত হইয়া বিশ্বাসের পথ রোধ করিয়া ফেলে, কিন্তু সরলমতী স্ত্রীলোক যাহা শুনেন, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। একবার একজন শিক্ষিত যুবা, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের কথা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে চৈতন্য একবার কুক্কুরের উচ্ছিষ্টান্ন খাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার হাইড্রোফোবিয়া রোগ জন্মিয়া মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইয়াছিল—বলুন দেখি এরূপ লোকের কখন চৈতন্য

প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা হইতে পারে ?

পতী ও পত্নী বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে, তাহাদের দাম্পত্য প্রণয়েরও ব্যাঘাত হইবার কথা—সাহেবী চাল চলন যুক্ত পতি ও হিন্দুধর্ম্মে ভক্তিমতী পত্নীর মিলন কতদূর পরস্পারের সুখপ্রদ বলিতে পারি না। যে স্ত্রীকে, আপন পতির দেহ অপবিত্র বোধে তাহাকে গঙ্গাজল স্পর্শ করাইয়া, গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে হয়, সে পতিপত্নীর দাম্পত্য প্রণয় কত, তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন।

এই বর্ত্তমান সময়ের বিকৃত গার্হস্থ্য সম্বন্ধের দিনে, কোন কোন ভাগ্যধরের গৃহ বড়ই সুখের স্থান। সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে এক ব্যক্তির পারিবারিক অবস্থা ক্রমে বিবৃত হইতেছে ;

(ক্রমশঃ)

৺অমৃতলাল পাল—* *

নিত্যধামগত ৺অমৃত লাল পাল অতি মহাশয় লোক ছিলেন, শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উন্নতি বলে সবজজ্ পদাভিষিক্ত হইয়া নানা-স্থানে অতিশয় প্রসংশার সহিত বিচারাদি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এ দিকে জীবনে কখনও অসৎকর্ম্ম করেন নাই, বহু বহু প্রলোভন-সত্বেও আচার ভ্রষ্ট হন নাই, আবার শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মে এমন আস্থাবান্ ছিলেন যে তাহা পাঠকগণ এই প্রবন্ধেই পরিচয় পাইবেন।

এই মহাত্মার বিশেষ অনুরোধেই আমি ভক্তি পত্রিকা বাহির করিতে প্রবৃত্ত হই, নানা কারণে এযাবৎ ইঁহার স্বহস্ত লিখিত প্রবন্ধ বাহির করিতে পারি নাই, এইবার হইতে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম্, আশা করি সকল পাঠকই ইঁহার প্রবন্ধ পাঠে সুখী হইবেন এবং মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নিকট ৺অমৃত বাবুর পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিবেন।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা—

সম্পাদক।

উপাসনা তত্ত্ব নিরূপন।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

" গুরুবদ্ গুরু পুত্রেষু গুরুবৎ তৎ সুতাদিষু।" তন্ত্রসার।

গুরুর ন্যায় গুরুপুত্র ও তাঁহার সন্ততিগণের প্রতিও ব্যবহার করিবে। প্রমণান্তর রহিয়াছে, গুরুর ন্যায় তাঁহার পত্নীর প্রতি ব্যবহার করিবে।

" যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্নীয়াচ্চ কেবলং।
অভক্ত্যা ন গুরোনাম গৃহ্নীয়াচ্চ যতাত্মবান॥
প্রণব-শ্রীসুতং নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরং।
পাদ শব্দ সমেতঞ্চ নত মূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ॥" নারদ পঞ্চরাত্র।

যেখানে সেখানে অভক্তি পূর্ব্বক গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না। ভক্তিভাবে সংযত হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রণাম পূর্ব্বক প্রণব ও শ্রী— এবং বিষ্ণু ও পাদপদ্মাদি প্রয়োগ সহকারে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবে।

ন তমাজ্ঞা পয়েন মোহাৎ তস্যাজ্ঞাং নচ লঙ্ঘয়েৎ।
না নিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা॥" নারদ পঞ্চরাত্র।

মোহ বশতঃ গুরুকে আজ্ঞা করিবে না; এবং তাঁহার আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিবে না। কোন দ্রব্য গুরুকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিবে না।

"আয়ান্ত মগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ॥
যৎকিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়দ্রব্যং মনোরমং।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহং॥" নারদ পঞ্চরাত্র।

গুরুদেব আসিতেছেন দেখিলেই দূর হইতে উঠিয়া যাইয়া তাঁহাকে আনিবে, এবং গমনকালেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর অনুগমন করিবে। গুরুর সহিত এক আসনে, এক শয্যায় কিম্বা তাঁহার অগ্রে থাকিবে না। অন্ন পানাদি যাহা কিছু প্রিয়দ্রব্য, অগ্রে গুরুকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে।

"ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপিবা ।
নাব মন্যেত তদ্বাক্যং না প্রিয়ং হি সমাচরেৎ ॥
আচার্য্যস্থ প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাংগতিং ॥" নারদ পঞ্চরাত্র ।

তাড়িত কিম্বা পীড়িত হইলেও গুরুর অপ্রিয় কার্য্য কখনই করিবে না। তাঁহার বাক্যের অবমাননা কিম্বা অপ্রিয় আচরণ করিবে না। যে কায়মনোবাক্যে প্রাণদ্বারা ও ধনদ্বারা গুরুর প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করে, সে পরম গতি লাভ করে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,

"যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ ।
প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ভূমৌ ছিন্ন মূল ইব দ্রুমঃ ॥"

যেখানে যেখানে গুরু দর্শনলাভ করিবে, সেই সেই খানেই কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডবৎ ভূমিতলে প্রণিপাত করিবে।

"নাস্থ নির্ম্মাল্য শয়নং পাদুকোপানহাবপি ।
আক্রমেদাসনং ছায়া মাসন্দীং বা কদাচনঃ ॥"

গুরুর নির্ম্মাল্য, শয্যা, পাদুকা, আসন ও ছায়া পদ দ্বারা কখন আক্রমণ করিবে না।

আমরা গুরু, শিষ্য ও মন্ত্র সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম। ইহা অপেক্ষা যিনি বেশী জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি যেন গোস্বামীদিগের শাস্ত্র পড়েন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। এক্ষণে কয়েকটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

বালক যেমন যুবকের ভার বহন করিতে পারে না, মূর্খে যেমন পণ্ডিতের ভার বহন করিতে পারে না, এবং দুর্ব্বল যেমন বলিষ্ঠের ভার বহন করিতে পারে না, সেইরূপ পাপমতি, দুষ্টবুদ্ধি অনুপযুক্ত ব্যক্তি শিষ্যের ভার বহন করিতে পারে না। শিষ্য হইতে হইলে, দীক্ষিত হইতে হইলে, মন্ত্র গ্রহন করিতে হইলে, এবং গুরু হইতে হইলে, পূজা লইতে হইলে, মন্ত্রদান করিতে হইলে, উপযুক্ত হইতে হয়। যোগ্যে যোগ্যে যোগ্য ফলই লাভ হয়।

অন্যথা বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ রহিয়াছে। গুরুদেব উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত বীজ রোপণ করিবেন, শিষ্য গুরুর প্রভাবে,—সাধু সঙ্গের প্রভাবে,—উপসনার প্রভাবে—তাহা বর্দ্ধিত করিয়া লইবে।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া একটী ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। এই রাজ্যের কর্ত্তৃত্বভার বৈষ্ণবাচার্য্য বা বৈষ্ণব গুরুগণের উপর অর্পিত রহিয়াছে। এক্ষণে এই রাজ্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইতেছে। এখন রাজ্যের অধিকাংশ স্থলে কেবল স্বার্থ, স্বার্থ, স্বার্থ এই রব উঠিয়াছে। হে আচার্য্যগণ! হে প্রভু পাদগণ! এসময়ে আপনারা যদি সকলে একটু মনোযোগী না হন, এসময়ে আপনারা যদি সকলে কিছু স্বার্থ বা অভিমান ত্যাগ না করেন, এসময়ে আপনারা যদি আপনাদের প্রকৃত-সম্পত্তি না বুঝেন, তাহা হইলে আপনাদের রাজ্যের বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়া যাইবে। যাঁহাদের গুরুত্বে যাঁহাদের প্রভুত্বে আপনাদের প্রভুত্ব, যাঁহাদের ঐশ্বর্য্যে আপনাদের ঐশ্বর্য্য, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া যদি আপনারা সকলে কার্য্য না করেন, তাঁহাদের আদেশ ও অভিপ্রায় যদি আপনারা সকলে প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে আপনাদের গুরুত্ব বা প্রভুত্ব কিরূপে স্থির থাকিবে? আমরা করজোড়ে আপনাদের সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, মহাপ্রভুর রাজ্য আপনাদেরই, আপনারা আপনাদের রাজ্য রক্ষা করুন।

পাঠক! প্রভু-নিত্যানন্দের গুরুত্বের একটু পরিচয় লউন।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যনন্দ রায়। অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
পতিত চণ্ডাল সব ঘরে ঘরে গিয়া। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া॥
যে না ভজে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌরহরি॥
এতবলি নিত্যানন্দ ধরে জীবের পায়। সোনার পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥

ভক্তির সাধন।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় উল্লাস।

ভক্তি কি? কেহ বলেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" কেহ বলেন, শ্রীভগবানের সেবা পূজাই ভক্তি, কেহ বলেন, ভক্তি অন্তঃকরণের একটী বৃত্তি বিশেষ; কেহ বলেন, অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। ভক্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলেন। আমরা কোন কথাই উপেক্ষা করিতে চাহিনা। তবে বলিব, জীবের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ আছে, সেই জন্য ভক্তি। ভক্তি আছে বলিয়া জীব ভগবানকে চিনিতে পাবে ও ধরিতে পারে। ভক্তিমান্ পুরুষ সামান্য জীব নহেন। তিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানের উপাসনার সহিত—ভক্তির উপাসনার পার্থক্য আছে। জ্ঞানের উপাসক মুক্তি চান, ভক্তির উপাসক তাহা চান না। তিনি "সোঽহং" কথা ভাল বাসেন না। তিনি চান ভগবানকে এবং বলেন তাঁহাকে পাইলেই জীবের মুক্তি হইল! পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে কোন এক ভক্তিমান পুরুষের বাক্য এস্থলে সন্নিবেশিত করিল। তাঁহার উক্তি এই;—

"প্রাকৃত জগতে ভক্তির চরমোন্নতি হয় না, এবং উচ্চ নীচ না থাকিলেও ভক্তির কার্য্য অঙ্গহীন হয়। আমাদের স্বীকার করা উচিত, ভগবানের সহিত জীবের প্রভু ও দাস সম্বন্ধ আছে।"

"ভক্তি দ্বারা বুঝা যায় পরব্রহ্মের সহিত জীবের তুলনা হইতে পারে না। জীব চিরদিনই জীব থাকিবে, তাহার বদ্ধ ও মুক্ত এই দুইটী অবস্থা আছে মাত্র।"

"নত্বেবাহং জাতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয় মতঃ পরম্॥"

এবং "বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বানি নত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ গীতা।

"শ্রীকৃষ্ণ জীব ও নিজের মধ্যে এই দুই শ্লোকের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। এবং দ্বিতীয় শ্লোকের "তোমার

এবং আমার বহুবার জন্ম হইয়া গিয়াছে। হে পরন্তপ! আমি সে সমস্তই বিদিত আছি, কিন্তু তুমি সেই সেই জন্ম অবগত নও।" এই কথার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জীবের সহিত তাঁহার কখন তুলনা হইতে পারে না, তাহাই স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন।"

"ভগবান সময়ে সময়ে এক এক প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি যে প্রকৃতির আশ্রয় লন, তখন সেই প্রকৃতি সম্পন্ন জীব হন। অর্জ্জুন যে ক্ষত্রিয় প্রকৃতি সম্ভূত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই প্রকৃতি হইতে জন্ম লইয়াছেন। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণে কত প্রভেদ। অর্জ্জুন জীব, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। অর্জ্জুন প্রকৃতির অধীন, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত। শ্রীকৃষ্ণের দেহাদির ক্রিয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় হইলেও তাঁহার ভগবত্ত্বায় দোষ নাই। যাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত, তাহা স্বপ্রকাশ স্বরূপেই রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবের প্রভু, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের গুরু।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজা ম্যহম্॥
পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

"শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকৃতিই বাধা জন্মাইতে পারে নাই। তিনি একদিন মীনরূপ ধারণ করিয়া মীনের প্রকৃতি লইয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তিনি মীন হইয়াও যে ভগবান সেই ভগবান। সেই জন্য ভক্ত কবি জয়দেব বলিয়াছেন,

" প্রলয় পয়োধি জলে ধৃত বানসি বেদং।
বিহিত বহিত চরিত্র মখেদং।
কেশব ধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে।" শ্রীগীতগোবিন্দ।

আমাদের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—

" সোঽহং যাদব সেব্য সেবক তয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং।
তেন স্যাৎ তব সদ্গতি র্ধ্রুব মধঃ পাতো ভবেদন্যথা॥
নানা যোনিষু গর্ভবাস বিষয়ে দুঃখং মহৎ প্রাপ্যতে।
স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনরহো জীব ত্বয়া ভ্রাম্যতে॥

"সোঽহং জ্ঞান মিদঃ ভ্রমস্তব ভজত্বং পাদপদ্ম হরে—
স্ত্বাহং কিল সেবকঃ সভগবাং স্ত্রৈলোক্যনাথো যতঃ।
অদ্বৈতাখ্যমতং বিহায় ঝটিতিদ্বৈতে প্রবৃত্তো ভব,
স্বাচ্ছেদম্প্রতি বিদ্যতে যদি হরাবেকান্ত ভক্তিস্তদা॥" তত্ত্বমুক্তাবলী।

অন্য কথা বলিয়া কাহাকেও বিরক্ত করিবার ইচ্ছা নাই, আসুন পাঠক! আমরা সাধনের কথায় প্রবৃত্ত হই।

ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে লাভের জন্য ভক্তির সাধন। প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণের গতিরোধ করিতে না পারিলে এবং একাগ্রতা লাভ না হইলে ভক্তির বিকাশ হয় না। সেই জন্য ভক্তির সাধনে কোন কোন ভক্ত যোগের সাহায্য গ্রহণ করেন। ইন্দ্রিয়গণের বহিঃ প্রবাহ বন্ধ হইলে তাঁহাদের সাধন বল প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় তাঁহাদের অন্তরে ভক্তির বেগ প্রবল হয়, তখন তাঁহারা সেই ভক্তির সাহায্যে ভগবচ্চরণ প্রান্তে উপস্থিত হয়। তাঁহাদের তখনকার ভক্তিমার্গ অপার্থিব ভাব বড়ই মধুর।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তির যে সাধন দেখাইয়াছেন, তাহাতে যোগের কোন প্রয়োজন নাই, তাহা অতি সহজ ও সুন্দর। এস্থলে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুর কথা একটু উদ্ধৃত করিব। যথা—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হইয়া করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

তাঁহা বিস্তারিত হইয়া ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী সেচে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি পাতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটি নাটি জীব হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ॥
সেবা জল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাঢ়িতে না পায়॥
প্রথমেতে উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়ে।
লতা অবলম্বি মালী কল্প বৃক্ষ পায়ে॥
তাহা সেই কল্পবৃক্ষে করয়ে গমন।
সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যায় আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

মহাপ্রভু অল্প কথায় ভক্তির সাধন স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। ভক্তির যাহাতে বৃদ্ধি হয় এবং যাহাতে ভক্তির অনিষ্ট হয় তাহাও বুঝাইয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। আমরা সময়ের অনুরোধে সাধনাদি লইয়া কিছু আন্দোলন করিব।

মহাপ্রভু প্রদর্শিত সাধনাঙ্গ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনই প্রথমে আলোচ্য। যাঁহার মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া জীব সহজে পঞ্চম পুরুষার্থ লাভে অধিকারী হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনকে নমস্কার করি।

কলিযুগে জীবের উপকারার্থই সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি; ধন্য সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক!

শ্রীকৃষ্ণের নাম বা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক শব্দ সকল সুর—তাল—লয়—যুক্ত হইলেই তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন বা হরি সংকীর্ত্তন বলে। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন সাধারণতঃ কীর্ত্তন নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। সংকীর্ত্তনে ভক্ত সহজে উন্মত্ত হয়; সহজেই আবিষ্ট হয়, এবং সহজেই তাঁহার একাগ্রতা জন্মে। সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম নংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্র মজ্জন॥"

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভব মহা দাবাগ্নি নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম স্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং।

সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ আছে! কোন গান সাধারণ ভক্তের, কোন গান প্রেমিক ভক্তের! সকল গানে সকলের সমান অধিকার নাই। যাহাদের হৃদয়ে কীর্ত্তনের এক একটী অক্ষর উজ্জ্বল রেখায় খোদিত হয়, যাঁহারা কীর্ত্তনের এক একটী শব্দ অমৃত অপেক্ষা মিষ্ট বোধ করেন, কীর্ত্তনের কোন কোন অঙ্গ তাঁহাদেরই এক চেটিয়া।

ক্রমশঃ

ভক্তি।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্নকর্ত্তৃক সম্পাদিত।

শ্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।

ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

২য় খণ্ড | বৈশাখ মাস ১৩১১। | ৯ম সংখ্যা।

হাবড়া, রিলায়ান্স প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভক্তমণ্ডলীর সাহায্যে—

শ্রীভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

ঠিকানা—হাবড়া—কোঁড়ার বাগান শীতলা তলা।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দ রূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

লীলা রহস্যং প্রতিবোদ্ধুকামা
ত্বদঙ্ঘ্রিপদ্মে শরণং গতোঽস্মি॥
বিবেকবৈরাগ্য বিধৌতমোহং
ভাবাভিভূতং কুরু মাং মুকুন্দ!

হে লীলাময়, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার লীলাক্ষেত্রে তুমিই জীবগণকে নানাভাবে ভাবাইয়া এক অপূর্ব্ব খেলা খেলিতেছ, তুমি কখন যে কি ভাবে ভাবাও কিছুই বুঝিতে পারি না, বুঝিতে পারি না বলিয়াই মোহান্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনুষ্য জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছি, অনেক বিচার অনেক তর্ক অনেক যুক্তি ও অনেক ভাবনার আশ্রয় করিয়াও তোমার লীলা রহস্য কিছু মাত্র বুঝিতে পারিলাম না, এক্ষণে মনে হইতেছে, তোমার কৃপা ভিন্ন তোমার লীলা খেলা বুঝিবার বা বুঝাইবার আর কাহারও সাধ্য নাই, সুতরাং হে ভগবন্ তোমার লীলা রহস্য জানিবার জন্য আমি তোমার ঐ পাদপদ্মে শরণ লইলাম, কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দাও, তুমি আমার সহিত কেমন খেলা করিতেছ এবং কিরূপ খেলায়ই বা তুমি সন্তুষ্ট হইবে, দয়াময় আমি কিছুই বুঝি না, আমায় বিবেক ও বৈরাগ্য দানে আমার অজ্ঞানমূলক মোহ ভাব দূর করিয়া তোমার ভাবে সর্ব্বদার জন্য বিমুগ্ধ করিয়া রাখ। হে মুকুন্দ, তোমার কৃপাবলে তোমার লীলা খেলা বুঝিয়া তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া তোমায় দেহ মন সমর্পণ করিয়া তোমার হইয়া থাকিতে চাই, দীনহীনের আশা পূর্ণ কর।

দীনবন্ধু।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা। [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

নির্ধন ব্যক্তি যেমন ধনবানের চাল্ চলনে চলিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হয়। অক্ষম ব্যক্তির তেজ-প্রকাশ যেমন অপমানের দ্বার, নির্গুণের আত্মগরিমাও সেইরূপ বিপরীত ফলোৎপাদক। যতগুলি গুণে মানুষ বৈষ্ণব পদবাচ্য হয়, তাহার একটীও যদি কাহারও দেহে থাকে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিতে সমর্থ। প্রকৃত বৈষ্ণব লক্ষণ কখন কোন প্রকারের ব্যক্তির নিকট বিদ্বেষের বস্তু হইতে পারে না, কিন্তু সকল সমাজ যে সহসা বৈষ্ণব সমাজের বিদ্বেষী হইলেন ইহার কারণ কি ? যাত্রা, থিয়েটার যে বৈষ্ণবের সং সাজিয়া লোক হাঁসাইতে লাগিল, ইহার কারণ কি ? হায়! হায়! শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় প্রাণ বৈষ্ণব, প্রেমাশ্রুর প্রস্রবণ বৈষ্ণব ; কারুণ্য রস সংসিক্ত উদ্দৃক্ত ভক্তিরসময় বিগ্রহ বৈষ্ণব কি হাস্যরসোদ্দীপক দীপ শলাকার যোগ্য ? যাঁহাদের পবিত্র দর্শনেই পাষণ্ড হৃদয় ভক্তি রসে গলিয়া যায়, সেই বৈষ্ণব কি সং হইবার যোগ্য ? অতএব ইহা ধ্রুব সত্য, বৈষ্ণবের সং হয় না ; সং হয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিলোপকারী অপদার্থের। আর বৈষ্ণব দেখিয়া কাহারও বিদ্বেষ উদ্দীপন হইতে পারে না, বৈষ্ণবাকারাকারিত নির্গুণ কপটীই তাহার কারণ। সুতরাং বলিতে বাধ্য যে বিদ্যাহীন উপদেষ্টা আর গুণহীন বেশ ইহাই বহুব্যাপক বৈষ্ণব দ্বেষিতার মূলীভূত হেতু।

রাজ কিঙ্করের দোষ যেমন রাজাকে কলঙ্কিত করে, সেইরূপ এই বৈষ্ণব দ্বেষিতা সীমা ছাড়াইয়া ক্রমে পবিত্রাদপি পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্কর্ত্তা ভগবান গৌরচন্দ্রেও সংক্রামিত হইল, উপাস্য ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রেও স্পর্শ করিল, ভারতের অন্যান্য সমাজের নিকট বৈষ্ণব, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বৈষ্ণব শাস্ত্র, বৈষ্ণব উপদেষ্টা, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরাঙ্গ, বৈষ্ণব উপাস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ, বিদ্বেষের ও বিদ্রূপের বস্তু হইলেন। যদি অনভিজ্ঞ শাস্ত্র তরল মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকই ইহা হইত, তাহা হইলে তাহাদেরই অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার উপর দোষ

স্থাপন করিতাম, কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অনেক শিক্ষিত সভ্য অনেক পক্ককেশ প্রধান ব্যক্তিতেও এই বিদ্বেষ বহ্নি প্রদীপ্ত দেখিয়া সহজেই বোধ হয়, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের দোষে এই ধর্ম্মবিপ্লব উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহার কারণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিয়ৎপরিমাণে অনুশীলন করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে এই সকল বিদ্বেষাদি নিতান্ত আধুনিক।

শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ প্রভৃতি গ্রন্থানুশীলনে দেখা যায়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব যত দিন গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন, তাঁহার প্রভাবে প্রভাহীন স্মার্ত্ত, দার্শনিক, তান্ত্রিক ব্যক্তিগণ ততদিন তাঁহার বিদ্বেষ করিত সত্য, কিন্তু প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর সে বিদ্বেষ কথঞ্চিত মন্দীভূত হইয়াছিল। "এমন অগ্নিশিখা তুল্য নব যৌবনা প্রেমবতী ভার্য্যাকে অনায়াসে যে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে, সে কখন সাধারণ ব্যক্তি নহে।" বিদ্বেষীদের মনে ইহাই প্রথমে বিশ্বাস বীজ স্বরূপ রোপিত হইল। তাহার উপর পুত্রশোকাতুরা শচীমাতা পতি বিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর, আর গৌর হারা নদীয়ার আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার বিহ্বল রোদনের অশ্রু প্রবাহে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল, বিদ্বেষীগণেরও কঠোর চিত্ত সেই কারুণ্য রস সিঞ্চনে কোমল হইল। তাঁহারা দেখিলেন "মানুষত অনেক আছেন, কিন্তু যাহার জন্য এত লোক বিহ্বল হইয়া কাঁদে, সে একজন সাধারণ মনুষ্য মাত্র নহে।" শ্রীগৌরাঙ্গে ঈশ্বর বুদ্ধি না হউক, তাঁহাতে কোন অমানুষী শক্তি আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিলেন। কেবল এইটুকুই নহে, ইহার অধিক আরও কিছু তাঁহাদের উপলব্ধি হইল। যতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে ছিলেন, ততদিন নিষ্কারণেও নবদ্বীপে যেন কি এক আনন্দরাশি উথলাইয়া উঠিত, নিরন্তর উৎসব, নিরন্তর জনস্রোত, নিরন্তর আনন্দের তরঙ্গ, প্রেমের তরঙ্গ, আহা! যেন কি এক ভূলোক দুর্ল্লভ অপ্রাকৃতভাবে নদীয়া টলমল করিত। কিন্তু একা গৌর নাই, আরত সব আছে,

তবে আজ নদীয়ার এ দশা কেন ? পাখী আছে, ডাকে না, গাছ আছে, ফুল নাই, মনুষ্য আছে কিন্তু নীরব, পশুতেও মাঠে গিয়া চারি দিকে ছুটিয়া বেড়ায়, তৃণ আছে, চরে না। সেই সুরধনী বহিতেছে, সেই সান্ধ্য ধূসর পবিত্র কুল পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহার আর কিছুই শোভা নাই। লোক আনন্দ শূন্য, উৎসাহ শূন্য, পরস্পার দেখা হইলেও কেহ কাহার সহিত আলাপ করে না, গৃহ-ধর্ম্ম আছে, গৃহকর্ম্ম নাই, কেন আজ নদীয়ার এমন দশা ? একটী লোকের জন্য আজ এই পরিবর্ত্তন ! কোন মুখে বলি সেটি একটী সাধারণ মানুষ ? মানুষ কত হইতেছে, কত যাইতেছে, কিন্তু এমন মানুষ কয়টী কে দেখিয়াছে ? সুতরাং এ অভাব সহজ অভাব নহে, এ অভাবে স্বভাব ত্যাগ করিয়া নিন্দুক, পাষণ্ডী, বিদ্বেষী, পড়ুয়া দল, সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। জানিও ইহাও সেই শক্তিময়ের অবিচিন্ত্য শক্তি।

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব পুরুষোত্তমে প্রভাব প্রকাশ করিলেন, নবদ্বীপের প্রধান দার্শনিক এমন কি যিনি বঙ্গের দার্শনিকের গুরু, সেই ভূলোকবৃহস্পতি বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পূর্ণতম অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেন, সপরিবারে তাঁহার দাস হইলেন। উড়িষ্যার রাজ-প্রতিনিধি দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্ত্তা রায় রামানন্দ পদগৌরব ছাড়িয়া প্রভুর আশ্রয় লইলেন। উড়িষ্যার মহা পরাক্রমশালী স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার দাস হইলেন, সমস্ত উচ্চপদস্থগণ, ভূম্যধিকারীগণ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, মহা তেজঃপুঞ্জ যোতি সন্ন্যাসী, দণ্ডীগণ, নানাস্থান হইতে আসিয়া তাঁহার চরণাশ্রিত হইলেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর মহিমা গাথায় পূর্ণ হইল, লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার চরণে বিকাইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল স্রোত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া সকল দেশ বৈষ্ণব করিয়া তুলিল। অনুরোধ নাই, উপরোধ নাই, বলপ্রকাশ নাই, ভয়প্রদর্শন নাই, কি আশ্চর্য্য গুণের পূর্ণ সমাবেশ প্রভুকে

দেখা দূরে থাক্, তাঁহার নাম, গুণ, করুণা শুনিয়াই লোক গৌর-প্রেমে মাতিয়া গেল। এমন মহিমা যাহার তাহাকে কি মানুষ মনে করা যায়? দেবতাতেই বা এমন শক্তি কোথায়? অংশ কলাদি ক্ষুদ্র শক্তি হইতেও ইহা অসম্ভব! সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এই সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষণী শক্তি অন্যে অসম্ভব।

নবদ্বীপের বিদ্বেষী স্মার্ত্ত, দার্শনিক, তান্ত্রিক, সকল পণ্ডিতই এবং সকল সাম্প্রদায়িকই তাঁহার মহিমা কথায় অবনত হইলেন, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইল, আর "আমাদের পরম গৌরব করিবার একটী অমূল্য রত্ন" বলিয়া প্রগাঢ় প্রীতি জন্মিল। তখন সেই গৌর রূপ, গৌর গুণ, গৌর লীলা, গৌর নৃত্য সংকীর্ত্তন, যাহা দেখিয়া বিদ্বেষীগণ জ্বলিয়া মরিত, তাহাই কত মিষ্ট লাগিল, বিদ্বেষীগণও তখন গৌর কথা কহিয়া কহিয়া অশ্রুপাত করিতে শিখিলেন, একবার সেই গৌড় গৌরব গৌরচন্দ্রকে দেখিতে লালাইত হইলেন। আহা! ইহাই ভগবানের ভগবত্তা, ইহার অধিক আর কি শক্তি বিস্তার দেখিতে চাহেন?

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র গৌড়াগমনছলে তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করি-লেন, সপ্ত দিবস কুলিয়া গ্রামে রহিলেন, কোটী অর্ব্বুদ লোক তাঁহার দর্শনে প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিল, কোটী অর্ব্বুদ কণ্ঠের হরিধ্বনি জগৎ পূর্ণ করিল। অম্বুদ অর্ব্বুদ নয়নে প্রেমাশ্রুর প্রস্রবণ ছুটিয়া ধরণী সুসিক্ত করিল। এই কুলিয়া গ্রামে নদীয়ার সমস্ত সমাজ শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা স্বীকার করিয়া অপরাধ মুক্ত হইলেন। শ্রীনবদ্বীপ সকল সমাজের মস্তক, সেই মস্তক গৌর পদে অবনত হইল, আর অমনি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দু-সমাজ শ্রীগৌর চরণে সাষ্টাঙ্গ পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র ও তৎপ্রচারিত মত সার্ব্বভৌমিক সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক রূপে সর্ব্বত্র পরি-গৃহীত হইল। সেই হইতেই বিপদোদ্ধারে হরির লুটের সৃষ্টি, সেই হইতেই গ্রামে গ্রামে সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি, সেই হইতেই তারকব্রহ্ম

হরিনাম সংকীর্ত্তন আপদুদ্ধার স্বস্ত্যয়ন ও মোক্ষধর্ম্ম বলিয়া সকল সম্প্রদায়েই পরিগৃহীত হইলেন। সকল সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রান্ত গৃহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি সেবা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইদানীং অনেক বিশৃঙ্খলা হইলেও ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ অক্ষুণ্ণ বর্ত্তমান, অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে কেন? দেখুন, শ্রীগৌড় মণ্ডলে স্মার্ত্ত, দার্শনিক তান্ত্রিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী, সকল মতেরই লোককে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে ভক্তি প্রদর্শন করিতে হয় এবং মৃতাহে বৈধিক্রিয়ার পর মোক্ষধর্ম্ম বলিয়া শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রীলীলা সংকীর্ত্তন করাইতে হয়। এখন ভারতের সকল রাজগৃহে, সকল মতের ব্যক্তির গৃহে, শ্রীগৌড় ভূমির ঘোর শাক্তদিগের গৃহে পর্য্যন্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। যাঁহার ঘরে যুগল মূর্ত্তি নাই তিনি আধুনিক ভাগ্যবান বলিয়া চিহ্নিত ও উপেক্ষিত; যাঁহার মৃতাহে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ধ্বনি না হয়, তিনি নিন্দিত হন। শ্রীচৈতন্য শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব প্রথা যে সমাজে অপ্রবর্ত্তিত ও অনাচরিত তাহা সমাজের বহির্ভূত যথা—শীক, জৈন, বৌদ্ধ, প্রভৃতি। এই যে কএকটী সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে লিখিত হইল, কোন হিন্দু সন্তান ইহা অস্বীকার করিতে সমর্থ বলুন দেখি? আবার দেখুন, হিন্দু সমাজের জাতি ভেদ প্রধান অঙ্গ, জাতি ভেদ শূন্য শীক, জৈনাদি ধর্ম্ম সমাজ হিন্দু সমাজের বহির্ভূত। হিন্দু সমাজে উচ্চ বর্ণগণ হীন বর্ণকে এক বিছানায় বসিতে দেন না বা স্পৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করেন না, এমন প্রবল জাতি ভেদের সমাজেও শ্রীমহাপ্রভুর বৈষ্ণব ভেকধারী যে কোন জাতিই হউন, নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিবার কাহারই অধিকার নাই। এই সকল কারণে ও প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্বে অন্য কোন সম্প্রদায়েরই বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিদ্বেষ ছিল না, এটা পরে নূতন হইয়াছে। পর প্রবন্ধে আমরা এই নবীন বিদ্বেষের কারণ অনুসন্ধান করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ।—সম্পাদক।

ভক্ত জীবন। [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

ঐ ব্যক্তি এক পুণ্যবতী জননীর একমাত্র পুত্র। তাহার বিবাহের পর হইতেই তাহার বালিকা পত্নী, প্রায়শঃ শ্বশুরালয়ে বাস করিত। এজন্য ঐ সৌভাগ্যবতী রমণী আপন শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর উপদেশ ও শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে গঠিতা হইয়াছিল। বালিকা কালাবধিই ব্রত নিয়মাদি পালন পূজার্চ্চনাদির অনুষ্ঠান গুরুজন দিগের প্রতি ভক্তি সাংসারিক গৃহকার্য্যাদিতে মনোনিবেশ শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তির ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত সাতটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। কন্যা দুইটীরই বিবাহ হইয়াছে ও তাহারা শ্বশুরালয়ে বাস করে। তিনটী পুত্রেরও বিবাহ হইয়াছে। কন্যা দুইটী শিশু-কাল হইতে মাতার নিকট শিক্ষিতা হইয়া, অনেক পরিমাণে জননীর সদ্‌গুণ ও ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূটীর বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে সেরূপ শিক্ষা না থাকিলেও, শ্বশুরালয় আসাবধি, শাশুড়ীর উপদেশে ননন্দাদের দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে সদ্‌গুণ সম্পন্না হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় পুত্রবধূটী বালিকা, অল্পদিনই শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, তাহার পিত্রালয়ে কিছুমাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, এক্ষণে ক্রমে ক্রমে যে ঐ গৃহের যোগ্যা বধূ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তৃতীয় পুত্রবধূটী তদপেক্ষা আরও বালিকা, কিন্তু তাহার পিত্রালয়ের স্ত্রীলোকগণ বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ভক্তিপরায়ণা, নিজ মাতার ও পিতামহীর শিক্ষাগুণে এই বালিকা বয়সেই তাহার ধর্ম্ম-নিষ্ঠা বিশেষরূপে বলবতী থাকা দেখা যাইতেছে।

উক্ত গৃহিণীর পতিভক্তি অচলা। পুত্রগুলিও ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে বটে, তথাচ বর্ত্তমান কালের ইংরাজী চাল চলন পরিগ্রহণ সংক্রামিকতা তাহাদের আক্রমণ করিতে পারে নাই! গৃহিণী সর্ব্বদাই স্বামীর নিকটে বিদেশে বাস করেন ও পতী রুগ্ন বলিয়া সাধ্যমত তাহার কাছ ছাড়া হয়েন না ও তাহার সেবা শুশ্রূষায় নিতান্ত মনোযোগী থাকেন। অনেক সময়ে অবকাশ পাইলে, তাঁহারা স্ত্রী-

পুরুষে ভগবৎ কথায় কালাতিপাত করিয়া থাকেন। স্ত্রী, এক্ষণকার মত লেখাপড়া জানেন না যৎসামান্য যাহা কিছু জানেন, তাহাতে কোন নাটক নভেল পড়িবার বা পড়াইয়া শুনিবার ইচ্ছা রাখেন না; অবকাশ পাইলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, এইরূপ কোন পুস্তক পাঠ করা বা পড়াইয়া শ্রবণ করাতেই তাঁহার বিশেষ তৃপ্তি। কোন কোন দিন তাঁহার স্বামী তাঁহাকে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনায় বা বুঝাইয়া দেয়।

একদিন ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে রামচন্দ্র কবিরাজের গল্পটী পড়িয়া তাহার ভক্তির প্রভাবের কথা স্ত্রীকে শুনাইলেন, সেই উপলক্ষে ঐ স্ত্রী পুরুষের যে কথোপকথন হয়, তাহাই এই ভক্তজীবন-প্রবন্ধের উপক্রমণিকা। এজন্য ঐ ভক্ত জীবন সংক্রান্ত গল্পটীর কিয়দাংশ বর্ণন করা আবশ্যক বোধে লিখিতেছি :

স্ত্রী। দেখ আমার মনে বড় একটী দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের মত হতভাগিনী জগতে আর কেহ নাই। যে স্ত্রীর এই পৃথিবীতে ও পরকালে স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই, সেই স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সাধুদিগের উপদেশ। শাস্ত্রের অল্প অল্প কথা যাহা তোমার মুখে শুনিয়াছি ও যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ তুমি পড়িয়া আমাকে শুনাইয়া থাক, তাহাতে পুনঃপুনঃ দেখিতে পাই যে স্ত্রীসঙ্গ হরিভক্তি সাধন পথের একটী কণ্টক, এজন্য স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার কথা লিখা আছে। স্ত্রী যদি পুরুষের সাধন ভজন পথের কণ্টক বলিয়া তাহার সহবাসের অযোগ্য, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের গতি কি হইবে? আহা! এমন অভাগিনীকে বিধাতা কেন সৃষ্টি করিলেন।

স্বামী। হাঁ! তুমি যা বলিলে এইরূপ উপদেশ বৈষ্ণবশাস্ত্র গ্রন্থে পুনঃপুনঃ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। শাস্ত্রকারদের সে কথার তাৎপর্য্য এই যে কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য স্ত্রীলোকের সহবাস বর্জ্জনীয়। ইন্দ্রিয়

সুখ বাসনা ব্যতিরেকে ভজন সাধনের অঙ্গভাবে স্ত্রীসঙ্গ বৈরাগীরও ত্যজ্য নহে ; সংসারীর তো কথাই নাই, কেন তুমি কি শাস্ত্রে ইহাও উপদেশ আছে শুন নাই যে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম সস্ত্রীক হইয়া আচরণ করিবার বিধি আছে শ্রীহরির ভজন সাধন করিতে হইলে যে একবারে সংসার বা স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিতেই হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই। স্ত্রী সহবাসেও যে ভজন সাধন হইতে পারে, তাহা সেই জগৎগুরু দেবদেব মহাদেবই জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সদাশিব পরম যোগী ও বৈষ্ণব। তাঁহার পঞ্চ মুখে নিয়তই হরিণাম উচ্চা-রিত হইত। মা ভগবতীও পরমা বৈষ্ণবী। মা পার্ব্বতীর বসিবার স্থান মহাদেবের উরুদেশ। সদাশিব পার্ব্বতীকে নিজ ক্রোড়দেশে বসাইয়া ও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত থাকিয়াও পরম ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন ও মা দুর্গাও নিজ পতির কোলে বসিয়া শ্রীহরির ধ্যান করিতেন।

স্ত্রী। ও সকল ত দেব চরিত্র। মনুষ্য কি সে প্রকার সাধন করিতে পারে।

স্বামী। জীবের পূর্ব্বের জন্ম সুকৃতিবলে ভগবানের কৃপা হইলে তাহা অসাধ্য নহে। আর তুমি যে স্ত্রীলোক অতি অভাগিনী বলিয়া দুঃখ করিতেছ, ও স্ত্রীসঙ্গ পুরুষের সাধন পথের কণ্টক বলিয়া স্ত্রীর গতি কি হইবে বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছ, ঐ স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গের সঙ্গ পরিত্যজ্য বলিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে উপদেশ আছে, তাহার ভিতর ভক্তিতত্ত্বের অতি গুহ্য কথা নিহিত আছে। আমি ঘোর সংসারের কীট, আমি ভক্তিতত্ত্বের কথা কি বুঝিব, তবে ঐ সম্বন্ধে মহানুভব আচার্য্যগণ যেরূপ ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ যতটুকু পারিব তোমার নিকট আনিয়া দিবার চেষ্টা করিব। মনের সাহস এই যে সেই সকল তত্ত্ব কথা আমার মত পামর অধমাধমের মুখেও মহিমাশূন্য হইবে না। মা পবিত্র পাবনী গঙ্গার বারির যেমন সংস্পর্শ দোষে

পবিত্রতা নষ্ট হয় না, ভগবানের মহাপ্রসাদ যেমন স্পর্শদোষে পর্যু-ষিত হইবার সামগ্রী নহে ; সেইরূপ ঐ ভক্তিতত্ত্বের কথাগুলিও আমার পাপমুখ দ্বারা প্রকাশিত হইলেও তোমার গ্রহণ করিবার বাধা হইবে না। অতএব ভগবানের কৃপায় যতটুকু পারিব ঐ ভক্তি তত্ত্বের গুহ্য কথা তোমাকে পরে বলিব এক্ষণে কেবল এক কথায় তোমাকে বলিতেছি যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক যে হরিভক্তি পাই-বার অধিক অধিকারিণী তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী কথা উল্লেখ করিতেছি, শুন—

একদিন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোপশিশুগণের সহিত যমুনা তীরে উপবন মধ্যে গোচারণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। বয়স্যগণ কিসে রামকৃষ্ণের ক্ষুধা শান্তি করিবেন, ভাবিতেছেন, দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ভাই ঐ নিকটে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাটীতে আজ আঙ্গিরস যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে, তোমরা সেই স্থানে গিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিয়া লইয়া এসো৷" গোপালক গণ ঐ আদেশানুসারে ঐ স্থানে উপস্থিত রামকৃষ্ণেব ক্ষুধার বিষয় অবগত করিয়া যজ্ঞভাগ অন্ন ভিক্ষা করিলে ব্রাহ্মণগণ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের নানা তিরস্কার করিয়া বলিল, "রে মূর্খ ভগবানের ভোগ না হইলে যজ্ঞভাগ তোদের রামকৃষ্ণেব জন্যে দিব, কোন সাহসে এমন কথা বলিলি, যা, এখান হইতে দূর হইয়া যা।" বিপ্রগণ তাহাদের এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিলে, গোপালকগণ অতি দুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমণ করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সেই জ্ঞানগর্ব্বিত কর্ম্মি পুরুষগণ ভক্তির মাহাত্ম্য কিছুই জানে না। তোমরা পুনর্ব্বার গমন করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী ব্রাহ্মণদিগের রমণীগণের নিকটে গিয়া অন্ন প্রার্থনা কর।" গোপালকগণ তদ্রূপ করিলেন। ব্রাহ্মণীরা কৃষ্ণে অত্যন্ত অনুরাগবতী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ মাত্রেই ভক্তিরসে অপ্লুতা হইয়া, পতি প্রভৃতি গুরুজনের ভর্ৎসনা বাধা লঙ্ঘন

করিয়াও রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জনাদি লইয়া রামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাদের পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া পরমানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণীর মধ্যে একটী যুবতীকে তাঁহার স্বামী গৃহরুদ্ধা করিয়া রাখায় তিনি হরি দর্শনে যাইতে পারেন নাই। সেই অবরুদ্ধ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করত মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এখন দেখিলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক ভক্তির অধিক অধিকারিণী কি না। আর ঐ যুবতী ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণীর কি তীব্র কৃষ্ণানুরাগ। যখন কটকের রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় ভিখারী হইয়া অতিশয় কাতর হওয়াতে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিতেছিলেন না। তখন মহাপ্রভুর নিকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাজার পক্ষ হইয়া, রাজার তীব্র অনুরাগে মরণ সম্ভব বলিয়া অনুরোধ করিবার সময় উপরের লিখিত ঐ ব্রাহ্মণ যুবতীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ পরাণ ছাড়য়॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িল পরাণ॥

স্ত্রী। আহা! এমন স্ত্রীর পাদোদক পান করিতে পাইলে জীবন সার্থক হয়।

স্বামী। তাহার আর সন্দেহ কি? এরূপ স্বাধ্বী স্ত্রীর পদরজ ভব রোগ শান্তির অমোঘ ঔষধ। তুমিতো শাস্ত্রে শুনিয়াছ যে সাধুসঙ্গের অপার মহিমা। সাধুদিগের জীবন চরিত পাঠ ও শ্রবণও সাধুসঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। আমি তোমাকে গুটিকত সাধ্বী ও ভক্তিমতী নারীর জীবন চরিত শুনাইতে ইচ্ছা করি।

স্ত্রী। আমারও শুনিবার বড় বাসনা।

স্বামী। তোমার বাসনা পরিতৃপ্তি করিব, এবং তুমি বুঝিতে

পারিবে যে স্ত্রীলোক ভক্তি পথের কণ্টক হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা ভক্তির অতি উচ্চ দরের অধিকারিণী ও সতী স্ত্রীরসঙ্গ ফলে কত কত অসাধু পুরুষ ভক্তি শিক্ষা করিয়া সৎপথের পথিক হইয়াছেন। এ জগতে স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধের মত এত মধুর প্রীতির সম্বন্ধ আর কিছুই নহে। এমন পত্নীর সঙ্গ যদি সৎসঙ্গ হয় তাহা হইলে পতীর আর সৌভাগ্যের সীমা থাকে না।

—০—

হরিভক্ত রাণী।

কোন রাজার রাণী অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন। তাঁহার স্বামী দৃষ্টতঃ একজন হরিভক্তি বিহীন বলিয়াই বোধ হইত। কিন্তু ঐ রাজা অন্তরে মহা ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাহা কোন মতেই ব্যক্ত করিতেন না। হরিভক্তি অন্তরে গোপন করিয়া রাখিতেন। রাণী রাজার প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদাই এই দুঃখ ছিল যে যেমন তাঁহার স্বামী সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত, তেমনি ভক্তি-পরায়ণ হইলেই আরও উজ্জ্বল হইতেন। তাঁহার জীবনকান্ত অভক্ত এই বিষয় লইয়াই রাণী সদাসর্ব্বদা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "আমার কি দুর্দ্দৈব, আমি সাধু স্বামীর সহবাসজনিত সুখে বঞ্চিতা। রাজার সহিত যখনই মিলন হইত, রাণী তখনই তাঁহাকে হরিপদে যাহাতে মতি হয়, এইরূপ বুঝাইতেন; কিন্তু রাজা অপর পাষণ্ড স্বামীর মত তাহাতে বিরক্ত না হইয়া মনে মনে রাণীকে প্রশংসা ও এরূপ স্ত্রীর সহবাসে তিনি ভাগ্যবান বলিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন ও মনে মনে পরমানন্দে ভাসিতেন; কিন্তু বাহিরে রাণীর উপদেশ বাক্যে যেন একেবারে উদাসীন, এইরূপ দেখাইতেন ও সে কথা ছাড়িয়া কথান্তরে রাণীকে আনিতেন। রাণী তাঁহার এরূপ কৃষ্ণকথায় উদাসীন ভাব দেখিয়া, মনোদুঃখের আর সীমা থাকিত না। একদিন রাজা ও রাণী উভয়ে শয়ন করিয়া-

ছিলেন, এমন সময়ে দৈবাৎ রাজার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায়, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আলস্য ত্যাগ করিলেন; রাণী সে সময় জাগ্রতাবস্থায় ছিলেন, স্বামীর মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দে গদগদ হইলেন। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া পরম উৎসাহের সহিত মহা মহোৎসব আরম্ভ করিলেন; নানাবিধ সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ভোজ্য দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া সে সকল ভগবানকে নিবেদন করিয়া দিলেন ও সাধু বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই প্রসাদ দ্বারা তাঁহাদের পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন ও তাঁহাদের ধনদান করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। এ দিকে নগর মধ্যে বাদ্যাদি দ্বারা সংকীর্ত্তনাদি করিতে অনুমতি দিলেন ও প্রচুর আহারীয় সামগ্রী ও ধন অসংখ্য দীন দরিদ্রগণকে দান করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। রাণীর মহলে ও সমস্ত নগর মধ্যে ঐরূপ মহা সমারোহ দেখিয়া রাজা কারণ জিজ্ঞাসায়, আমাত্য প্রভৃতি কর-যোড়ে নিবেদন করিল, "মহারাজ এ সকল রাণীমাতার আজ্ঞাক্রমে সম্পাদিত হইতেছে, ইহার কারণ আমরা কিছুই অবগত নহি। রাজা তৎক্ষণাৎ রাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া রাণীকে পরম উল্লাসিত দেখিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি এত মঙ্গল ঘটিয়াছে যে এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে নিমগ্না হইয়াছ।" রাণী গলবস্ত্র হইয়া রাজাকে প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি লইয়া নিজ মস্তকে ধারণ করত অতীব উৎসাহের সহিত প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, "জীবিতেশ্বর আজ আমার যে কি আনন্দের দিন, তাহা আমি একমুখে প্রকাশ করিতে পারি না। আমার মন আনন্দ সাগরে ভাসিতেছে, আজ আমার প্রাণকান্তের মুখে আমি কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়াছি। দাসী চিরদিনই আপনার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য উৎসুকা ছিল, আজ সেই আন্তরিক বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে ইহা অপেক্ষা আর শুভদিন আমার কি হইতে পারে।" রাণীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া রাজা অতীব বিস্ময়চিত্ত হইলেন এবং রাণীকে কহিতে লাগিলেন,

"তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমার মুখে তুমি কৃষ্ণনাম কখন শুনিলে।" রাণী রাজার নিদ্রাভঙ্গে আলস্য ত্যাগের সময় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিবার কথা বর্ণন করিলে, রাজা ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় হাহাকার করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইলেন এবং আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "হায় হায়, যে রত্ন আমি এতদিন এত যত্নে হৃদয় কন্দরে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই অমূল্য রত্ন আমার অন্তর হইতে বাহির হইয়া গেল।" রাজার তৎকালীন অবস্থা যে কিরূপ হইয়া উঠিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি একবারে চেতনাশূন্য হইলেন ও ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন এবং তাঁর প্রাণবায়ু তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাণী এতক্ষণ স্তম্ভিতা হইয়া রাজার ঈদৃশ দশা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। প্রাণেশ্বরের জীবনান্ত দেখিয়া একেবারে অধীরা হইয়া শীরে ও বক্ষে করাঘাতকরিতে লাগিলেন ও কাতরকণ্ঠে অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। আপনাকে কতই যে তিরস্কার করিলেন, তাহার সীমা নাই, এমন কৃষ্ণভক্ত সাধু পতিকে তিনি এতদিন যে অভক্ত জ্ঞান করিতেন, তাহাই চিন্তা করিয়া কাঁন্দিতে লাগিলেন। "হায় হায়, আমি কি পাষণ্ডী, পামরী, এমন মহানুভব স্বামীরতত্ত্ব এতদিন জানিতে পারি নাই; আমি পাপিনী, মূঢ়া, তাই তাঁহার হৃদয়-পুটিকা মধ্যে যে কৃষ্ণনাম মহারত্ন ছিল, তাহা জানিতে পারিলাম না, বরং তাঁহার কৃষ্ণে মতি নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতাম। এমন অসাধারণ কৃষ্ণভক্তি তো কখনও দেখি নাই ও কভু শুনিও নাই। তাঁহাকে অভক্ত জ্ঞান করিয়া, আমি কত অপরাধিনী হইয়াছি, আমার সে অপরাধ কৃষ্ণ কখনই ক্ষমা করিবেন না, কারণ শুনিয়াছি সেই ভক্ত বৎসল, তাঁহার প্রতি দ্বেষাভাব বরং ক্ষমা করেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তের নিন্দকারীকে মার্জনা করেন না। আহা! সেই সাধু মোহান্তের কি এক নূতন ভাব যে কৃষ্ণনাম তাঁহার হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত ছিল; তাহা মুখে

বাহির হইল বলিয়া ভূপতি একেবারে প্রাণত্যাগ করিলেন। আমি অত্যন্ত অভাগী, পোড়াকপালী, তাই সেই সাধু পুরুষ আমার মুখে অনল জ্বালিয়া চলিয়া গেলেন। প্রাণনাথ, এ দাসীর প্রতি কৃপা কর—প্রাণনাথ, একবার দাসীকে আসিয়া দর্শন দাও, আমি সেই চরণে আমার মস্তক রাখিয়া কৃতার্থা হই। হায়, আমার কি হইবে, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে” রাণী এইরূপ অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন; সে বিলাপে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। স্বামী, রমণীর সাররত্ন, কেবল যে স্বামীহারা হইয়াছেন বলিয়া রাণীর শোক নহে; এমন গুণের নিধি মহাত্মাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারিলেন না, এবং সাধু সহবাসের যে অপার আনন্দ, তাহা হইতে বঞ্চিতা হইলেন এবং তাঁহার নিজ মূর্খতা নিবন্ধন, ভগবৎ কৃপায় সৎসঙ্গ পাইয়াও, সে সঙ্গকে অসৎসঙ্গ জ্ঞানে অবহেলা করিয়াছেন, ইহাই রাণীর প্রধান আক্ষেপের বিষয়। ভক্তাধীন ভগবানের কি অদ্ভুত লীলা, ভক্তের জন্য তিনি সকলই করিয়া থাকেন; সে লীলা রহস্য ভেদ করা সাধারণ জীবের পক্ষে সহজ নহে। শ্রীকৃষ্ণ ঐ রাজ-দম্পতীর ভক্তিগুণে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকেও ফাঁপরে পড়িতে হইল। রাজাকে তো কৈবল্য প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে রাণীর সাধুসঙ্গের উৎকণ্ঠা তো উপসমিত হইবার নহে। ভগবান ভক্তের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ও ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, বৈকুণ্ঠধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ঐ রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাণীকে নিজ ত্রিভঙ্গীম মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন ও সেই সুধাময় দৃষ্টি রাজার শব-দেহে নিপতিত হইবা মাত্রই রাজা জীবন প্রাপ্ত হইয়া যেন সুপ্তোথিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও করযোড়ে স্তুতি করিয়া দণ্ডবৎ প্রনাম করতঃ শ্রীপদপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন। রাজা ও রাণী উভয়ে সম্মুখে ঐ মনের ধন নবঘনশ্যামরূপ দর্শন করিয়া একেবারে আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেলেন। বিচিত্র কারুকার্য্য সমন্বিত মনিমুক্তাখচিত

রত্নসিংহাসনে ঐ প্রাণের প্রাণ, মনের ধনকে বসাইয়া মনের সাধ মিটাইয়া সেবন পূজনে নিযুক্ত হইলেন। ভগবান তাহাদের নিকট ভক্তিডোরে তো বাঁধাই ছিলেন, আবার সেবাপূজায় পরিতুস্ট হইয়া তাহাদের আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

রাণীর আর আনন্দের সীমা নাই। সাধুস্বামীর সহবাস সুখ অনেক দিন ভোগ করিয়া, কালে ঐ নৃপতির সহিত শ্রীধামে গিয়া ভগবানের অনুচরগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া অনন্ত সুখের অধিকারীণী হইলেন। * (ক্রমশঃ)

৺ অমৃতলাল পাল।

গয়া—পাদোদক তীর্থ!

চৌদিক পাহাড়ে ঘেরা তার মধ্য স্থান।
পুণ্যতীর্থ মোক্ষ হেতু নাম গয়াধাম॥
কিবা দৃশ্য মনোহর প্রাণ মুগ্ধকর।
ফল্গু নদী অন্তঃশিলা বহে তর্ তর্॥
নদীর উপরে বালি মরুভূমি প্রায়।
প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে কাছে যেতে দায়॥
কিছু বালি ঠেলে দেখ কাকচক্ষু জল।
বিন্দুমাত্র মলা নাই এত নিরমল॥
তারোপরে বিষ্ণুপদ বিরাজে অদূরে।
ইন্দ্রোর মহিষী কৃত মন্দির ভিতরে॥
সনাতন ধর্ম্ম ভবে যতদিন রবে।
অক্ষয় অহল্যা কীর্ত্তি মানবে দেখিবে॥

---

* কেহ কেহ বলেন, ঐ হরিভক্ত রাণী অহল্যাবাই এবং তাঁহার স্বামী টুকা রাও।

শাক্ত কি বৈষ্ণব হেথা নাহিক বিচার।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ শূদ্রে সম অধিকার॥
দয়াময় হৃষীকেশ ভব ভয় হারী।
গোলোকে গোপনে ছিল গোলোক বিহারী॥
স্বরাতে জগত জীবে জগত জীবন।
যুদ্ধ ছলে গয়াসুরে করেন দমন॥
আপনি হারিয়া হবি বাড়ান অসুরে।
ত্রিতাপ নিবারি পদ দেন তার শিরে॥
সেই পদ অদ্যাবধি বিরাজে হেথায়।
ধ্যানের অসাধ্য বস্তু চক্ষে দেখা যায়॥
শ্যাম অঙ্গ আজি কৃষ্ণ গৌর অবতারে।
এই পদ চিহ্ন দেখে ভাসে আঁখিনীরে॥
পূর্ব্ব স্মৃতি জাগে তাঁর এইথান হ'তে।
কাঁদিয়া আকুল গোরা না পারে কহিতে॥
কাঁদে আর দেখে পদ পাগলের প্রায়।
এই ভাবে থাকি প্রভু মূর্চ্ছা যায় যায়॥
অপূর্ব্ব সে ভাব কভু লেখা নাহি যায়।
আসিয়া ঈশ্বর পুরী ধরিল তাঁহায়॥
প্রেমিক ভাবুক হও ইচ্ছা হয় প্রাণে।
চৈতন্য ভাগবৎ কথা পড়হ যতনে॥
হবেনা তোমায় আর এ ভবে আসিতে।
নিত্য নব গৌরপ্রেমে ভাসিবে সুখেতে॥
গয়াতে আসিয়া প্রভুর যা 'যা' ঘটিয়াছে।
সকল বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহা লেখা আছে॥
এক স্থান আছে এথা কোন গ্রন্থে নাই।
স্মরিয়া গৌরাঙ্গ পদ বৈষ্ণবে জানাই॥
অক্ষয় বটের পিছে হয় এই স্থান।
কিছু কিছু চিহ্ন আছে পাদ ধৌত নাম॥
(অরোবন্ধ) ভাঙ্গা এবে ঘাট খানি আছে।
প্রাণ গৌর বিনা জল শুকায়ে গিয়াছে॥

গাভীগণ হাম্বা রবে সেই স্থানে চরে।
খায় আর ইতি উতি চাহে চারি ধারে ॥
কি জানি কি ভাবে তারা ঘাট পানে দৌড়ে।
দেখিয়া ব্রজের কথা মনে এসে পড়ে ॥
বৃন্দাবনে গোচারণে গোবিন্দে না হেরে।
আকুল গোবৃন্দ যত ভাসে আঁখিনীরে ॥
আবার প্রাণকানাই হেরে তারা সব।
আনন্দে করিত কত সুমধুর রব ॥
গাভীগণে হেরে এবে প্রাণ ফেটে যায়।
হায় কৃষ্ণ গৌরচন্দ্র কোথা এ সময় ॥
ক্লান্ত হয়ে মহাপ্রভু এই ঘাটে এসে।
ধুইয়াছিলেন পদ মনের উল্লাসে ॥
সে অবধি গয়াধামে পুণ্য স্থান এই।
সকলই রয়েছে হায় গৌর খালি নেই ॥
গয়াতীর্থ মহাতীর্থ এ ঘোর কলিতে।
দীক্ষিত হয়েন প্রভু এইখান হতে ॥
পরম পুরুষ গৌর কৃষ্ণ পারাবার।
কোথা আছ এস হৃদে দেখি একবার ॥
সে কালের লোক ধন্য দেখেছে তোমায়।
আমাদের দাও দেখা ওহে দয়াময় ॥
পুণ্যাত্মা পাপাত্মা লোক তখনও ছিল।
কেন তবে নাহি পার কি হইবে বল ?
পুণ্যবান যেই জন তরে নিজ গুণে।
পাপীজনে দেও দেখা আপনারই গুণে ॥
প্রকট হইতে প্রভু কষ্ট যদি পাও।
যেরূপে যে ভাবে পার দেখা মোরে দাও ॥
শয়নে স্বপনে কিম্বা আহারে বিহারে।
জলে স্থলে শূন্যমার্গে সাগরে ভূধরে ॥
যখন যেথায় রব তোমা যেন পাই।
তোমা বিনা হৃদে মোর অন্য চিন্তা নাই ॥

সংসার বিষয় জালে জড়িত হইয়া।
মায়া মোহে মুগ্ধ হয়ে রয়েছি পড়িয়া ॥
দেখাও সে জ্যোতির্ম্ময় মূরতি তোমার।
ঘুচে যাক পাপ তাপ শোক দুঃখ ভার ॥
গৌর ভক্ত যার যথা যে ভাবেতে স্থিতি।
প্রণাম করিয়া মাগি চরণে ভকতি ॥

বৈষ্ণব চরণাশ্রিত
শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দাস দে।
৮ গয়াধাম, চানচোরা।

—০০—

মাধুরী।

(আমি) প্রেমের অঞ্জন নয়নে মাখিয়া কি শোভা হেরিনু আজ।
অতুল রূপের, মাধুরী লইয়া প্রকৃতি ধরিল সাজ ॥
(আমার) হৃদয়ের দুঃখ, অবসাদ ছায়া গেল দূরে—অতি দূরে।
অরুণের ভাতি—প্রকাশে যেমতি; অন্ধকার যায় স'রে ॥
কি উদার ভাব, দেবরাজ্য হ'তে, আসিল আমার প্রাণে।
আলোকিত হিয়া, যেন মহীতল শশী-কর বিতরণে ॥
যেন) ঐন্দ্রজালিকের, দণ্ডের প্রহারে কি ভাব সঞ্চার হ'ল।
মাধুরী মাধুরী, অপূর্ব্ব মাধুরী, কি মাধুরী ছড়াইল ॥
হেরি নভস্তলে, জলদ সঞ্চার, তাহে সৌদামিনী খেলে।
যুগল রূপের, অতুল লাবণ্য (যেন) প্রকৃতি ধরিল খুলে ॥
সাগর গামিনী, হেরিনু তটিনী, তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে ধায়।
অভিসারোদ্দেশে, রাধা বিনোদিনী, শ্যাম পানে যেন যায় ॥
বন ফুল হেরে, আনন্দ লহরী হৃদয়ের মাঝে ছুটে।
বনমালা গলে, যেন বনমালী অনন্ত আকাশে ফুটে ॥
তমালে জড়িত, কনক লতিকা হেরিলাম কি সুন্দর।
শ্যামাঙ্গের সনে, হেমাঙ্গ বরণী শোভে যেন মনোহর।

মাধবীরে হেরি, নয়ন ভরিয়া মনে পড়ে মাধবেরে।
অতসী চম্পক, হেরিয়া আমার মনে আনে শ্রীরাধারে॥
সরোবর নীরে, রক্ত কোকনদ ফুটিয়াছে মনোলোভা।
মনে প'ড়ে যায়, চরণ কমল নেহারি, রক্তিম আভা॥
এইরূপ আমি, যে দিকেতে চাই, কিমাধুরী পরকাশে।
যুগল রূপের, অঙ্গ কান্তি মাখি প্রকৃতি যেন বা হাসে॥
আজি প্রেম ভরে, যে মাধুরী হেরি, সে মাধুরী যেন পাই,
চিরদিন আমি, হে রাধারমণ! আর কিছু নাহি চাই॥
তাহ'লে নয়ন, হইবে সার্থক, জীবন সফল হবে।
দুঃখের তিমির, দীপ্ত প্রেমালোকে শান্তি হ'য়ে বিরাজিবে॥

শ্রীরসিক লাল দে।

জ্ঞান ও ভক্তি। [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

হাঁড়ীর জল তাপসংযোগে বাষ্প হয়, হাঁড়ী শূন্য হয়। কিন্তু শৈত্যযোগে জল জমিয়া বরফ হয় এবং হাঁড়ীতেই তিষ্ঠে। তদ্রূপ হৃদয়ে যখন ঈশ্বরের একটা ভাব আসে, তখন যার উত্তাপে সে বিলীন হয় তাহাই জ্ঞান, আর যার শৈত্যে জমাট বাঁধে তাহাই ভক্তি। শূন্য হৃদয় লইয়া ঈশ্বর অনন্ত এরূপ ভাবিতে গেলেই যাহাকে প্রাণে চায় তাহা উড়িয়া যায়। সে স্থলে এমন একটী কৌশল বা ভাব আছে, যাহাকে চিত্তে স্থান দিলে আর সে চাওয়া বস্তুটি লুকায় না বরং আরো নিকটে এগুয়ে আসে। এই কৌশলময় ভাবটীর নাম ভক্তি। উহা জ্ঞান নয়, বিজ্ঞানময়ী। তুমি ঈশ্বর ভাবনা করিতেছ, তুমি ভাবিতেছ ঈশ্বরের পা নাই। তোমার ভাবনানুযায়ী পার মত কিছুই তোমার চক্ষে ভাসে না। ভাল, তখন সত্য মিথ্যা বিচার তর্ক ছাড়িয়া একবার ভাব পা আছে। অমনি তোমার হৃদয়ে একখানা পার মত অপূর্ব্ব কিছু ঠেকিবে। অমনি তুমি কেমন হইয়া, হয় একটা তুলসীপত্র না হয় একটা ফুল ফেলিয়া দিবেই। এই প্রথম তুমি জীবন্ত পূজা জীবন্ত সেবা করিতে

দীক্ষিত হইলে। এই সেবা হইতে ভক্তির প্রবাহ ক্রমেই প্রবল হইতে থাকিবে। আবার যদি আপাত মধুর অলসের বন্ধু জ্ঞানকে টানিয়া আন এবং ভাব, "ঈশ্বর কি আমাদের মত যে তার দুটা পা থাকিবে ?" তখনই দেখিবে সেই ভাবসলিলটুকু ধূমায়মান হইয়াছে।

সুতরাং অলস জ্ঞানের নেত্রে যাহা মিথ্যা, সেই মিথ্যার কুহর হইতে যে সাক্ষাৎ মধুময় সত্য ফুটিয়া জাগ্রত হয়, ইহাই বিজ্ঞান, এবং সেই সত্যের ভিতর হইতে যে আনন্দরসের সঞ্চার হয়, তাহা বিজ্ঞানের প্রাণস্বরূপা ভক্তি। তুমি ঈশ্বরের অনন্তক্রোড় ভাবিতেছ, কিন্তু বস্তুতঃ আকাশ পাতাল বৃক্ষ লতাই তোমার চোখে ভাসিতেছে। তুমি যদি ঈশ্বরের দুর্লভ ক্রোড় প্রকৃতই তালাস কর, তবে তোমার অনন্তকে চাপায়ে ছোট করিয়া আন এবং একটুকু বিশ্বাস কর, দেখিবে মানুষের কোলের মত একখানা অদ্ভুত কোমল সুখশীতল কোল দাঁড়ায়েছে। তখন তুমি ঈশ্বরের ক্রোড়ে বসিবার আশা করিতে পার। এতদিন তুমি কোল না দেখিয়া কোলে বসিতে চেয়েছিলে, উহা আকাশ কুসুমবৎ মিথ্যা। ভক্তিতে ঈশ্বর প্রকৃতই মানুষ সাজিয়া আসেন এবং উহাই প্রেমরাজ্যসীমার আরম্ভ।

তুমি জ্ঞানাশ্রয়ে শ্রীমূর্ত্তি পাষাণ মাটি ভাবিতেছ। একবার এ ভাব আসে বটে। তাহা ধরিয়া থাকিয়া তুমি প্রতারিত হইতে চলিলে; সাবধান। ইচ্ছা করিয়া কি বলপূর্ব্বক একটু অন্য রূপ ভাবিয়া দেখদেখি, তুমি কি হইয়া যাও ? তোমাকে কে কোথায় লইয়া যায়! তুমি মুহূর্ত্তে কোন্ অমৃত ধামে চলিয়া যাও! দেখদেখি তোমার সে পাষাণ মাটি কি হয়ে দাঁড়ায়। দেখদেখি আজ পাষাণের ভিতর দিয়া তোমার কোন সৌভাগ্য ফুটিয়া উঠে! আজ পাষাণ জ্ঞানটুকু পরিত্যাগ না করিলে সে কি অমৃতসত্যে বঞ্চিত হইতে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তাই বলি, ভক্তি জ্ঞান নয়, বিজ্ঞানময়ী। সত্যের অন্তগুণে যে সত্য, তাহা পরম সত্য। "শ্রীমূর্ত্তি পাষাণ" এই সত্যের গর্ভে যে "শ্রীমূর্ত্তি পাষাণ নয়" আর একটী

সত্য খেলিতেছে, তাহাই পরম সত্য, পরমানন্দ, জ্ঞান নয় বিজ্ঞান!

তুমি ভক্ত, দৈবের কোপে ভাবিতেছ নাম (শ্রীনাম) একটা কিছু নয়। মাত্র কয়েকটা অক্ষর। আলস্যের দাস সাজিয়া ভাষা ভাষা একটা ভাব ধরিলে, কিন্তু ডুবিয়ে দেখদেখি,—একটু তলিয়ে দেখদেখি,—নাম অক্ষর (চিন্ময়) বলিয়া ভাবিতে পার কিনা! দেখদেখি নামে সত্যই সুধামধু ঝরে কিনা? রোগীর জিহ্বায় দুগ্ধ তিক্ত লাগে, তাই দুগ্ধ তিক্ত কি? ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতাবশতঃ নাম তোমার যন্ত্রের ঘাটে ঘাটে মিলে না, কাজেই রস উদ্গীর্ণ হয় না, নামে মিঠা লাগে না। বিশ্বাস ক'রে, প্রাণভ'রে, একবার "রাম রাম" বল দেখি, না হয় "মরা মরা" বল দেখি, মন্ত্র ফুটে যায় কিনা, প্রাণ শীতল হয় কিনা? নাম কালির আঁখর নয়, কালীর আঁখর! উহা সে চিন্ময়! চিন্ময় করাইয়া বা করিয়া লইতে হয়! তবে তো চাঁদ গলে, সুধা ঝরে! যদি বল "কিছু নয়" অমনি উড়িয়া বিলীন হইল; আর যদি ভাব "কিছু" অমনি জমাট বাঁধিল, বাষ্প না হয়ে বরফ হইল, ঘনানন্দের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল! অনন্ত সানন্ত হ'য়ে তোমার হৃদয় আলোকিত করিল!

তুমি গোলাপ ফুল দেখিতেছ। গোলাপটি ফুটিবার পূর্ব্বে তুমি ভাবিতে পারিতে কি যে এই কণ্টক বেষ্টিত কদর্য্য বৃক্ষের ভিতর হইতে এমন একটী অপরূপ নেত্রানন্দ মনোমদ সুন্দর ফুল বাহির হইতে পারে? বৃক্ষটির সহিত ফুলটির কোন সাদৃশ্য আছে কি? তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। অরূপের ভিতর যে আদিরূপ বিরাজিত আছে, সেই মৃগমদগন্ধী গোপাল গোলাপের ন্যায়ই ফুটিয়া যায়, ইহা তুমি বিশ্বাস করিবে না কেন? তুমি জ্ঞানের টিপে বিশ্বাস করিতেছ না। কিন্তু একবার বিশ্বাস করিলেই, ভক্তি তোমাকে টান দিয়া এমন এক অপূর্ব্বধামে লইয়া গিয়া এমন অপূর্ব্ব বস্তু সব দেখাইতে থাকিবে যে তখন তুমি পূর্ব্বাকার আত্মবঞ্চনার কথা মনে করিয়া স্তম্ভিত হইবে। (ক্রমশঃ) শ্রীকালীহর বসু।

পতিত জমী।

জমিদারের নিকট জমী লইয়া সকলেই কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্য তাহাতে কর্ষণাদি করিয়া থাকেন। সুচারুরূপে ভূমি কর্ষিত হইয়া তাহাতে যদি বীজ রোপিত হয়, তবে সেই বীজ হইতে সুফল লাভের আশাও আমরা করিতে পারি। পরিণামে সেই ভূমিজাত শস্যাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থে আপনাদিগের সাংসারিক উন্নতি বিধান ও জমীদারের খাজনা দান করিতেও যে সমর্থ হই, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমাদিগের আলস্য বশতঃ ঐ জমী কর্ষণাদি কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, তবে অত্যল্পকাল মধ্যেই যে তাহা পতিত হইয়া যায় ও তাহাতে নানাবিধ আগাছা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ক্রমশঃ সেই জমীর উর্ব্বরতা শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলে সে বিষয়েও কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। আবার সেই আগাছায় পরিপূর্ণ গরআবাদী জমীটী পুনর্ব্বার আবাদ করিতে হইলে অগ্রে অতি যত্নে সেই আগাছার মূলোৎপাটন করিয়া, কয়েকবার উৎখাত করিতে হয়। অনন্তর কর্ষণ করিয়া, উপযুক্ত কৃষক দ্বারা নিয়মানুসারে বীজ রোপিত হইলেই, সেই পতিত জমীও আবার সময়ে সুফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে।

সাংসারিক দৃষ্টিতে এ সংসারে বহির্জগতের কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, যেমন জমী সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ অন্তর্জগতের দিকে একটু স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও তাহা হইতে আমরা অনেক বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা আমাদিগের প্রধান জমীদার ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে যে চৌদ্দপোয়া জমী লাভ করিয়াছি, তাহার মৌরস স্বত্বও প্রাপ্ত হই নাই। কয়েক দিনের জন্য ঠিকা জমা লইয়া তজ্জাত শস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিছু ধর্ম্মরাজের নিকট রাজস্ব প্রদান করিবার ও অবশিষ্ট অংশ লইয়া, আমাদিগের ঐহিক উন্নতি বিধানের আশা করিতে পারি।

এই চৌদ্দ পোয়া জমীটী আমাদের মানব দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা অদ্যাপি এই জমীর মূল্য বুঝিলাম না! কি প্রকারে এই জমী হইতে অমূল্য ফললাভে সমর্থ হই, তাহার চিন্তা করিলাম না! দিনদিন এ হেন ফলবান জমীটী পতিত হইয়া যাইতেছে সে দিকে আমাদিগের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপও নাই! আমরা দিব্য অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, ঠিকে জমীর মৌরস স্বত্বাধিকার স্বাব্যস্ত করিতেছি। কিন্তু বুঝিতেছি না যে নানাবিধ কুমন্ত্রীর (ষড়রিপুর) পরামর্শে এখন আমরা আত্মহারা হইয়া, আমাদিগের এমন ভূমিটুকু আগাছায় (কুসংস্কারে) পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতেছি ও জমীদারের ভূমিকর (পুণ্য) দানে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার নিকট অপরাধী হইতেছি। যে দিন পাইক বরকন্দাজ (যমদূতগণ) লাঠি হাতে করিয়া, রাজস্ব আদায় করিতে আসিবে, সে দিন কি জবাব দিব? উত্তর দিতে না পারিলে তন্মুহূর্ত্তে আমার এ জমী কাড়িয়া লইলে তখন কি করিব? হায় হায়, আমরা কি কুহকে ভুলিয়াই আজ এ বিষম ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছি তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না! উপযুক্ত কৃষক (সদ্‌গুরু) আসিয়া, ভূমিকর্ষণ সম্বন্ধে সৎপরামর্শ প্রদান করিলেও তাহা আমাদিগের অভ্যাস দোষে অতি তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাই কৃষকেরাও সময়ে সময়ে উপযাচক হইয়া উপদেশ দিতে আসিয়া, বিফল মনোরথ হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। তবে আমাদিগের উপায় কি? কি করিলে আমরা এই সব কুসঙ্গীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্মে মনোযোগী হই, তাহা আমাদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে? কে আমাদিগকে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় নিজে হলকর্ষণ করিয়া, আমাদিগের এ জমী আবাদ করতঃ ফল দেখাইয়া দিয়া, আমাদিগকে মুগ্ধ করিবে? কে আমাদিগকে সেই ফলের সুমিষ্ট রসাস্বাদন করাইয়া, আমাদিগকে কুসঙ্গীর সঙ্গত্যাগে বাধ্য করিবে?

বুঝিলাম যে দিন আমাদিগের সুদিন আসিবে, অদৃষ্ট-চক্রের

সুখের অংশ যে দিন উপরে উঠিবে; সে দিন আর আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। সে দিন হয়ত স্বয়ং জমিদার মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি আমাদিগের উপর পতিত হইলেও হইতে পারে। তখন তাঁহার প্ররোচনায় সৎকৃষক আসিয়া, আমাদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিতেও পারেন। কোন সদাশয় কৃষক মহাশয় যদি একটীবারও নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়া, আমাদিগের চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দেন, তবে আমা-দিগের আবার জ্ঞানোদয় হয়; তখন আর আমরা কপথে কুপথে না ঘুরিয়া, আমাদিগের স্ব স্ব পথ খুঁজিয়া লইতে পারি। কোন্ পথ বা উপায় অবলম্বন করিলে, আমরা ভবিষ্যতে ধনবান হইতে পারি, তাহা আমরা তখন অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে সক্ষম হই। তখন আর আমাদিগের কোন চিন্তা থাকে না। তাই বলি এমন মানব জমী প্রাপ্ত হইয়া, আমরা হেলায় তাহাতে অনেক আগাছাকে আশ্রয় দিয়াছি। এখন তাহাদিগের মূল সকল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে ও শাখা প্রশাখায় দিন দিন সে সকল গাছ আরও বিস্তৃত প্রসর লাভ করিতেছে। এই হেতু আমরা নিতান্তই হেয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি।

এই সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত মানব দেহে যদি আমরা কুসংস্কারের বীজ রোপন না করিতাম, তবে কি আমাদিগের এমন সোণার ভুমি এমন ছারেখারে যাইতে বসিত? তাহা হইলে সাধক-চূড়ামণি রাম-প্রসাদের মত এ জমীতে বাস্তবিকই সোণা ফলাইয়া লইতাম। কিন্তু কি বলিব কালমহাত্মে আমরা এখন জ্ঞানধনে নিতান্তই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। তাই আজ আমাদিগকে এত চিন্তিত হইতে হইতেছে।

কৃষকগণও অনেক বার নিজের নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমাদিগের জমী আবাদ করিতে আসিয়া, শেষে অকৃতকার্য্য হওয়ায় আর তাহারা আমাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিতেও রাজী নহেন। অতএব এক্ষণে যদি সেই দয়ানিধি ধর্ম্মরাজের আশ্রয়-গ্রহণ করিতে পারি, যদি তিনি কিছু দিনের কর মাপ করিয়া

আমাদিগকে জমী আবাদের জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন, দুই এক জন কৃষককে যদি আমাদিগকে কৃষিকর্ম্ম শিখাইতে বাধ্য করেন; তবেই যদি আবার আমরা মানুষ হইতে পারি। সুতরাং এক্ষণে একমাত্র তাঁহারই কৃপাকণা ব্যতীত আরত কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব বন্ধুগণ! আসুন্ আজ আমরা সকলেই কাতর-কণ্ঠে সেই দয়াময়ের নিকট দয়া ভিক্ষা করি। কারণ আমাদের এ পতিত জমী আবাদ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাই দুঃখের সহিত দীনহীন নিম্নের একটী গীত গাইতেছে।

বাউল।

তাই বলি মন, দিন থাকিতে আবাদ ভুলোনা।
এমন মানব জমী রহিল পতিত, চেয়ে দেখ্‌লে না॥
আগাছাতে পূর্ণ জমী, দেখ্‌তে পাওনা মন তুমি।
দিনে দিনে জমীর হানি, হচ্ছে তাকি জান না॥
চোদ্দ পোয়া জমি ঘেরা তায় ঠিকে জমা থাজনা করা।
কোন্ দিনেতে পিট্‌বে ঢেঁড়া, ফসল খাওয়া হবে না॥
ফসল যদি আশা কর, আগাছার শিকড় মার।
তার পরে বীজ রোপন কর, কষ্ট পেতে হবে না॥
চাষ যদি না করিবে, কি উপায়ে খাজনা দিবে।
জমী তোমার কেড়ে নেবে, পালাতে পথ পাবে না॥
অধম বলে ফলস হ'লে, খাজনা তুমি দেবে ফেলে।
তখন আপনি জমী ছেড়ে দিলে কেহ কিছু ব'লে না॥

যোগেন্দ্র নাথ ভক্তিবিনোদ,

আর্য্যধর্ম্মপ্রচার সমিতি শিবপুর, ছোট ভট্টাচার্য্য পল্লী, শীতলাতলা।

—০—

কানন (সমালোচনা)।

পূর্ব্বে গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের বড় আদর ছিল; কেননা তখন ক্বচিৎ কেহ এই মহদ্ব্যাপারে হাত দিতেন। এখন সে আদর নাই গ্রন্থ ও গ্রন্থকার অনেক। গ্রন্থ পাঠ করিয়া গুণের বিচার ও পুরস্কার করিবার দিন অতীত হইয়াছে, সে সমাদর এখন প্রতিপত্তির উপর নির্ভর, সুতরাং অনেক অমূল্য জিনিষ অবিচারিত পরিত্যক্ত হয়। "কানন" একখানি প্রবন্ধ পূর্ণ নৈতিক গ্রন্থ, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণে ইহার কলেবর পরিশুদ্ধ বাঁকুরা দর্পণ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রসিক লাল দে মহাশয় ইহার রচয়িতা। ইহার সুখপাঠ্য প্রবন্ধ আমাদের ভক্তির পাঠকগণও আস্বাদ করিয়াছেন। কাননের সারগর্ভ প্রবন্ধ গুলির মধ্যে (১) সমালোচনা ছলে অদ্য একটী ভক্তি-রসোদ্দীপক প্রবন্ধ আমাদের পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

"বিশ্বাসের আশা বাণী।" এই সংসার বড় ভয়াবহ পরীক্ষার স্থান। এই সংসার মহাসাগর পার হইতে হইলে বিশ্বাসকে মানস-তরীর কর্ণধার না করিলে পার হইবার উপায় নাই। আমিই সত্যের পাইল তুলিয়া দিয়া অশেষ তরঙ্গমালা বিক্ষোভিত সমুদ্রের মধ্যে ——প্রবল ঝটিকার প্রচণ্ড আঘাৎ ব্যাহত করিয়া সাগরগর্ভ নিহিত পথের প্রকাণ্ড বিঘ্ন স্বরূপ পর্ব্বত সমূহ অতিক্রম করিয়া সেই শান্তি-প্রদ—নীরব আনন্দের আধার ও পুণ্যময় পুলক ভরা বেলা ভূমিতে লইয়া যাইব। যে দেশের পবিত্র সুখ, পার্থিব সুখে উন্মত্ত জীব উপলব্ধি করিতে পারে না, যে দেশে হাহাকারের প্রবল প্রতাপ নাই—বিষাদের কুহেলিকাময়ি অস্পষ্ট ছায়া নাই—যে দেশে ঘৃণ্য অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন, দ্বেষ, হিংসা, ভালবাসার নামধারিণী কপটতা নাই, যে দেশে প্রেমের নামে কাম বিক্রয় হয় না, সে দেশে অনন্ত জ্যোতির অতুলপ্রভা সততই উদ্ভাসিত—সেই জ্যোতির্ম্ময়পুরে—সেই দ্যুতিমান দেব দেব মহাদেবের অমৃতময়

আগারে আমি তোমায় লইয়া যাইব—এস আমার সঙ্গে সঙ্গে এস !!

রাজার পুত্র সপ্তম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব বিমাতার তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া, আমার উপর নির্ভর করিয়া, আমার হস্তধারণ করিয়াই মায়ের কথায় আস্থা রাখিয়া "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি" বলিতে বলিতে ছুটিয়া ছিলেন। হিংস্র জন্তু সমাকুল গভীর বনমধ্যে ধ্রুব একা; তাঁহার শিশু-হৃদয়ে অন্য চিন্তা নাই; কাতর ক্রন্দনে গভীর আর্ত্তনাদে তিনি কেবল বলিতে লাগিলেন "কোথায় পদ্মপলাশলোচন!"

মা বলিয়াছেন তিনিই আমাদের একজন—তিনিই আমাদে বন্ধু—তিনিই আমাদের সকল দুঃখ, সকল অভাব দূর করেন; তা মায়ের কথা শুনিয়া তিনি আতুর স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি!"

মায়ের কথায় ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া শিশু ধ্রুব আমার হস্ত দৃঢ়-রূপে ধারণ করিয়া রহিলেন, তাঁহার সকল ভয় দূর হইল, গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এ ছার মাটির রাজ্য তুচ্ছ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া সেই স্বর্ণ রাজ্যের স্বর্ণময় সিংহাসনে চলিয়া গেলেন। বিশ্বাসই সেই মহারাজ্যের চালক, এই জ্ঞানে ধ্রুব নিজ কর্ত্তব্য সিদ্ধ করিলেন; তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল, জীবন সার্থক হইল।

তারপর। প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন; কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর জগদীশ্বরের উপর। পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে ভূতলে পাতিত হইতেছেন—তখনও তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের লেশ মাত্রও নাই, জলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপিত হইতেছেন, তখনও প্রহ্লাদের

---

(১) মা, মরারমাগা, কুপমণ্ডুক, চোখ গেল, মানা, ভূষণ, নন্দনকান, বিশ্বাদের আশা বানী, প্রীতি নিকেতন, বিপদে শিক্ষা, শুকুনী পুকুর, আয়োজন, গুরুভক্তি, বিশ্বাস, স্বর্গের ছবি, সে কি ধন, এই ১৭টী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে ১০৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপন।

† কুহেলিকাময়ী অস্পষ্ট ছায়া।

প্রাণের মধ্যে বিশ্বাস জড়িত। প্রহ্লাদ বিশ্বাসময় হইয়া গিয়াছেন, তাই ভাবে নিমগ্ন প্রহ্লাদ পিতার প্রতি বলিলেন—"জড় স্ফটিকস্তম্ভে আমার হরি আছেন বইকি ?"

অবিশ্বাসী মোহাচ্ছন্ন জীব, আমার প্রতি প্রহ্লাদের দৃঢ়তা দেখিলে ? এই দৃঢ়তায় তিনি হরি বিদ্বেষী পিতাকে দেখাইলেন "স্ফটিকস্তম্ভে নৃসিংহ মূর্ত্তি !"

তাই বলিতেছি "[illegible]সের পথ বড়ই সরল, বড়ই সোজা। আমার হাত ধরিয়া এস—[illegible] [illegible]ণারাম হরিকে দেখিয়া জীবন মধুময় করিবে, প্রকৃত শান্তিলাভে সমর্থ হইবে।

আমার বলেই অর্জ্জুন কৃষ্ণের ন্যায় সারথি পাইয়াছিলেন। এস ভাই ! তাই বলি, আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে চল—মানব দেহে দেবতার ধর্ম্ম পাইয়া মহাদেবের প্রিয়তম হইবে।"

বিশ্বাস আমাদিগকে আশ্বাস বানী দ্বারা কেমন মধুর রবে আহ্বান করিতেছেন ; কিন্তু হায় ! আমরা কি মোহকূপে নিমগ্ন, যে কূপমণ্ডুকের ন্যায় মাটীর সংসারকেই সর্ব্বস্ব জানিয়া তাঁহার মধুময় বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি। অহো ! ভ্রান্ত মানব আমরা—আমাদিগকে ধিক্।

ইত্যাদি অনেক সুখপাঠ্য প্রবন্ধে কানন খানি সুশোভিত। গ্রন্থকার কাননের সমগ্র আয় সোণামুখী গরীব ভাণ্ডারে উৎসর্গীকৃত করিয়া আমাদের আরও ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। মূল্য ॥০ আনা অসমর্থ পক্ষে ।/০ আনা ; গ্রন্থকারের নিকট পোঃ সোণামুখী জেলা বাঁকুড়া এই ঠিকানায় পাওয়া যায়। সহসম্পাদক।

—০০—

বৈষ্ণব কার্য্যানুশীলন।

ও বৈষ্ণব গ্রন্থ সমালোচনা।

সমাজে আজকালি অনেকগুলি বৈষ্ণব পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে। সমাজের বহুল উপকার ও অভাব মোচন ইহার দ্বারা

সংসাধিত হইতেছে সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের এক মহান্ অভাব, কাহারই লক্ষ্যে আসিতেছে না, সে অভাব নবীণ বৈষ্ণব গ্রন্থকার গণের কার্য্যকারীতার উৎসাহ দান। হায়! হায়! সাধারণ সাময়িক পত্রিকার এই অসাধারণ গুণে অনেকানেক প্রাকৃত লেখক গণ খ্যাত-নামা হইলেন কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব পত্রিকা সম্পাদক গণের নিকট নবীন বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ অসাধারণ আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াও চিরদিন অন্ধকারের আব্ছায়ায় ঢাকা রহিলেন। এক সময়ে বৈষ্ণব সমাজে [illegible] ও বৈষ্ণব গ্রন্থ-কারের এতই আদর ছিল যে সে সময় মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলেও সেই সমস্ত গীত, কবিতা, গ্রন্থ, হস্তে হস্তে অনুলিপি হইয়া সমগ্র গৌড় মণ্ডল ছাইয়া গিয়াছে, এমন কি সমস্ত উড়িষ্যা, দক্ষিণ সমুদ্রকূল রাজরাজরা প্রতি রাজধানী, নেপাল প্রভৃতি সুদূর প্রান্তেও সে বৈষ্ণব কবিত্বের সমাদর দেখা যায়। বৈষ্ণব কবিদের যে পরস্পর গুণো-ল্লাসিতা ছিল, বৈষ্ণব গ্রন্থ ও পদাবলীতে তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব বৈষ্ণবের গুণ দেখিলে আত্মহারা হইবেন, কিন্তু এখন সে দিন উল্টাইয়া গিয়াছে। পরগুণে প্রীতির পরিবর্ত্তে আত্মগুণে উন্মত্ততা এখন বৈষ্ণব সমাজেই অধিক দেখিতেছি, যেন কাহার ও প্রগাঢ় অভিসম্পাতে এই মহাদোষে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ লণ্ড ভণ্ড হইতেছে। বৈষ্ণব সমাজে অধুনা তিনটী দল দেখিতেছি, সাধক, লেখক, সমালোচক বা সংস্কারক। লেখক দলের মধ্যে পরস্পর অনেকটা বৈষ্ণব ব্যবহার অর্থাৎ গুণোল্লাসিতা দেখা যায়, কিন্তু প্রাচীন ধরণের কোন কোন সাধক ও নবীন ধরণের সংস্কার-দের যে কি এক অবৈষ্ণবোচিত দম্ভময় ভাব, দেখিলেই প্রাণের কোমলতা বিশুষ্ক হইয়া যায়। যে সমাজের নিরভিমানীতা ও পরগুণোল্লাসিতাই মূল চিহ্ন, সে সমাজে এ কি উৎপাত? অভিমান যে কুসাধকের লক্ষণ, ইহা অনেকে মনে করেন না। সমাজে এখনও যে সকল সুসাধক নিরভিমানী ভক্ত সময় সময় দেখা দিয়া থাকেন,

তাঁহাদের নিরভিমান সৌম্য মূর্ত্তি, বিশ্বপ্রেমে গদগদ কোমল হৃদয় দেখিলেই কাঁদিয়া পদে পড়িতে ইচ্ছা করে। কিম্বা অমৃতায়মান সস্নেহ মধুর বাক্য, শুনিতে শুনিতে অন্তঃকরণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। দূরে থাকিয়াও এমন অনেকানেক মহাপ্রাণ ভক্তির উদার প্রেম লিপি পাইয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে আত্ম বিক্রয় করিয়া বসি, আবার সময় সময় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোদ্যান শ্রীগৌড়মণ্ডল আগাছায় পূর্ণ দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যায়, তাই সময় সময় দুই একটী প্রাণের দুঃখ হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বৈষ্ণবজন ক্ষমা করিবেন।

আমরা চাই কি ? আমরা চাই, বৈষ্ণব সমাজে বিদ্বজ্জনের সমাবেশ, চাই সেই প্রেম-মৈত্রী কৃপা—অপেক্ষা, চাই সেই বৈষ্ণবোচিত একপ্রাণতা। ইহা যদি চাহিতে হয়, তবে যাঁহাদের চিন্তাশীলোতায় আধ্যাত্মিকতা আছে, যাঁহাদের পবিত্র লেখনী সেই পূর্ণপ্রেমাধারের প্রেম রঙ্গে ডুবিয়া আছে, সেই বৈষ্ণব কবি—বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের উৎসাহবর্দ্ধন আবশ্যক। অনেক সময় কোন কোন বৈষ্ণব সহযোগীর তীব্র সমালোচনায় কোন কোন গ্রন্থকারকে নিস্পিষ্ট হইতে দেখি, ইহার উপকারিতা অস্বীকার করি না, কিন্তু নবীন বৈষ্ণব গ্রন্থকার গণের মধ্যে কাহার উল্লেখযোগ্য গুণের অনুশীলন দেখি না, ইহাতে বড় দুঃখিত হই। বর্ত্তমান সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্মের হিতানুষ্ঠাতৃগণের সংখ্যা অতি অল্প, ইহারা যাহাতে প্রচুর উৎসাহ প্রাপ্ত হন, সর্ব্বত্র খ্যাতি সম্পন্ন হইয়া আদর্শ স্বরূপ দণ্ডায়মান হন, প্রত্যেক বৈষ্ণব সম্পাদকগণেরই সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, অতএব আমরা সমুদয় বৈষ্ণব সহযোগী সমুদয় বৈষ্ণব সভার নিকট অনুরোধ করি। যাঁহারা বিশ্বপ্রেমিকতার উত্তেজনায় বৈষ্ণব পত্রিকা পরিচালন ও বৈষ্ণব সভা স্থাপন কার্য্যে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সেই অবারিত হিতানুষ্ঠান স্বার্থের বা প্রতিপত্তির গতিতে আবদ্ধ দেখিলে বাস্তবিকই সকল আশার মূলে কুঠারাঘাত হয়।

শ্রীধাম প্রচারিণী সভা। আমরা শ্রীনবদ্বীপ—মায়াপুর—শ্রীধাম প্রচারিণী সভার কার্য্য কলাপ দর্শনে বড়ই প্রীত ও আশ্বাসিত হইতেছি। বৈষ্ণব হিতানুষ্ঠাতৃগণের প্রতি উৎসাহ দান এই সভার একটী নিঃস্বার্থ বৈষ্ণবতা। সুলেখকগণের পুরস্কার, যোগ্য ব্যক্তিগণকে বৈষ্ণব উপাধি দান, হিতানুষ্ঠাতৃগণের নামোল্লেখে ধন্যবাদ দান, এই সকল সুমহৎ বৈষ্ণব যোগ্য গুণের নিকট সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ কৃতজ্ঞ। যদি প্রকৃত উচ্চতা কিছু থাকে তাহা ইহারই নাম। কয়েক বৎসর ধরিয়া "নিবেদন" ও "বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকায় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার ধন্যবাদ প্রাপ্ত মহাত্মাগণের পবিত্র নাম দেখিয়া আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুত্থানের অনেক আশা পাইতেছি। কিন্তু কাহাকে কি কি মহদ্গুণের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস থাকিলে আমরা চরিত্র পরিবর্ত্তন ও বৈষ্ণবতা শিক্ষার আদর্শ পাই। শ্রীগৌড়মণ্ডলে সকল গৌরবের কেন্দ্র স্থল শ্রীনবদ্বীপ, সে শ্রীধামস্থ মহাসভা হইতে আমরা অনেক আশা করি, আর আশা করি শ্রীগৌড়মণ্ডলের বৈষ্ণব সাম্প্রদায়মাত্রেই এই বৈষ্ণব গৌরব সংরক্ষিণী শ্রীধাম প্রচারিণী মহাসভার উন্নতি কামনায় সর্ব্বতোভাবে যোগদান করিবেন। এক সময় যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম উন্নতির উচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এই প্রকারেই হইয়াছিল. সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ একতাবদ্ধ হন, শ্রীধান প্রচারিণী সভার ইহাই উদ্দেশ্য, আমরা এই মহদুদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

আগামী সংখ্যা হইতে আমরা "ভক্তি" পত্রিকায় বৈষ্ণব হিতানুষ্ঠাতৃগণের এবং বৈষ্ণব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের বিষয় অনুশীলন করিবার প্রয়াসী, আশা করি নিঃস্বার্থ বৈষ্ণব মণ্ডলী ও বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ আমাদের এই সাধু সঙ্কল্পের সহকারীতা করিয়া কৃতার্থ করিবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় মহাত্মাগণের সহানুভূতি সূচক পত্রাদি পাইবার আশা করি।

সহকারী সম্পাদক,
শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ।
গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ।
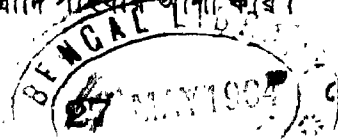
ভক্তি।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্নকর্ত্তৃকসম্পাদিত।
শ্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

২য় খণ্ড জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস ১৩১১। ১০ম ১১শ সংখ্যা।

হাবড়া, রিলায়ান্স প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভক্ত মণ্ডলীর সাহায্যে—
শ্রীভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।
ঠিকানা—হাবড়া—কৌড়ার বাগান শীতলা তলা।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দ রূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

ত্বমেব কর্ত্তা স্রষ্টা চ সংহর্ত্তা জীব বৎসলঃ
জানন্নপি ন জানামি মায়য়াহং বিমোহিতং
বিধেহিতত্ত্ববিজ্ঞানং বিধেহি ভক্তিমুত্তমাং
যয়া লব্ধ পরিজ্ঞানো ভজেহং ত্বাং দয়ার্ণবং।

হে সর্ব্বজীবজীবন! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই স্রস্টা, আবার তুমিই সংহর্ত্তা; ইহা জানিয়াও জানি না, অর্থাৎ কখন কখন ঠিক মনে হয়, তুমিই সকল, আবার কার্য্যকালে সে ধারণা রাখিয়া কার্য্য করিতে পারি না, সুখ পাইলে অহঙ্কারে মাতিয়া যাই, দুঃখে পড়িলে কাঁদিতে থাকি, হে জীববৎসল! তোমার মায়ায় আমি বিমুগ্ধ, তাই তোমার লীলা খেলা বুঝি না, সকলই তোমার কার্য্য ইহা ধারণা করিতে পারি না, আমার অলীক কর্ত্তৃত্বে আমি জ্ঞানহারা হইয়া পাপের ভাগী হই। অতএব হে দীননাথ আমায় তোমার স্বরূপ তত্ব জানাইয়া দাও, তোমার তত্ত্ব জানিয়া তোমার কর্ত্তৃত্বে আমার কল্পিত কর্ত্তৃত্ব মিশাইয়া আমি ধন্য হই। হে দয়াময় উত্তমা ভক্তি দাও, যাঁহার প্রভাবে তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া অজ্ঞান নাশ করত একমাত্র ভজনীয় দয়ার সাগর যে তুমি—তোমার ভজনা করি, তোমার দয়ার সীমা নাই, তুমি দয়ার সিন্ধু, আমি অজ্ঞানাঁধারে ত্রিতাপ তাপে তাপিত হইয়া বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, তোমার ভাব সিন্ধুতে আমায় ডুবাইয়া রাখ, তাহা হইলে সকল জ্বালা দূরে যাবে, প্রাণ শীতল হবে।

দীনবন্ধু।

ভক্তি—(অধম ও উত্তম)।

সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, জাতেষ্ট্যাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত এবং সগুণব্রহ্মবিষয়ক মানসব্যাপাররূপ উপাসনা দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক সঞ্জাত হয়। অর্থাৎ "ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোহন্যদাখিলম-নিত্যমিতি বিবেচনং" উদ্ভূত হয়। এই বিবেক হইতে নিত্যে অনু-রাগ অনিত্যে বিরাগ জন্মে। "ইহামূত্রফলভোগ বিরাগঃ" বা বাসনা পরিশূন্যকেই মুক্তি বলা যায়। এখন সাধনার দুটি পন্থা পাওয়া যায়,—বিরাগের পুষ্টি ও অনুরাগের উদ্দীপন।

একশ্রেণীর লোক চিত্তদৌর্ব্বল্যবশতঃ কর্ত্তব্য হারাইয়া বিরাগের আশ্রয় গ্রহণ করে। কর্ম্মে দিন দিন তাহাদের শৈথিল্য বাড়ে। তাহাদের সহিত ভক্তির কোনই সম্বন্ধগন্ধ নাই। কিন্তু যাহারা "নেতি নেতি" তত্ত্ব বিচার করিয়া বৈরাগ্যের উদ্দীপন সেবায় নিরত থাকে তাঁহাদের কথাই এই প্রবন্ধের প্রথম আলোচ্য। তাঁহারা অনিত্য বস্তু নিচয়ে "নেতি নেতি" করিয়া অনিত্যের অতীত কোন বস্তুর তাল্লাস করেন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ আছে। এইটি নিত্য নয় সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন্‌টী নিত্য তাহা বলা হয় না। কিন্তু "এইটি অনিত্য" বলিলে, নিত্য বস্তু কি, তাহার একটী জ্ঞানা-ভাস আছে, বুঝিতে হইবে। নিত্যের সহিত পরিচয় না থাকিলে, কেমন করিয়া কোন্ বস্তুকে অনিত্য বলিয়া ত্যাগ করিব ? তবে যে আমরা সাধারণতঃ অনিত্য বলি, কেবল সুখ না পাইয়া অথবা শুনা কথায়। জগৎ অসৎ সুতরাং স্ত্রীপুত্রাদি কেহ কারো নয়, ধনদৌলত মিথ্যা, এমন কি নিজ দেহও মিথ্যা মায়ার ভেল্কি—এই অবাস্তবতার অনুধ্যান করিতে করিতে স্বপ্রকাশ নিত্যের প্রকাশ সম্ভবপর। কিন্তু কার কত কালে সম্ভবে কে জানে ?

এক শ্রেণীর সঙ্গীত পাঠে বা শ্রবণে আমরা অবগত হই যে

কতকগুলা লোক মানবের প্রাণে "সংসার অসার" এইরূপ কতক-গুলি পদ গাইয়া আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে।

"বাঁশের দোলাতে উঠে' কেহে বটে,
যাচ্ছ চলে শ্মশান ঘাটে।" (ফিকিরচাঁদ)

এই প্রকৃতির গান দুএকটী নয়। এই সকল সঙ্গীত যথার্থই মানবের কোন মঙ্গলসাধন করিতেছে কিনা বিচার্য্য। ঘোর তুফানে কি তরঙ্গে পড়িয়া লোক স্বতঃই প্রাণের উচ্ছ্বাসে কোন্ প্রাণের বন্ধুকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে থাকে। তখন নিত্যানিত্য "নেতি নেতি" বিচার বিনাই প্রাণে বিশ্বাস ও নির্ভরের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। তখন তাঁহার চিত্তের অবস্থা যেরূপ হয়, ঐ প্রকৃতির সঙ্গীত গুলির শ্রবণেও চিত্তে ঠিক তদ্বিধভাবের সঞ্চার হয়। মুহূর্ত্তে নিত্য ঈশ্বরের সহিত একটা পরিচয় হইয়া যায়। অথচ ঐ সঙ্গীতে ঈশ্বর সম্পর্কিত উপদেশ বড় একটা পাওয়া যায় না।

"নেতি নেতি নেতি" ঢিমা তেতালায় বড় একটা উচ্ছ্বাস বাঁধে না, প্রাণ খুলে না। কিন্তু বিষয়ের অসাড়তার আকস্মিক আতঙ্ক আমাদিগকে অকস্মাৎ মানুষ করিয়া দিতে পারে।

যদি বিষয়েতে সুখ থাকিতয়ে,
তবে লালাজী ফকির হত'না। (কস্যাচিৎ)

লালাজীর মত লোক কয়জন হইতেছে। তাঁহার আদর্শ বৈরাগ্য হইতেই এই গানটীর সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা পাঠে প্রাণে কি এক মদিরাস্রোত প্রবাহিত হয়। বিষয়ের অসারতা উপলব্ধি করিয়া যাহার হয়, তাহার মুহূর্ত্তে; তা না হইলে, সাধনক্রম অবলম্ব্য।

কিন্তু ইহা সত্যের সত্য যে ঈশ্বরে একটু বিশ্বাস না থাকিলে, বিষয়ের অনিত্যত্বের ও অসারত্বের তরঙ্গ চিত্তে উঠিতে পারে না। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সংসারকে "ধোকার কাটি" বলিয়াছেন। মা আনন্দময়ীর আনন্দপীযূষ পান না করিয়া তিনি "ধোকার কাটি" বলিয়া সংসারকে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। কারণ মায়ার

মদিরা পাত্র ত্যাগ করা সহজ কি ? মধু থাকিতে মৌমাছি মৌচক্র ছাড়িয়া যায় কি ? অন্য কোনও উৎকৃষ্ট বস্তুর রসাস্বাদ ভিন্ন সংসার-মধুর স্বাদের তুলনা চলে কি এবং হাতের জিনিষ ফেলিয়া দিতে পারা যায় কি ?

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন ;—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥

আগে নিতাইচাঁদে বিশ্বাস, তাঁহার শক্তিতে বিশ্বাস, তাঁহা করুণায় বিশ্বাস তৎপর প্রার্থনা। সংসারে এখনও বাসনা ত এই প্রতিবন্ধকে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুরাগরসে তৃপ্ত হইতে পারিতের না। তাই, ঠাকুর মহাশয় কৃপাভিক্ষা মাগিতেছেন। স্বাদু গোর রসের স্বাদ পাইয়াই রঘুনাথ দাস গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন অতএব এই সিদ্ধান্তে আনা যায় যে অনুরাগই বিরাগের কারণ বিরাগ অনুরাগের কারণ নয়। তবে অনুরাগ আগে কোথায় মিলে কেমন করিয়া মিলে ? ইহার উত্তরে বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে বিশ্বাস, উহা স্বাভাবিক। ক্ষুধায় খাওয়ায়, স্বভাবে ভজায়। দুগ্ধ জাল দিয়া ঘন করিলে মিঠা লাগে, সুতরাং কাঁচা দুগ্ধে মধুরতা আছে ; তদ্রূপ. সংসারের মোহে অনুভব কর আর না কর, ঈশ্বর বিশ্বাস মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে সততই আছে। সেই লুক্কায়িত স্বভাবের ধাক্কায়ই সংসার অসার বলিয়া কথাটার জনসমাজে বহুল প্রচার।

তবে বিরাগের পরিপুষ্টি যে একটা সাধনের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহার হেতু অন্যরূপ। আদৌ "ঈশ্বরোঽস্তি" মন্ত্রে উপদিষ্ট হও, তৎপর নিরন্তর ভাবনা কর যে জগৎ মিথ্যা। মিথ্যা বলিয়া যতই ভাবিবে, ততই নিত্য বস্তুর জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতে থাকিবে এবং তোমাকে পীযূষাস্বাদ করাইয়া আকর্ষণ করিতে থাকিবে। অনুরাগ লইয়া আসিয়াছ, অনুরাগেই মজিবে। বিরাগ

কেবল আনুষাঙ্গিক একটা অবস্থা। উহা অনুরাগের উদ্দীপক হইলেও অনুরাগ পত্রেরই পৃষ্ঠান্তর। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডাদি মিথ্যা ভাবিতে ভাবিতে নিজ দেহও মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধ হয়। তখন আত্মা ফাঁকতালে পড়িয়া যায়, অমনি পারকুল নাই এমন একটা কি আসিয়া টক্ করিয়া তাহাকে গিলিয়া ফেলে, যেমন পাখা পাইয়া উই উড়িলে ফিঙ্গা ছোঁ মারিয়া গ্রাস করে! অথবা, ততটুকু সাধারণতঃ না হউক, কি যেন এক অমৃত জ্যোতিতে পড়িয়া অভিষিক্ত হইতে থাকে। ইহা ব্রহ্মানন্দের অবস্থা। এই ব্রহ্মানন্দের উপরে যদি আর কোন সুখাস্বাদ থাকে, তাহা শাস্ত্রানুযায়ী দর্শাইতে প্রয়াসী হইব। অনধিকারীর পক্ষে এ চর্চ্চা গুরুতর সমস্যা। যতকাল পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মানন্দ মিথ্যা জগতের সহিত আবার মাখিয়া প্রত্যেক বস্তু দিয়া স্ফূরিত হইয়া বিশ্বপ্রেম উৎপাদন না করিবে, অনবচ্ছিন্ন ঈশ্বর অবচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত না হইবে, ততদিন উহা হউক্ ব্রহ্মানন্দ, অধম ভক্তি।

নববিধা ভক্তি দিয়া অনুরাগের অর্চ্চনা কর, সেবা কর, বিরাগ আপনিই আসিয়া তোমার সেবার সহায় হইবে। না হয় না হবে। ভক্তি বিরাগের বড় ধার ধারে না। এই নববিধা সেবার ফলে অবধূত নিত্যানন্দ শক্তি তোমাতে প্রবেশ করিবে! নামে রুচি-জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবনময় দৈন্যমাখা বিশ্বপ্রেম তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। এই প্রেমের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে ব্রহ্মানন্দ সমুদ্রে যাইয়া পড়িবে। সমুদ্র-সলিল যেমন সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, ব্রহ্মেরও সর্ব্বভূতে সর্ব্ব বস্তুতে প্রবিষ্টতা অনুভব করিয়া পরমানন্দে বিভোর হইবে, ইহা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ—উত্তম ভক্তি। এই উত্তম ভক্তি-দুগ্ধেরও আবার ছাকা নির্য্যাস সর উত্থিত হয়।

দুগ্ধের পরিণাম যেমন মধুর হইতে সুমধুর মাখম ঘৃতাদি, ব্রহ্মানন্দের পরিণাম পূর্ণানন্দলীলারস। ব্রহ্মানন্দ তরল, পূর্ণানন্দ উহার ঘনাবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অনু-

শীলন। দশমস্কন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ পীযূষের মন্থনঘটিত কাব্যলীলা-সুধা। কে জানিত, ক্ষীরোদ সিন্ধুতে এতগুলি ভাল বস্তু, নিহিত ছিল ? কে জানিত, ব্রহ্মানন্দের গর্ভেও অনন্ত আনন্দ-কেলির বৈচিত্র নিহিত আছে ? ব্রহ্মানন্দকুসুমের ভিতর একটী অদ্ভুত মধু জগৎ চলিতেছে। জীব কেমন করিয়া তাহার আস্বাদ করিবে, তাই শ্রীবৃন্দাবন মুকুরে তার প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাকে প্রকট লীলা বলা যায়। জগতের ধর্ম্মগুলি ব্রহ্মানন্দ চন্দ্রলোকে যাইবার পৃথক্ পৃথক্ সিঁড়ি। উহারা সকলেই প্রশস্ত। কিন্তু সেই চন্দ্র-লোকের সুধা-সরসী হইতে যে একটী দিব্য নলে অমৃতকমল উদ্গত হইয়াছে, উহাতে পৌঁছাইবার পথ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জন্যই একমাত্র ঐ রাগানুগ মৃণাল। শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ সেই কমলধামে আরোহণ করিবার সরল সুন্দর কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে নমস্কার!

বৈষ্ণবজনানুগ
শ্রীকালীহর বসু।

তুমিই সব—তোমাতেই সব।

যোগীগণ সর্ব্ব মূলে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ, এই লক্ষণ চতুষ্টয় যুক্ত জ্যোতির্ম্ময় নির্গুণ ব্রহ্ম একমাত্র স্বীকার করেন। ইহঁাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ বাসুদেব কহেন। ইহার নাম বৈদিক নির্গুণবাদ।

তান্ত্রিক নির্গুণবাদ অন্তে অরূপ স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা নামকরণ করিতেও অস্বীকৃত নন। শক্তি তন্ত্র ঐ জ্যোতিঃ দুই ভাগ করেন, শুক্ল জ্যোতিঃ সদা শিব, কৃষ্ণ জ্যোতি ত্রিপুরা ভৈরবী।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বেদের পাঁচটী সূক্ত দ্বারা পঞ্চ সাকার মত স্থাপন করেন। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপ, বৈষ্ণব এই পঞ্চ সগুণ উপাসনা। নিরাকারে জ্ঞান লাভার্থ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ জ্ঞান উপস্থিত হইলে সাকার ভাব বিদূরিত হইয়া

নিরাকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানকে অদ্বৈত জ্ঞান বলে, ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তির উপাদান। ইহার স্থাপয়িতা শঙ্করাচার্য্য ইহা নহে, বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক ত্রিবিধ শাস্ত্রেই ইহা অনাদি প্রবর্ত্তিত। বুদ্ধ অবতারের পর বৌদ্ধ মত অত্যন্ত প্রবল হইয়া, পঞ্চোপাসক হিন্দুর সাকার বাদ বিলুপ্ত প্রায় হয়, সেই সময় শঙ্কর ইহা পুনঃ স্থাপন করেন।

শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপ, চারি সমাজ শঙ্কর প্রবর্ত্তিত মতেই চলিতেছে। বৈষ্ণব সমাজে শাঙ্করী মত মায়াবাদ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অনাদি কাল হইতে শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্ম, সনক, এই চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। শ্রী সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তনা লক্ষ্মী হইতে হয়। রুদ্র হইতে যে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম রুদ্র সম্প্রদায়। ব্রহ্মা হইতে যে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম ব্রহ্ম সম্প্রদায়। সনক সম্প্রদায় চতুঃ সন অর্থাৎ সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার, এই চারি জন ব্রহ্ম নন্দন হইতে প্রবর্ত্তিত। পরে কাল মাহাত্ম্যে বা বৌদ্ধ প্রভাবে এই চতুঃ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের পর ক্রমে চারি মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় পুনঃ স্থাপন করেন। তাঁহাদের নাম—রামানুজস্বামী, মাধ্বাচার্য্য, নিম্বাদিত্য, বিষ্ণুস্বামী। রামানুজ শ্রী সম্প্রদায় ভুক্ত এবং শ্রী সম্প্রদায়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা। এই জন্য এই সম্প্রদায় ইহাঁর নামানুসারে রামায়ৎ বলিয়া বিখ্যাত। নিম্বাদিত্য রুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত এবং রুদ্র সম্প্রদায়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা। এই জন্য এই সম্প্রদায় তাঁহার নামানুসারে নিমায়ৎ নামে পরিচিত। মাধ্বাচার্য্য ব্রহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের পুনঃ স্থাপয়িতা, এই জন্য এই সম্প্রদায় তাঁহার নামানুসারে মাধ্বী সম্প্রদায় বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্য প্রভু যে গৌরীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন, তাহা মাধ্বী সম্প্রদায় ভুক্ত, কিন্তু পৃথক রূপে গৌরীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়

নামে বিখ্যাত। মাধবেন্দ্র পুরী হইতে এই গৌরীয় সম্প্রদায়ের মূল গণনা হইয়া থাকে। প্রেম ভক্তি এই সম্প্রদায়ের মূল উপাসনা। মাধবেন্দ্র হইতে ইহার বীজ অঙ্কুরিত হয়। ইহাঁর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করেন কেশবানন্দ ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আদি দীক্ষা শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট বলিয়া শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্রহ্ম বা মাধ্বী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় বা গৌরীয় সনক সম্প্রদায় ভুক্ত এবং উহার পুনঃ স্থাপয়িতা। এই জন্য ইহা বিষণ্স্বামী নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুস্বামীর সময়ে ইহা হয় অধিক বিস্তার নাই। ত্বদীয় শিষ্য রাধাবহ্লভ (বহ্লভ ভট্ট) হইতে ইহাঁদের মত বিস্তৃত হয়, সেই জন্য এই সম্প্রদায় রাধাবহ্লবী বলিয়াই পরিচিত। এই চারি সম্প্রদায় ভিন্ন বৈষ্ণব নাই, তবে এই সম্প্রদায় চতুষ্টয় হইতে বহুল উপশাখা নির্গত হইয়াছে, তাহারা ঐ চারি সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত কিন্তু আচার, ব্যবহার, সাধনাদি অনেক সম্প্রদায়ের ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনেক উপসম্প্রদায় মূল সম্প্রদায় হইতে ত্যক্ত হইয়াছে।

মনুষ্য যতই কেন সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়া পৃথক্ হউক, সকলেই সেই এক বস্তুরই উপাসক। তবে যে উপাসনা বৈদিক আচার বিরুদ্ধ, পৌরাণিক আচার বিরুদ্ধ, তাহাদের যদি কোন শাস্ত্রও থাকে, থাক্, কিন্তু নিশ্চয় তাহারা মূল বস্তুর প্রতিকূল পথে যাইতেছে, পথ ভুলিয়া বিপথে পতিত হইয়াছে। কারণ বেদ অতিক্রম করিয়া কেহ তাঁহাকে পায় না। তাঁহার পদ প্রতিকুলে যে গমন তাহাই নরক। অতএব সাধকগণ সাবধান হইবেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, বিধিভিন্ন আত্যান্তিকি ভক্তি ও উৎপাত ও প্রমাদ বলিয়া গণ্য। যখন জগতের গম্য বস্তু এক, তখন গম্য পথেরও একটা সামঞ্জস্য অবশ্য আছে। অবশ্যই একটা পরিচিত পথে যাইতে হইবে, নূতন পথে অনেক বিপদ। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া।
একারপুর মদনমোহন বাড়।
পোঃ, বাসুদেবপুর, (জেলা মেদিনীপুর)।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা। [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম অনাদি প্রবৃত্ত, নূতন নহে, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, ও চতুঃসন, ইহাঁরাই এই মহান্ ধর্ম্মের আদি উপাসক, ইহাঁরাই এই ধর্ম্মের আদি গুরু ও প্রবর্ত্তক। এই মূল হইতে একাল পর্য্যন্ত চারিটী প্রবাহ বা সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, তাহার নাম শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্ম, সনক। এই সম্প্রদায় চতুষ্টয় বৈষ্ণব। সকল ধর্ম্মেরই মূল গোবিন্দ, কিন্তু জীবের জীবত্ব হেতু যুগচতুষ্টয়ে অবস্থার পরিবর্ত্তন আছে, এই পরিবর্ত্তন হেতু সময় সময় ধর্ম্মেরও বিপ্লব হয়, সেই সেই সময় স্বয়ং শ্রীহরি অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম স্থাপন করেন, কখন বা তৎপ্রেরিত কোন শক্তিমান ভক্ত হইতেও ধর্ম্ম স্থাপিত হয়। কিন্তু, যুগানুকূল ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে যুগাবতার গণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। দ্বাপরের শেষসন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হন, যুগাবতারও সেই পূর্ণতমাবতারের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন; এই যুগে জীবের মঙ্গল নিদান হরি কালানুরূপ, জীবের কালানুরূপ চিত্তের অনুকূলে বৈধী ভক্তিযোগ ও বৈধী উপাসনা স্থাপন করেন, এবং সর্ব্ব চিত্তাকর্ষী অমিয়লীলা বিস্তার করিয়া জীবের ধ্যান যোগের সুখময় পথ প্রদর্শন করেন। শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব ভগবানের সেই সেই লীলা ও উপদেশ শাস্ত্র রূপে জীবের চক্ষুদান জন্য প্রকাশ রাখিয়া যান। কলির চঞ্চল জীব যখন সেই দ্বাপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মও সম্যক্ অনুষ্ঠানে শক্তিহীন, শাস্ত্র মর্ম্ম গ্রহণে উদাসীন, সেই সময় আর একবার মহান্ ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লব কলির বর্ষ দ্বিসহস্রাবসানে বুদ্ধাবতার হইতে আরম্ভ হয়। যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের উপাসনা ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম, সেকালে বৈদিক শাস্ত্র সবল ছিল, দ্বাপর ও কলি সন্ধ্যায় বৈদিক মন্ত্রের সঙ্কীর্ণতা হেতু উপাসনা মূলক তদঙ্গ পৌরাণিক হোম প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে যখন রাজস ও তামস প্রকৃতির আধিক্য হেতু কলি আরম্ভে লোভ প্রযুক্ত লোক সকল যজ্ঞের উপলক্ষে নামমাত্র ক্রিয়ারম্ভে অযথা প্রাণী হত্যা আরম্ভ

করিল, ভগবান্ সেই কালে বুদ্ধাবতার আশ্রয় করিয়া বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ড ও পশুবধযজ্ঞের নিন্দাকরত কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষী রাজস্ সমাজের কর্ম্ম জন্য ভোগলালসা মূলক ফলাকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব জন্য কতকটা জ্ঞান-কাণ্ডের আবরণ দিয়া নাস্তিক বাদ প্রবর্ত্তন করেন। কালে সেই নাস্তিক বাদ কর্ম্মভূমি ভারত গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, ভগবান শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া পুনশ্চ জ্ঞান ও কর্ম্ম স্থাপন করেন। কিন্তু যখন জীবের অন্তরে গুণানুরূপ একটা প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়, তখন সেই প্রবল স্রোত সহসা সম্পূর্ণ ফিরান যায় না, এই জন্য ধর্ম্ম স্থাপয়িতাগণ জীবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির অনুকূলে প্রথম কিয়দ্দূর গিয়া ক্রমে বিকৃত গতি নিরোধ করিয়া দেন। এই জন্য শঙ্করকে মায়াবাদ সমাচ্ছাদিত জ্ঞান ও তান্ত্রিক কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল, এই উদ্যমে জীব কিয়ৎ পরাবৃত্ত হইলে, পুনশ্চ পঞ্চ শিষ্য দ্বারা পঞ্চ সূক্ত অবলম্বনে, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, এই পঞ্চ সগুণ সাকার মতের সূত্রপাত করিয়া যান।

কিন্তু কালের গুণ প্রবাহের আনুকূল্য হেতু শাঙ্করী মায়াবাদ ও শৈব, শাক্ত মতই অধিক প্রবল হইল, বৈষ্ণব মত সম্প্রদায় বিশুদ্ধ উপযুক্ত সাত্বিক গুরুর অভাবে বিস্তারিত হইল না। তারপর ভগবৎ প্রেরিত চারিজন শক্তিমান ভক্ত চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হইলেন, রামানুজ কর্ত্তৃক শ্রীসম্প্রদায়, ব্যাস শিষ্য মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্রহ্ম সম্প্রদায় (এই হইতে ব্রহ্মসম্প্রদায়কে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় বলা হয়) এবং নিম্বাদিত্য ও বিষ্ণুস্বামী হইতে রুদ্র ও সনক সম্প্রদায় পুনঃ স্থাপিত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু ভক্তি পথের বিশুদ্ধতা হইল না, জ্ঞান কর্ম্মের কার্য্য ফলাকাঙ্ক্ষা-রূপ আবর্জ্জনা রহিয়া গেল। প্রেমময়ী ভক্তির নদী বহিল না, মুক্তি পিপাসা সমাকুলা জ্ঞানময়ী মরীচিকা ভীষণা মরুভূমি ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল, অপর দিকে শাঙ্করী মায়াবাদ মোহিত দার্শনিক ঝঞ্ঝা বাত প্রবল বহিয়া ভক্তি পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া দিল, শ্রীমদ্ভাগবতের

পবিত্র চন্দ্রালোক আবরিত রহিল, ভাসা ভাসা মেঘের কোলে হইতে ক্ষীণালোক কিছু আসিল, কিন্তু সুধা বৃষ্টি হইল না। অল্প সংখ্যক জীবমাত্র এই সুদুর্গম ধর্ম্ম পথের সম্মুখীন হইল, কতকগুলি ঐ পথ এই পথ চীৎকারের বিতণ্ডায় কর্ণ বধির করিতে লাগিল, অধিকাংশ অবশ হইয়া নরক নিদান বিষয় বিষগর্ত্তে পড়িয়া লটাপটী করিতে লাগিল। এই আর এক মহান ধর্ম্ম বিপ্লব ১৪০৭ শকের সীমায় মহা বিপ্লব উপস্থিত করিল। অবিদ্যা অন্ধজীব শাস্ত্র হস্তে পাইয়াও কলিযুগ ধর্ম্ম ধরিতে পারিতেছে না, চাতক পিপাসায় পানীয় প্রার্থনা করিতেছে; বৃষ্টি নাই, বজ্র পড়িতেছে, করকা পাতে আশা-চূর্ণ হইতেছে, ঠিক এই সময় কতকগুলি শক্তিমান্ ভক্ত আবির্ভূত হইয়া জীবের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখ বারণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, ভগবান্ ভক্তের নয়ন জল মুছাইতে কলির প্রথম সন্ধ্যায় আবার আসিলেন। এবার আসিলেন ব্রাহ্মণ কুলে, বিদ্যা গর্ব্বের কেন্দ্র ভূমি নবদ্বীপে। অবিদ্যা রূপ বিদ্যাগর্ব্ব চূর্ণ হইল, শচীগর্ভ সিন্ধু হরীন্দু পূর্ণ কলায় জগৎ আলো করিলেন, সুধাতরঙ্গের উধাও তরঙ্গে আবর্জ্জনা ভাসিয়া গেল, কুলে কুলে ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া প্রেমভক্তির বিমল সলিলা তরঙ্গিনী প্রবাহিত হইল।

এই জন্য কলিযুগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা মূলে শ্রীভগবান্ গৌর-চন্দ্রই লক্ষিত হন। শ্রীগৌড় মণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম মূলে শ্রীগৌরাঙ্গেরই প্রবর্ত্তকত্ব স্বভাবতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, বাস্তবত তাহাই সত্য। শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম যাহা প্রাচীন কালাবধি ছিল, তাহাতে যাহা ছিল না, এমন একটী নূতন বস্তু দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দেব সেই পুরাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নবীনত্ব দান করিয়াছিলেন। যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিদ্যমান নাই, সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্বা-চিরাৎ অনর্পিতচরী উন্নত উজ্জ্বল রসাশ্রিতা রাগানুগা ভক্তি শ্রীগৌরাঙ্গ দেব হইতেই জীবে জানিয়াছিল, আর জানিয়াছিল শ্রীগৌর অবতারের মত বিশ্বপ্রেমিকতা ভগবানের অন্য কোন অবতারে প্রকাশিত হয়

নাই। কারণ রামাবতারে প্রভুর সাক্ষাৎ উপদেশ ১টী মাত্র ভক্ত কেবল প্রাপ্ত হন, সেই ভাগ্যবান্ ভক্ত শ্রীহনুমান্। কৃষ্ণাবতারে দুটীমাত্র ভক্ত শ্রীমুখের সাক্ষাৎ উপদেশ পাইয়াছিলেন, শ্রীঅর্জ্জুন ও শ্রীউদ্ধব। কিন্তু কলিযুগে শ্রীগৌরচন্দ্র জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকল জীবকেই শ্রীমুখের উপদেশ দানে ও স্বয়ং আচার দ্বারা আদর্শরূপে ধন্য করিয়াছিলেন।

যে কোন ধর্ম্মই হউক, শাস্ত্র বাক্যের উপর যাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, তাহা অমূলক, অসাধু নিষেবিত। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গ দেব শাস্ত্র বাক্যের উপরেই স্বপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ভগবত্ত্বার বিভিষিকা দেখাইয়া কার্য্য করেন নাই। শক্তিমান্ শ্রীপাদ গোস্বামীগণও শাস্ত্র বাক্যের উপর ভিত্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করিয়াছেন, পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণও শাস্ত্রচক্ষু ও সাধনচক্ষু উভয় চক্ষুতেই চক্ষুষ্মান্ ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা সকল সমাজেই ভক্তি পূজা পাইয়াছিলেন কিন্তু উভয় চক্ষু অন্ধ করিয়া যাঁহারা সেই পূর্ব্বতন বৈষ্ণব গৌরব লাভে লালাইত হইলেন, পবিত্র বৈষ্ণব সমাজের তাঁহারা অকল্যান ধূমকেতু স্বরূপ। ইহাঁদের নেত্রহীন দাম্ভিক গমন কেবল পতন নিমিত্ত হইল, আর সেই পতনোৎক্ষিপ্ত ধূলি পটলে পরম গৌরবান্বিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের গরিমা রাশি আচ্ছন্ন হইয়া গেল, নবীন আগন্তুকগণ আর তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না, যাহা দেখিল, তাহাতে কেবল বিতৃষ্ণা প্রসূত বিদ্বেষ বহ্নি প্রধূমিত হইয়া দিগন্তব্যাপী ঘোর অন্ধকারে শ্রীগৌড় মণ্ডল ডুবাইয়া দিল। বৈষ্ণব, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বৈষ্ণব শাস্ত্র, এমন কি সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও বৈষ্ণবের উপাস্যবস্তু শ্রীগৌরচন্দ্রকে পর্য্যন্ত বিদ্বেষ ধূম রাশিতে আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু সমাজে ইহা যে পূর্ব্বে ছিল না, নূতন হইল, তাহা আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব পুরাবৃত্ত আলোচনায় এবং প্রাচীন ব্যবহার পরম্পরায় বেশ দেখিতে পাই।

শ্রীগৌড় বিদ্বেষের কারণ বৈষ্ণব বিদ্বেষ, বৈষ্ণব বিদ্বেষের কারণ সাধনহীন, শাস্ত্র চক্ষুহীন, বৈষ্ণবগুণহীন, বৈষ্ণব প্রায় ব্যক্তিগণ। যাঁহাদের কথা বহুবার আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

বৈষ্ণবগণ সকল সমাজেই অতিপূজা পাইয়াছিলেন, বৈষ্ণবের মত সার্ব্বভৌমিক অতিপূজা অন্য কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই লাভ করিতে পারেন নাই। যে মহাগুণে বৈষ্ণবগণ অতি পূজা পাইয়াছিলেন, শাস্ত্রানুশীলন, ভজনানুষ্ঠান, অন্তঃশৌচ এবং শ্রীমহাপ্রভু দত্ত——

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী দত্ত——

সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধ রূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজ লোকানুসারতঃ॥

এই দুই মহামন্ত্র, এই সকল বৈষ্ণবোচিত মহদ্গুণের অভাবে আর দম্ভময় বাহ্যশৌচ, প্রতিষ্ঠাশা, ভক্তিকাপট্য, অহং গ্রাহিতা এবংআত্মস্তবিতা প্রভৃতি মহা দোষের প্রভাবে সেই অতিপূজার মূলে কুঠারাঘাৎ হইল।

পূর্ব্বোক্ত মহাগুণ ও প্রেম ভক্তির অশ্রুবিন্দু লইয়া প্রাচীনগণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, আর শেষোক্ত মহাদোষের অগ্নিতে বৈষ্ণব গৌরব দগ্ধ করিয়া আধুনিক বৈষ্ণবগণ কেবল দম্ভের দ্বারা সেই শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমভক্তি প্রচার করিতে গিয়া দুর্দ্দমনীয়দম্ভ-ভারে ক্রমশঃ নামিয়া পড়িলেন।

অকর্ষিত ক্ষেত্রেই আগাছাদি জঞ্জাল জন্মায়, সুকর্ষিত ক্ষেত্রে হয় না। সাধন শুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে দম্ভাদি জঞ্জাল নাই, সাধনহীন কামনা কলুষিত হৃদয়েই উহার আধার। ভক্তির ফল প্রেম, দম্ভ নহে দম্ভ অপরাধের ফল। সদ্‌গুরু ও সাধু শাস্ত্রাশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে যদি শ্রীকৃষ্ণানুরাগ ক্রমে প্রেমোদয় হয় তবেই জানিবে,

তাহাই বিশুদ্ধ ভজন। যখন দেখিবে ভজন করিতে করিতে তজ্জন্য দম্ভ আসিতেছে, তখন জানিবে ভজন বিশুদ্ধ হয় নাই, ভক্তির নিকট অপরাধ হইতেছে। নিষ্কিঞ্চন সেবাকাঙ্ক্ষাই বিশুদ্ধ ভজন লক্ষণ, প্রতিষ্ঠাদি স্বসুখ কামনাই ভক্তির নিকট অপরাধ। প্রতিষ্ঠাশা হইতে আত্মোৎকর্ষদর্শন, আত্মশ্লাঘা, যশোলিপ্সা, মানাকাঙ্ক্ষা, অসহিষ্ণুতা পরগুণাল্পতা জ্ঞান, পরনিন্দা, স্বাভিমানিতা প্রভৃতি ভক্তি কণ্টক অপরাধ উৎপত্তি হইয়া প্রেমাঙ্কুর জন্মাইতে দেয় না; দুষ্পূর স্বসুখ লালসা হৃদয়কে মরীচিকাময়ী মরুভূমি করিয়া ফেলে। অন্তঃশৌচ বিহীন বাহ্যশৌচ হইতেই এই দম্ভজননী প্রতিষ্ঠাশার উৎপত্তি হয়। অন্তরের পবিত্রতা সাধন বা চিত্ত শুদ্ধির নাম অন্তঃশৌচ, বাহ্যদেহের পবিত্রতা সাধন বা কায় শুদ্ধির নাম বাহ্য শৌচ ভজনাঙ্গে উভয়েরই প্রয়োজন, কিন্তু অন্তরে বিবিধ ভক্তিকণ্টক জঞ্জাল পোষণ করিয়া লোক দেখান কপটাপূর্ণ বাহ্য আচার গ্রহণ কেবল দম্ভেরই হেতু স্বরূপ হইয়া থাকে। তাই বলি বাপু হে! যদি পাকিবেত সুপক্ক হও, না হয়, কাঁচা থাক, ইচোড়পাকা হইও না, বিশুদ্ধ ভক্তিলাভে যদি ইচ্ছা থাকে, চিত্তশোধন কর, ভক্তি সাধনে চাই কেবল নির্ম্মল মন আর সেবাকাঙ্ক্ষা। অন্যান্য যে সদাচারাদী তাহা আপনিই হয়, শরৎ আগমনে শশধর স্বভাবতই উজ্জ্বল কিরণ বিকীরণ করে, মাজিয়া ঘসিয়া বিমল করিতে হয় না।

আত্মতত্ত্বানুশীলন হইতে দৈন্য, বদ্ধ মুক্ত তত্ত্ব বিচার হইতে দয়া, কৃষ্ণ তত্ত্বানুশীলণ হইতে বিশ্বপ্রেমিকতা, ভজন তত্ত্বানুশীলন হইতে নিরভিমাণিতা, ভক্তি তত্ত্বানুশীলন হইতে ভজন নির্ম্মল হয়, আর শ্রীব্রজবিলাস পর গ্রন্থ ও কীর্ত্তনের যোগ্য প্রাচীন পদকর্ত্তাগণের সমাধিগম্য পদাবলী অনুশীলন দ্বারা রাগোৎপত্তি হয়। আত্মতত্ত্ব বলিয়া একখানি বিপথী গ্রন্থ আছে তাহার অনুশীলন নহে "কৃষ্ণ নিত্য দাসজীব" ইহাই আত্ম তত্ত্ব অর্থাৎ ভক্ত ভাব। কত গুণে ভক্ত হয় ইহার উত্তরোত্তর অনুশীলন করিলেই আপনি দৈন্য আসে। বদ্ধ ও মুক্ত জীব লক্ষণ ও উভয়ের গতি অনুশীলন করিতে

করিতে আত্মোন্নতির সহিত জীবে দয়া গুণ প্রকাশিত হয়। বদ্ধ ভগবদ্বিমুখ জীব। আমিই সদসৎ কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখ দুঃখ ভোক্তাজীব” এই অভিমানই জীবকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ করিয়া মায়ায় ডুবায়। মায়া অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে বাসনা, বাসনা হইতে বিষয়া শক্তি, বিষয়া শক্তি বৃথা সুখের প্রলোভন দিয়া জীবকে আত্ম সুখ কামনাময় বিষয়ে ডুবায়। এই প্রকার কৃষ্ণ বিমুখ বদ্ধ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার চেষ্টাই আত্মোন্নতি ও দয়া। কৃষ্ণ তত্ত্বানুশীলন হইতে চরাচর কৃষ্ণময় বলিয়া অনুভব হয়, এই অনুভব ভক্তি সাধনে সুপক্ক হইলে, কৃষ্ণার্পিত নির্হেতু প্রেম জগতে ছড়াইয়া পড়ে, তখন আর ইতর বিশেষ জ্ঞান থাকে না, সমস্ত জগৎ কৃষ্ণ প্রেমময় হইয়া যায়, জগতের জন্য আত্মজীবন উৎ-সর্গীকৃত হয়, ইহাই বিশ্ব প্রেমিকতা। ভজন তত্ত্বানুশীলন অর্থাৎ কৃষ্ণকে পাইতে কতটুকু ভজনের প্রয়োজন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণ কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য কতদূর পরাকাষ্ঠা, ত্যাগ স্বীকার অব্যর্থকালতা আশ্রয় করিয়াছিলেন, শ্রীমহাপ্রভু জীব শিক্ষার জন্য কিরূপ স্বাচরিত ভজনাদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল অনুশীলন করিতে বসিলে “চরণ বিরূপতা দর্শনে ময়ূরের নৃত্যভঙ্গবৎ” আপনি অভিমান বিদূরিত হয়। “হায় সে দুর্ল্লভ ধন কেমন করিয়া পাইব,” ভাবিয়া অশ্রু জলের প্রস্রবন ছুটে। ভক্তি তত্ত্বানুশীলন অর্থাৎ প্রভুপাদগণের ভক্তি শাস্ত্র সকল উত্তম অনুশীলন বা ভক্তি শাস্ত্রজ্ঞ ভজনপর মহাত্মাজনের উপদেশ ভিন্ন ভজন নির্ম্মল হয় না, ভক্তির বিচার, ক্রমোন্নতি, রাগোদয়, ভাবোদয়, প্রেমোদয়, বাহ্যপূজাদি ও মানসী সেবা ক্রম উত্তমরূপ অনুশীলন না করিয়া স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত ভজন করিতে যাইলে ভক্তির নিকট অপরাধ হয়; ভক্তির নিকট অপরাধ হইতেই দম্ভাদি বহু দোষ উৎপন্ন হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ সহকারী সম্পাদক।

পিপারাজার রাণী।

পিপারাজা গাঙ্গোরোল দেশের অধিপতী ছিলেন। তিনি প্রথমাবস্থায় শাক্ত ছিলেন, পরে কোন বৈষ্ণব অতিথীর কৃপা হওয়ায়ও তাঁহার উপাস্য দেবীর আদেশ স্বপ্নযোগে পাইয়া, তিনি কাশীনিবাসী গুরু পরমানন্দ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করতঃ তাঁহার নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা, প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরির সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। বৎসরেক পরে সাধন ভজন গুণে তাঁহার বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল এবং রাজা এ অনিত্য রাজ্যধন পরিজন পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করত শ্রীকৃষ্ণ ভজন সাধনে দিন কাটাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পত্রী দ্বারা গুরুদেবকে আসিতে আহ্বান করিলেন। স্বামী রামানন্দ শিষ্য গৃহে আগমন করিলে, রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে সংসার ত্যাগ ও বনগমন করিবার বাসনার বিষয়ে নিবেদন করিলেন। গুরুদেব শিষ্যের প্রকৃত বৈরাগ্য উপজাত হইয়াছে দেখিয়া অতি সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন "বৎস যখন এই সাধু ইচ্ছা মনে উদয় হইয়াছে তখন আর ইহা সম্পূর্ণ করিতে কালবিলম্ব করিও না। এই মুহূর্ত্তেই ইহার পক্ষে অতি শুভ সময়, অতএব এক্ষণই যাত্রা করা কর্ত্তব্য। রাজা গুরুবাক্য শিরে ধারণ করিয়া বনগমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে এক মহা বিঘ্ন উপস্থিত। রাজার সাত জন মহিষী, অন্তঃপুরে রাজার বনগমনের কথা শুনিয়া শোকে অধীরা হইয়া উঠিল ও একেবারে সাত জনেই সভা মধ্যে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, শ্রীচরণের এ সেবিকাগণকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া কোথায় যাইবেন। মহারাজ! আমাদের কেবল ঐ চরণই ভরসা, আমরা এধনসম্পত্তি লইয়া আপনার অদর্শনে থাকিতে পারিব না, আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।" রাজা তাহারের অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ সংসারের পক্ষেই স্ত্রী—আমি যখন সংসার ছাড়িয়া যাইতেছি তখন তোমাদের সঙ্গে লইয়া গেলে আমার সংসার বৈরাগ্য কোথায় রহিল, অতএব তোমরা নিবৃত্ত

হও, আমার বৈরাগ্যের পথ অবরোধ করিও না।” রাণীগণ কিছুতেই মানিল না। রাজা মহা বিপদে পড়িয়া অবশেষে বলিলেন, “আচ্ছা যদি আমার সঙ্গে যাইতে তোমাদের নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা আমার সঙ্গে যাইবার যোগ্য কি না তাহা পরীক্ষা না করিয়া আমি লইতে পারি না। তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রী অঙ্গের বস্ত্র অলঙ্কারাদি সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া নগ্নাবস্থায় এই রাজসভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে, আমি জানিব সে সেই স্ত্রীই আমার সঙ্গে যাইবার উপযুক্ত, যাও, এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন কর ও পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতা সপ্রমাণ কর।” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য ছয়জন মহিষী নিরস্তা হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কেবল সীতা নাম্নী কনিষ্ঠা মহিষী, রাজ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ আপনার হীরাহার মণি প্রভৃতি বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ও কারুকার্য্যখচিত বসনাদি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কেবল একখানি ছিন্ন কম্বল খণ্ডে লজ্জা রক্ষা করিয়া সহাস্য মুখে ও আনন্দচিত্তে রাজসভা মধ্যে আসিয়া যোড়করে নিবেদন করিল,” মহারাজ! গুরু সমীপে উলঙ্গ অবস্থায় আগমনজনিত অপরাধ এড়াইবার জন্যই এই জীর্ণ কম্বল খণ্ড খানি পরিধান করিতে হইয়াছে, এজন্য দাসীর দোষ ক্ষমা করিয়া, চরণ সেবার জন্য দাসীকে সঙ্গে লইয়া চলুন।” রাজা যে কৌশলে রাণীগণকে নিরস্ত করিবেন বিবেচনা করিয়া-ছিলেন, ছোট রাণী সম্বন্ধে তাহা খাটিল না দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গুরুদেবের মুখের প্রতি তাকাইলেন—স্বামীজী অনুমতি করিলেন “বৎস, যখন রাণীর এতদূর অনুরাগ তখন আমার আজ্ঞা মতে তুমি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, ইহাঁর দ্বারা তোমার অভীষ্ট কার্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমার কর্ম্মনাশ হওয়া দূরে থাকুক, ইহার দ্বারা তোমার পরম উপকারই সাধিত হইবে, দৈহিক অভিমান যতদিন থাকে ততদিনই স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞানও থাকে, আর স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে হরিভক্তি পরায়ণ

হইলে, আর ঐরূপ ভেদ জ্ঞান থাকে না; তখন উভয়েই সমান জ্ঞান হয় ও পরস্পরের সহবাসে পরস্পরের পারমার্থিক সম্বন্ধে উপকার বই অপকার হয় না। মায়াময় সংসার চক্ষে স্ত্রীলোক বৈরাগীর ত্যাজ্য হইলেও, ভক্তিপক্ষে সেই স্ত্রীর সহবাস প্রার্থনীয় ও গ্রাহ্য, রাণী যেরূপ অনুরাগের অধিকারিণী তাহাতে তাঁহারও বিষয় বৈরাগ্য সম্পূর্ণ রূপে স্ফূরণ হওয়া দেখা যাইতেছে। বৈরাগীর পক্ষে বৈরাগীর সঙ্গ প্রার্থনীয় ও মহোপকারপ্রদ সন্দেহ নাই।”

রাজা গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে সীতা নাম্নী রাণীকে সঙ্গে লইয়া বাটীর বাহির হইলেন। উভয় স্ত্রী পুরুষের আর আনন্দের সীমা নাই। রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় পুলকে পূর্ণ হওত করঙ্গ কম্বল উড়াইয়া ভীক্ষাটন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কবিতে করিতে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিরা অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীধর নামক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রাজা ও রাণী অতিথী ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র, কিন্তু দীনদশাপন্ন হইয়াও, তাহাদের স্ত্রীপুরুষের আশ্চর্য্য অতিথীসেবানুরাগ। পীপাজী ও সীতা দেবীকে শ্রীধরের ব্রাহ্মণী অতি সমাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পাদ ধোওয়াইয়া দিয়া অনেক স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে সে দিন কিছুমাত্র ছিল না, কিরূপে অতিথী সেবা হইবে বিপ্র তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বিপ্রপত্নী স্বামীকে চিন্তাকূল দেখিয়া কহিলেন, “ভাবনা করিবার প্রয়োজন নাই আমার এই পরিধেয় বস্ত্র খানি লইয়া গিয়া ইহা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাও, তাহাতেই দুইজন অতিথীর সেবাযোগ্য দ্রব্যাদি লইয়া এসো” এই বলিয়া ব্রাহ্মণী উলঙ্গ হইয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি স্বামী হস্তে প্রদান করিলেন ও নিজে লজ্জা নিবারণ জন্য এক গোধুমের কুটী মধ্যে বসিয়া রাহলেন। শ্রীধরের স্ত্রীকে উলঙ্গ হইয়া বস্ত্রার্পণ করিতে

দেখিয়া চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু অন্য উপায় নাই দেখিয়া ঐ বস্ত্রখানি বাজারে বিক্রয় করত সেই মূল্য দ্বারা দ্রব্য সামগ্রী কিনিয়া আনিলেন ও নিজে রন্ধন সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া দিলেন। পরে ঐ প্রসাদান্ন ভোজন করিবার জন্য পীপাজী ও সীতাকে আহ্বান করিলেন। তাহারা কহিলেন "ঠাকুর মহাশয় সকলে একত্র বসিয়া প্রসাদের আস্বাদন করিব" তাহাদের আগ্রহে শ্রীধর ভোজন করিতে এক সঙ্গে বসিতে স্বীকার করিলেন। সীতা দেবীও ব্রাহ্মণ ঘরণীকে ডাকিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ব্রাহ্মণ পত্নী গোধূমের ডোলের মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় বসিয়া আছেন। অতি বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন ঐ তথ্য অবগত হইলেন, তখন এরূপ অলৌকিক আতিথ্য ধর্ম্ম রক্ষার বৃত্তান্তে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। এবং ঐ অসামান্য বৈষ্ণবপ্রীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "মা তুমিই ধন্যা।" তদনন্তর ব্রাহ্মণীকে ডোল মধ্য হইতে হাত ধরিয়া তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ নিজের যে ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্রখানি ছিল, তাহাই দুই খণ্ড করিয়া এক খণ্ড ব্রাহ্মণীকে দিলেন এবং এক-খণ্ড দ্বারা নিজের লজ্জা নিবারণ করিয়া উভয়ে ভোজন স্থানে আসিয়া সকলে একত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

সীতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আহা যাহাদের এত তীব্র অতিথী সেবন প্রবৃত্তি এমন ব্যক্তির গৃহে প্রভু কিছুই অর্থ ধন দেন নাই, এক্ষণে এ ব্রাহ্মণদম্পতীর কিছু উপকার করা কর্ত্তব্য, ইহাই যুক্তি স্থির করিয়া সীতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঐ বিপ্র ভবন হইতে বহির্গতা হইয়া একেবারে বাজার মধ্যে গিয়া উপনীত হই-লেন। সীতা অনুপম রূপবতী ছিলেন, তাহাতে নবযৌবনসম্পন্না বাজারে এক বণিকের দোকানে আগমন করিয়া তাহার প্রতি অপাঙ্গলোচনে কটাক্ষপাত করত হাব ভাব সহকারে অতি মধুর বচনে কিঞ্চিৎ গোধূমাদি যাচ্ঞা করিলেন। বণিক তাঁহার রূপে

একেবারে মুগ্ধ হইয়া অতি সাদরে তাঁহাকে এক দিকে বসাইল। যুবতী সুন্দরী রমণী দেখিয়া নিকটস্থ অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তিশালী দোকানদারগণও অপরাপর দুষ্ট লোক আসিয়া জুটিল। সীতাদেবী এমনই হাস্য কৌতুক দ্বারা তাহাদের মন হরণ করিলেন যে, তাহারা সকলে রাশি রাশি দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থাদি ভিক্ষা দিল। স্ত্রীলোকের স্বাভিযোগ পুরুষের মণ আকর্ষণ করিবার অমোঘ রজ্জু। সীতাদেবীর পক্ষে এরূপ স্বাভিযোগ দ্বারা লোকের মন ভুলাইয়া ভিক্ষার্জ্জন করা উচিত কার্য্য হইল কি না, তাহা বিচার্য্য হইতে পারে। তিনি বৈষ্ণবানুরাগভরে বৈষ্ণব সেবার জন্য সে কার্য্য ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তাহা বিবেচনা করিলেন না, ইহা নিঃসন্দেহরূপে উপলব্ধি হইতেছে, ফলকথা শ্রীকৃষ্ণের নিজ জনের কোন কার্য্যেই পাপ অর্শায় না। যাহারা নিষ্কামভাবে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রেরিত হইয়া কোন সাধুকার্য্যে ব্রতী হন, পাপ ও পুণ্য, এই দুইই এমন শ্রীকৃষ্ণ সেবকের কাছে আসিতে পারে না। পীপারাজ মহিষী সীতা এইরূপে রাশিকৃত দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থ আনিয়া শ্রীধরের গৃহে দিলেন, তাহা দ্বারা তাঁহারা সকলে মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইতে লাগিলেন, ও অভ্যাগত বৈষ্ণব বৈরাগীকে প্রসাদ ভোজন করাইতে লাগিলেন।

একদিন সীতা দেবী যমুনায় স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন যে তীরস্থ এক বৃক্ষের তলদেশে একটী স্বর্ণভাণ্ড পতিত রহিয়াছে কৌতুহলাবিষ্টা হইয়া, তাহার আবরণীপাত্র খুলিয়া দেখেন যে ঐ ভাণ্ড মুদ্রাপূর্ণ, অমনি ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া তাহা বিষতুল্য পরিত্যাজ্য বিবেচনায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাত্রিকালে স্বামীর নিকট বলিতে লাগিলেন "আমি যমুনা তীরে মুদ্রাপরিপূরিত একটী স্বর্ণ ভাণ্ড দেখিয়া আসিয়াছি, আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, যখন এরূপ বিপুল রাজ্য ও অতুল ঐশ্বর্য্যের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন ইহা তো সামান্য লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ সামগ্রী, তবে এই গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যেরূপ অতিথী

সেবী ও নির্ধন, তাহাতে ঐ মুদ্রাপূর্ণ স্বর্ণভাণ্ড পাইলে, বহুকাল ইহার অতিথী-সেবা-ব্রত উত্তম রূপে সম্পন্ন হইতে পারে, অতএব ঐ বিপ্রকে ঐ মুদ্রা লইয়া আসিবার কথা বলিলে হয় না, ? যখন সীতা দেবী পীপাজীকে ঐ কথা বলেন, সেই সময় ঐ গৃহের পার্শ্বে জনৈক চোর দাঁড়াইয়া ছিল, সে চৌর্য্যবৃত্তি পালন জন্য অস্তবায় হইতে ঐ কথা শুনিয়া অর্থ লোলুপ হইয়া অতি হর্ষচিত্তে অনায়াসে ঐ ধন লাভ করিবার মানসে দ্রুতপদে ঐ নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ তলে গিয়া ঐ স্বর্ণ ভাণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত আশান্বিত হইল ও অতিশয় উৎসাহের সহিত যেমন ঐ ভাণ্ডের ঢাকনা খুলিল অমনি দেখিল তাহার মধ্যে এক বৃহৎ কালসর্প তর্জন গর্জন করিতেছে। ত্রস্তভাবে পুনর্ব্বার ঢাকনা বন্ধ করিয়া মনে মনে বড়ই ক্রোধান্বিত হইয়া মনে করিল যে, সেই বহুচরিত্রা স্ত্রী নিশ্চয়ই কোন মন্দ অভিপ্রায়ে কাল সর্পের কথা গোপন করত ভাণ্ড মধ্যে মুদ্রার লোভ দেখাইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ মুদ্রার কথা বলিয়াছে, এরূপ মিথ্যাবাদিনী ও দুশ্চারিণীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত, ইহা মনে মনে বিবেচনা করিয়া ঐ ভাণ্ডের মুখ উত্তমরূপে আবদ্ধ করত তাহা লইয়া ঐ শ্রীধর বিপ্রের বাটীতে যে ঘরে পীপা ও সীতা নিদ্রিত ছিলেন, সেই ঘরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়া, ভাণ্ডের মুখ উন্মোচন পূর্ব্বক নিদ্রিতা সীতা দেবীর অঙ্গে ঐ ভাণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আর পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া না চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। দুরাচার চোর মনে করিল যে ঐ কালসর্প নিশ্চয়ই ঐ স্ত্রীকে দংশন করিবে। কি অদ্ভুত রহস্য, স্বর্ণভাণ্ড রাণীর অঙ্গে পতিত হইবা মাত্র ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে স্বর্ণমুদ্রা সকল ঐ শয্যার চারিদিকে পড়িয়া গেল, সেই শব্দে পীপাজী ও সীতারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহারা উঠিয়া ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভগবানের লীলা ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না, শ্রীধর ও তাহার ঘরণীকে জাগ্রত

করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ঐ মুদ্রা তাহাকে প্রদান করিলেন এবং বৈষ্ণব সেবার জন্য ভগবানই এই অর্থ সংযোজন করিয়া দিয়াছেন ইহাই মনে করিয়া, পীপাজীর পরামর্শে শ্রীধর ঐ অর্থ দ্বারা সেই নদী তীয়ে বৈষ্ণব সেবার স্থান একটী আশ্রম প্রস্তুত করিলেন। সেইখানে শ্রীধর ঘরণী ও সীতা দেবী প্রতি দিন রন্ধন করিরা শত শত সাধু মহন্ত ভোজন করাইতে লাগিলেন। দিন দিন অতিথী সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, ঐ প্রচুর অর্থ কিছু দিনেই সমস্ত ব্যয়িত ও নিঃশেষিত হইয়া গেল। একদিন কতকগুলি বৈরাগী সাধু আসিয়া উপস্থিত। তাহাদেব সমাদরে অর্ভথ্যনা করিয়া বসাইলে পর, ইহাদের কি উপায়ে সেবা হইবে এই চিন্তায় চারিজনেই নিমগ্ন, পরে সীতা দেবী তাহাদের ভাবনা করিতে নিবারন করিয়া ভিক্ষার্থ বাজাবে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া একজন লম্পট বণিক, তাঁহার রূপ জৌবনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে আঁখির ঈঙ্গিত করিল, সীতা ও তাহার স্নাভিযোগ বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে ঐ পশু প্রকৃতি পুরুষ তাঁহাব কাছে নিজের দুষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। সীতা দেবী কহিলেন "মহাশয় আমার বাটীতে অতিথী উপবাসী আছেন, তাঁহাদের সেবাব সামগ্রী আহরণ জন্য আমি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি আমাকে যদি অনুগ্রহ করিয়া অতিথী সেবার উপযুক্ত সামগ্রী প্রদান করেন তাহা হইলে আমি অতিথী সেবানন্তর এখানে আগমন করিয়া আপনার যাহা আজ্ঞা তাহা পালন করিতে সম্মতা আছি," দুষ্ট বণিক এই আশ্বাস বাক্যে পরমাহ্লাদিত হইয়া অতিথী সেবার উপযুক্ত প্রচুর দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া বলিলেন "সুন্দরী আমি এই দিবস তোমার অপেক্ষায় কষ্টে কাটাইব, দেখ, যেন সন্ধ্যার সময় আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে বঞ্চিত করিও না।" সীতা সন্ধ্যার সময়ই নিশ্চিত আগমণ করিবেন বলিয়া, ঐ দ্রব্যাদি লইয়া আশ্রমে গমণ পূর্ব্বক তদ্বারা অতিথীগণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন।

যে প্রকারে বণিকের নিকট দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক স্বামী সন্নিধানে নিবেদন করিলেন। পীপাজী তাহা শ্রবণ করিয়া স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাণী। তুমি ধন্য। সৌন্দর্য্য ও যৌবন অপূর্ব্ব সামগ্রী বটে, কিন্তু, তাহা অকিঞ্চিৎকর নিজের সুখের জন্য ক্ষেপণ করিলে বিফল। সাধু কার্য্যে এমন অকিঞ্চিৎকর বিষয় ব্যয়িত হইলেই ইহার সার্থকতা। তোমার রূপ ও যৌবন আজ ঐরূপে বিক্রীত হইয়া বৈষ্ণব প্রীতি সম্পাদন হইল, এজন্য তাহা সফল হইল। আর যখন তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ, তখন তোমার ঐ অঙ্গীকার প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবেই উচিত। এতএব এক্ষণে সন্ধ্যা সমাগতা হইয়াছে, ঐ দাতা বণিকের নিকট গমন করিতে উদ্যত হও।" সাধ্বী সীতা তখন স্বামী আজ্ঞা শীরে ধারণ করত অতি অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া অভিসারে চলিলেন। নদীতে জোয়ার আসিয়া জলপূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার বসন ভিজিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার স্বামী তখন নিজ স্ত্রীকে ধরিয়া নদী পার করিয়া দিলেন। এরূপ দুরূহ নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব ভক্তির প্রবাহ অতুলনীয়। এরূপ তীব্র অনুরাগ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জ্ঞান থাকে না। সীতা দেবী বণিকের গৃহে প্রবেশ করিয়া এক পাশে বসিয়া একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। কামুক বণিক অধীর হইয়া যেমন তাঁহার অঙ্গস্পর্শে উদ্যত হইয়াছে, অমনি যেন প্রচণ্ড আগুনের উল্কাবৎ নিরীক্ষণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল; সেই অগ্নিতে তাহার সমস্ত দেহ যেন দগ্ধ হইতে লাগিল, সে মূঢ় আর সহ্য করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া দূরে পলাইল। সৎসঙ্গের কি অপার শক্তি। বণিক দূরে যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া রহিল, কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইল, তাহা অননুভবনীয়, তাহার মনে পরম সাত্তিকভাবের আবির্ভাব হওয়ায় সে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিল

"হায়! হায়! আমি কি কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিলাম। এ স্ত্রী তো কোন প্রাকৃতিক ব্যক্তি নহেন, এরূপ দেবীর প্রতি কু প্রবৃত্তিতে আশক্ত হইয়াছিলাম; আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? হায়! হায়! আমার কি উপায় হইবে"। এইরূপে বিলাপ করিয়া একেবারে সীতার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া মিনতির সহিত অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "মাগো! তুমি জগন্মাতা, লক্ষ্মী, এই মূঢ় ভ্রান্তের অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা না করিলে, মা গো আমার তো আর উদ্ধারের উপায় নাই।" সীতা দেবী বণিকের প্রকৃত অনুতাপ দেখিয়া তাহাকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করিলেন। যখন দেবী বিদায় গ্রহণ করিয়া আশ্রমে চলিলেন, বণিকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সে স্থানে গিয়া বিবিধ কাকুর্বাদ করত সাধু পীপাজীর চরণোপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। সেই দিন হইতে ঐ বণিকের মতি গতি ফিরিয়া গেল, এবং ঐ আশ্রমের সাধুসেবার জন্য যত দ্রব্য আবশ্যক তাহা সে প্রতিদিন যোগাইতে লাগিল। শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত মন থাকিলে তিনিই ভক্তের মান, ধর্ম্ম রক্ষা করত অভিলাষ পূর্ণ করেন। পাঠকগণ, একপ্রাণে ভক্তিভরে সেই ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরুর নামের জয় দিউন।

৺অমৃতলাল পাল,
এমএ, বিএল।

মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষে পৌঁছিবার উপায় কি ?

এই মায়াময় সংসারে আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি ? অনেক সময় এই প্রশ্নটী হৃদয় সাগরকে আলোড়িত করিয়া অসংখ্য চিন্তার বুদ্বুদ উৎপন্ন করে, কিন্তু প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইতে না হইতে আমাদের অবিদ্যামোহিত হৃদয়ে তাহা বিলীন হইয়া যায়, তখন বহু আয়াসলব্ধ জীবনতরীখানিকে ভ্রান্ত লক্ষ্যে চালিত করিয়া বিপদসঙ্কুল অনন্ত বাসনা সমুদ্রে পতিত হই ও ক্রমাগত ভীষণ আসক্তি তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে বিদীর্ণ হইয়া নিমজ্জিত হই, পরে রিপু কুম্ভীরাদির দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনন্ত কাল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে কর্ম্মদ্বীপে সংলগ্ন হই এবং অবিদ্যা মায়ায় অভিভূত হইয়া পুনঃপুন কর্ম্মফলের বীজ বপন করি ও অমৃত ভ্রমে সেই বিষাক্ত ফল আস্বাদন করিতে করিতে নানা যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া সুখ আশে দুঃখময় কর্ম্মভূমিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর ন্যায় বিচরণ করি। হায় ! কত দিনে যে শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া স্বাধীনতার বসন্ত সমীরণ উপভোগ করিব এবং উৎফুল্ল মনে চিদানন্দ বিভোর প্রাণে অনন্ত জ্ঞানময় সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের বিমল প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে অনন্ত কালের তরে বিশ্রামলাভ করিব ও প্রেম ভক্তির অমৃত ধারায় চীর তৃষিত আত্মাকে অভিষিক্ত করিয়া হরিগুণ গানে বিভোর হইয়া জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হইব তাহা জানি না।

আহা ! সে বিশ্রাম সে শান্তি যে কত সুখের, সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে অমৃতময় লহরী গুলির ঘাত প্রতিঘাত যে কত আনন্দজনক, সেই আনন্দময়ের আনন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মা যখন তাঁহার মহান্ ভাবে আপনাহারা হয়, সে দেবদুর্লভ অবস্থা যে কত শান্তিপ্রদ স্থূল জিহ্বা দ্বারা তাহার বর্ণনা সম্ভবে না, কবি কল্পনাও ততদূর উচ্চে পৌঁছিতে পারে না। ভক্ত পাঠকগণ ! ইহাই আমাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিবার উদ্দেশেই আমরা বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া ক্রমে মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়াছি।

কিন্তু দিনের পর দিন কালের অনন্ত প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে তথাপি আমরা গম্য স্থানের উদ্দেশে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না বরং ইচ্ছাপূর্ব্বক বিচার শক্তিকে স্তম্ভিত করিয়া অনন্ত দুঃখ জনক ক্ষণিক সুখের প্রলোভনে ভ্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতেছি। পাঠকগণ! আসুন, আমরা সেই জগতের আদি পুরুষ পরম দয়াল শ্রীহরির শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের দেখা আবশ্যক যে, যে মায়ার প্রভাবে আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া বিপথে চালিত হই, তাহার স্বরূপ কি? ও কি উপায়ে তাহার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইব এবং কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করিলে আমরা সংসারে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া জীবনের প্রকৃত-লক্ষ্যে উপনীত হইতে সক্ষম হইব?

পাঠকগণ! ঘরে চোর আসিয়াছে জানিতে পারিলে যেমন সে চোরে আর চুরি করিতে পারে না, সেই রূপ মায়ার স্বরূপ অবগত হইলে, তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা সহজ হইয়া পড়ে।

শাস্ত্র প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে সচ্চিদানন্দ (সৎ+চিৎ+আনন্দ) ভগবানের চিৎ (জ্ঞান) শক্তি হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে ও তিনি তাঁহার সৃষ্টিলীলাকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চালিত করিবার জন্য জীব সকলকে ত্রিগুণময়ী মায়ার আবরণে আবরিত করিয়াছেন। এই মায়া না থাকিলে জীব সকল মুহূর্ত্তের জন্যও সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া সুখ ভ্রমে দুঃখকে আলিঙ্গন করিত না, লৌহ যেমন স্বধর্ম্মবশে চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু কর্দ্দমাবৃত থাকিলে চুম্বকের আকর্ষণ কার্য্যকরী হয় না, সেইরূপ মায়া কর্দ্দমে আবৃত না থাকিলে আমাদের মনোবৃত্তি সকল স্বধর্ম্মবশে ঈশ্বরাভিমুখীন হইত।

পাগলে যেমন আনন্দিত মনে বিষ্ঠা লইয়া খেলা করে, কিন্তু সহজ মানুষের পক্ষে তাহা ঘোর নাকার-জনক, সেই রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সংসার বাসনাকে বিষ্ঠা তুল্য জ্ঞানে মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া মুক্তি পথে অগ্রসর হন।

মায়া দুই প্রকার—বিদ্যা মায়া ও অবিদ্যা মায়া, বিদ্যা অর্থে জ্ঞান ও অবিদ্যা অর্থে অজ্ঞান। জ্ঞান সত্ত্বগুণময় ও অজ্ঞান রজঃ ও তমঃ গুণময়, যে পর্য্যন্ত পাঞ্চভৌতিক দেহকে আমি ও তৎসম্পর্কীয় বস্তু সকলকে আমার

জ্ঞান থাকে সে পর্য্যন্ত তাহাকে অজ্ঞান বলে এবং যখন "হে ঈশ্বর তুমিই সব এবং সকলই তোমার বলিয়া ধারণা হয়, তাহাকে জ্ঞান কহে। জ্ঞানিরা সংসারে অবস্থান করিয়াও ভ্রমে মুগ্ধ হন না, যেমন কাটাল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে হস্তে তৈল মর্দ্দন করিলে আটা লাগে না, সেইরূপ জ্ঞানিগণ জ্ঞান তৈল মাখিয়া সংসারের কার্য্যে লিপ্ত হ'ন, সুতরাং অবিদ্যারূপ আটা তাঁহাদের হৃদয়ে সংযুক্ত হইতে পারে না। তবে জ্ঞানী সাধুগণ যে আমি বা আমার শব্দ ব্যবহার করেন তাহার ভাব স্বতন্ত্র, যেমন লৌহের তরবার পরশ মণি স্পর্শে সোণা হয় কিন্তু তাহার আকারের পরিবর্ত্তন হয় না অথচ তাহাতে জীব হিংসা করা চলে না, সেইরূপ তাঁহাদের জ্ঞান মণি সংযোজক জনিত নির্ম্মল হৃদয়ে অহংকারের মাদকতা স্থান পায় না।

যেমন সমুদ্রস্থিত জাহাজ বায়ুর গতি অনুসারে তরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়া বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয় কিন্তু জাহাজের উপরিস্থিত কম্পাস উত্তরমুখীন হইয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞানীরা সংসারের আবর্ত্তে পড়িলেও তাঁহাদের মন কম্পাসের ন্যায় ঈশ্বরের চরণে নিযুক্ত থাকে, এজন্য জীবনের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে দিক্ ভ্রম হয় না।

জ্ঞান হইলে বাসনার নির্ব্বাণ হয়, অবিদ্যা জনিত আসক্তি দূরে পলায়, বিবেক ও বৈরাগ্য জ্ঞানের নিত্য সহচর, মুক্তি তাহার সঙ্গিনী ও বিশ্বাস তাহার দাস, বিশ্বাস সহায়ে সাত্ত্বিকভাবে জ্ঞানের আরাধনা করিলে জ্ঞানলাভ হয়, জ্ঞানের কৃপা লাভ করিতে পারিলে মুক্তি আপনি আসিয়া পরিচর্য্যা করে, সচ্চিদানন্দ সকাশে যাইবার পথের সম্বল স্বরূপ প্রেম ও ভক্তি জ্ঞানের ভাণ্ডারে পাওয়া যায় এবং বিবেক ও বৈরাগ্য তাহার পথপ্রদর্শক হইয়া সেই নিত্যধামে সেই শান্তিপুরে আনন্দময়ের সকাশে যাইবার সহায়তা করে।

কিন্তু যেমন দুর্গন্ধময় অপরিস্কার কুটিরে রাজার বাস করা সম্ভবে না, সেই রূপ মলযুক্ত কামগন্ধময় হৃদয়ে জ্ঞানের আবির্ভাব অসম্ভব, যেমন আকাশের জল পুষ্প হৃদয়ে পড়িলে সুগন্ধময় সুধায় পরিণত হয় ও কর্দ্দমাক্ত স্থানে পতিত হইলে তদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করে সেইরূপ সাময়িক সাধুসঙ্গগুণে বা সৎগ্রন্থ পাঠে সমল হৃদয়ে জ্ঞান বারি পতিত হইলেও আধার দোষে তাহা পঙ্কিল হইয়া যায়, এজন্য আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হৃদয়কে নির্ম্মল করা, কিন্তু

হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হইলে মনের প্রসূতি অবিদ্যাকে দূরীভূত করা আবশ্যক। বিবেক বৈরাগ্যাদি সুবৃত্তিগুলি যেমন জ্ঞানের সহচর সেই রূপ কাম ক্রোধাদি কুবৃত্তিগুলি অবিদ্যার অনুচর, যেমন মাতালের গৃহে সাধুর বাস করা অসম্ভব, সেই রূপ কুবৃত্তির আধার হৃদয় গৃহে সুবৃত্তির আবির্ভাব অসম্ভব, যেমন উদ্যানে আগাছা জন্মাইলে পুষ্পবৃক্ষগুলি নিস্তেজ হইয়া নষ্ট হয়, সেই রূপ হৃদয় উদ্যানের পুষ্পবৃক্ষ রূপ সুবৃত্তি গুলি কুবৃত্তি রূপ আগাছার আওতাতে নষ্ট হইয়া যায়, আগাছার ন্যায় কুবৃত্তিগুলি আপনা হইতে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পুষ্প বৃক্ষের ন্যায় সুবৃত্তিগুলির সেবা না করিলে বৃদ্ধি পায় না, একে আগাছা রূপ কুবৃত্তিগুলি বিনা যত্নে বৃদ্ধি পায় তাহার উপর সেবা করিলে এত অসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে জ্ঞান সুধাবাহী পুষ্প বৃক্ষ রূপ সুবৃত্তি গুলকে নষ্ট করিয়া শেষে হৃদয় উদ্যানকে জঙ্গলময় ও হিংস্র জন্তুর বাস-ভূমিতে পরিণত করে, এজন্য অবিদ্যা সর্পের আশ্রয় স্বরূপ কুবৃত্তি রূপ আবর্জ্জনা গুলি হৃদয় ক্ষেত্র হইতে পরিষ্কার করিলে আশ্রয়াভাবে অবিদ্যাও পলায়ন করে, নতুবা কাম ক্রোধাদির সহায়ে মোহিত করিয়া আমাদিকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়, স্বপ্নাবস্থায় রাজা হইলে, যেমন আমার রাজ্য আমার সিংহাসন বলিয়া ভ্রমাত্মক ধারণা হয়, অবিদ্যা জাগ্রতাবস্থায় আমাদিগকে সেই রূপ ভ্রমে পাতিত করে, অবিদ্যার পুত্র মোহ, মোহ হইতে আসক্তির গর্ভে বাসনার উৎপত্তি হইয়াছে, এই বাসনা ক্রমে মজ্জাগত হইয়া দুঃখময় সংসারে জীব সকলকে কৃত্রিম সুখের ছবি দেখাইয়া, ভ্রমে মুগ্ধ করাইয়া ক্রমাগত ভ্রমণ করাইয়া লইয়া বেড়ায়, অবিদ্যা বিকারগ্রস্ত হইয়া যাহা আমার নয়, তাহাকে আমার বলিয়া মনে করি, কিন্তু যে প্রকৃত আমার, তাহাকে চিনিতে পারি না।

মনুষ্য দেহ জড় ও চৈতন্যের সংযোগে গঠিত, এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে যাহাদের আমরা আপনার বলিয়া মনে করি তাহারা আমাদের দেহস্থিত জড় ও চৈতন্যের মধ্যে কাহার সহিত সম্বন্ধ রাখে, চৈতন্য বা আত্মাকে তাহারা স্থূল চক্ষে দেখিতে পায় না, যাহাকে তাহারা দেখিতে পায় না তাহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি? তবে কি জড় দেহের সহিত সম্বন্ধ? তাহাই বা কি করিয়া হইবে. চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, কোন আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু হইল, যাহার দেহ, যাহা এত দিন আমার জ্ঞানে নানাবি

সুখাদ্যের ও জীবহিংসার দ্বারা পুষ্টি সাধন করা হইয়াছে, যাহার সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য বস্ত্রাদির দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে, পিতা মাতা যাহাকে নয়নের মণি, বৃদ্ধকালের অবলম্বন জ্ঞানে পলকের নিমিত্ত চক্ষের অন্তরাল হইলে প্রলয় জ্ঞান করিতেন, স্ত্রী যাহার নিমিত্ত ক্ষণকাল অদর্শনে ব্যাকুলিত হইতেন পুত্র কন্যা যাহাকে না দেখিতে পাইলে বিষাদিত হইত, হায়, এখন সেই ব্যক্তির দেহের অবস্থা কি ভয়ানক? ঐ ব্যক্তি আজীবন যাহাদের আপনার ভাবিয়া যত্ন করিত, যাহাদের সুখের জন্য তাহার প্রত্যেক রক্তবিন্দু ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না, এখন তাহাকে অশুচি বোধে সেই আপনার জনেরা কেহ স্পর্শ করিতেছে না। পিতা মাতা এক চক্ষে বারি বর্ষণ করিতেছেন, অপর চক্ষে আপনার এবং অন্যান্য কন্যা পুত্রের মঙ্গলের জন্য সতর্ক হইতেছেন, স্ত্রী, "আমার দশা কি করে গেলে" বলিয়া নিজের স্বার্থে বাধা পড়িল ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেছেন ও সংসারের মঙ্গল কামনায় গোময়াক্ত বারি পাত্র হস্তে মৃত স্বামীর সহিত সংসারের সমস্ত অমঙ্গল সংযুক্ত করিয়া তাহাকে চির বিদায় দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, সন্তানেরা এক চক্ষে কাঁদিতেছে অপর চক্ষে পিতৃত্যক্ত ধনরত্নাদির পরিমাণ জানিবার জন্য লোলুপ হইতেছে, হায়, শেষে ঐ সকল আপনার লোকেরা দেহটীকে জলন্ত চীতায় আহুতি দিয়া ঘরে ফিরিল। পাঠকগণ! ক্ষণকাল পূর্ব্বে যাহাকে নানা বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাকে যখন নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করিল, তখন দেহের সহিত সম্বন্ধ আছে কি করিয়া বলিব? দর্শনাতীত আত্মার সহিত যে সম্বন্ধ নাই তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, তবে সম্বন্ধ কাহার সহিত? এখন এই পর্য্যন্ত মীমাংসা হইতে পারে যে দেহ যে পর্য্যন্ত আত্মা ধনে ধনী থাকে সেই পর্য্যন্ত ভ্রম বিকার প্রসূত স্বার্থ বশে আত্মীয়েরা আমাদের দেহের সহিত সম্বন্ধ রাখে, স্বার্থহানি হইলে আর ফিরিয়া চাহে না এবং ইহাকে মায়াময় সংসার কহে। পাঠকগণ! বেশ্যা যেমন মিথ্যা প্রেম দেখাইয়া তাহার কবলে পতিত ধনবান পুরুষের নানারূপে রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নরকে পাতিত করে কিন্তু বেশ্যাসক্ত পুরুষ তাহাকেই ভ্রমবশে আপন ভাবিয়া তাহার চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, এবং যে তাহার আপনার জন, যে তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে, যে অহোরাত্র তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে, নিজ গৃহস্থিত সেই

সাধ্বী স্ত্রীকে অবহেলা করে, পরে যখন সর্ব্বস্বান্ত, কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত ও তাড়িত হইয়া শূন্য হস্তে শূন্য প্রাণে ঘরে ফিরিয়া আসে, তখন সতী স্ত্রীর সেবা, নিঃস্বার্থপরতা ও আত্মত্যাগ দেখিয়া আবেগময় প্রাণে তাহাকে আমার বলিয়া চিনিতে পারে সেই রূপ ক্ষণস্থায়ী পাঞ্চভৌতিক দেহ গৃহে সামান্য সময়ের জন্য বাস করিতে আসিয়া আমরা নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া দেহের সম্বন্ধে যাহাদের সহিত ক্ষণিক সম্বন্ধ ভ্রমবশে তাহাদের আপন ভাবিয়া সেই চির-দিনের আশ্রয়, প্রাণের প্রাণ মঙ্গলময় ভগবানকে ভুলিয়া যাই, পরে যখন সংসার ক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি আঘাত প্রাপ্ত হই, যখন অতি যত্নের ধনরত্ন নষ্ট হইয়া যায়, যখন প্রাণসর্ব্বস্ব সহধর্ম্মিণী কাল শয্যায় শয়ন করে, যখন সংসার ক্ষেত্রের শোভনকারী সন্তান রত্ন কালের প্রবাহে ভাসিয়া যায়; যখন রোগ শোক ক্লিষ্ট হৃদয়ের অহঙ্কার প্রশমিত হইয়া যায় ও সংসারের স্বার্থপরতা বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসে তখন উদ্‌ভ্রান্ত মনে আকুল প্রাণে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রশ্ন উঠে আমি কি এবং আমার কে?

বদ্ধ জীবেরা যখন এইরূপে আমি কি এবং আমার কে? বিচার করিতে থাকে তখন তাহারা মহা বিভ্রাটে পতিত হয়, চিরদিন যাহাদের আমার বলিয়া ধারণা ছিল তাহারা আমার নহে এমন কি এ দেহ পর্য্যন্ত আমার নহে তবে আমার কে? এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার জন্য তাহাদের মন প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে তখন ক্রমশঃ তাহাদের বুদ্ধি ঈশ্বরাভিমুখী হয়। ব্যাকুল প্রার্থনা ও হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে বাহিরের আসক্তি ও ইন্দ্রিয়ের তাড়না ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং ইহাই জীব হৃদয়ে ভক্তি বীজের অঙ্কুর স্বরূপ জ্ঞানোদয়ের উষাকাল।

ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের এই অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ।

ভাঃ ১১ স্কন্ধ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রকৃত বৈরাগ্য হয় নাই, অথচ মায়াময় সংসারের স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাতে মিথ্যা আসক্তির কতক পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে এবং মায়া তিমির ভেদী আমার নামে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হইয়াছে, সেই ব্যক্তির পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধপ্রদ।

কিন্তু যেমন কর্পূরকে বজায় রাখিতে হইলে তাহার সহিত মরিচ সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞানকে বজায় রাখিতে হইলে তাহার সহিত ভগবৎভক্তি মিশ্রিত করা আবশ্যক যেন অবিদ্যা কুজ্ঝটিকা পুনবায় উদয় হইয়া হৃদয়কে তিমিরাচ্ছন্ন না করে. ঐ মায়াবিনী গুপ্তভাবে কুম্ভিরের রূপে জ্ঞান সমুদ্রে বিচরণ করে, এজন্য ভক্তি রূপ হরিদ্রা মর্দ্দন করিয়া অবগাহন করিলে উহার কবলে পতিত হইবার ভয় থাকে না, কেননা অবিদ্যার কুহক বড় ভয়ানক; অনেক সময় ঐ কুহকিনী পুণ্যের আকারে উদয় হইয়া জীবকে প্রতারিত করে, বিষ্ঠাপুরিত চাকচিক্যময় স্বর্ণ ভাণ্ড জীবের হস্তে প্রদান করে অতএব এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবৎ সকাশে ভক্তি প্রার্থনা করা আবশ্যক।

শ্রীভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন;—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে।

অর্থাৎ এই যে দৈবী ত্রিগুণাত্মিকা আমার মায়া, যাহা দ্বারা সংসার মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাহারা এই মায়াজাল ছিন্ন করিতে সক্ষম হয়।

পাঠকগণ হরিভক্তি হৃদয়ের মধ্যে এমন একটী শক্তি জাগ্রত করিয়া দেয়, যাহাতে অবিদ্যা এবং তৎসম্ভূত রিপু সকল সমূলে নাশ পায়।

যে হেতু— কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভিঃ হরিভক্তি রনুত্তমা
অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাব জ্বালেব পন্নগীম্।

পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ দাবানল যেমন সর্পীকে ভস্মিভূত করে, তেমনি হরিভক্তি সৎ-শক্তিগুলিকে জাগ্রত করিয়া অবিদ্যাকে দগ্ধ করে। অবিদ্যা দগ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হয়, জ্ঞানোদয়ে মায়াময় সংসারাসক্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া ভগবৎ-চরণোদ্দেশে প্রবাহিত হয় এবং ভক্তি রূপ বায়ু হিল্লোলে তাহা হইতে প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হয় নচেৎ সংসারের ও ভগবানের এই উভয়ের আসক্তি যিনি বজায় রাখিতে চাহেন তিনি মূর্খতাবশে ভগবানকে পান না; যেমন ছিদ্রযুক্ত বারিপাত্র বারিপূর্ণ করিলে ক্ষণকাল মধ্যে তাহা শূন্য হইয়া যায় সেইরূপ সংসারাসক্তি রূপ ছিদ্র দ্বারা ভগবৎ আরাধনার ফল নিঃশেষ হইয়া যায়।

কোন মহাজন বলিয়াছেন ;—

না দিলে প্রেম ষোল আনা কিছুতে আমার মন উঠে না
সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্ না আমারে।
যে দেয় প্রেম করে ওজন সে তো নয় প্রেমিক কথন
সংসারের বণিক সে জন, থাকে সে সংসারে।

অতএব হৃদয়কে অনাসক্তভাবে সংসারে রাখিয়া, সংসারকে কৃত্রিম প্রেম দেখাইয়া অর্থাৎ মায়াকে বিদায় দিয়া স্ত্রী পুত্রাদির উপর দয়ার ভাব দেখাইয়া ও ঈশ্বরাদিষ্ট পথে সাংসারিক কর্ত্তব্য সাধন করিয়া প্রাণের যাবতীয় প্রেম ও আসক্তি ঈশ্বর চরণে অর্পণ কর, তিন দিনের দুঃখমাখা ক্ষণিক সুখের আশায় চিরশান্তি ও অনন্ত সুখ হারাইও না, সংসার কূপে নিপতিত জীব সকলের উদ্ধার জন্য ভগবান্ শাস্ত্রে সকল উপায়ই দেখাইয়া দিয়াছেন।

যোগবাশিষ্টে বশিষ্ট দেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন ;—

বহিঃ কৃত্রিম সংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তর্লোকে বিহর রাঘব ॥

অর্থাৎ—

হে রাঘব, অন্তরে আবেগ বর্জ্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম আবেগ দেখাইয়া, ভিতরে অকর্ত্তা থাকিয়া, বাহিরে কর্ত্তা হইয়া সংসারে বিচরণ কর।

পাঠকগণ! ঈশ্বর যখন আমাদের সংসারে পাঠাইয়াছেন, তখন সাংসারিক কর্ত্তব্য অবশ্য পালনীয়. বাহিরে যাহাই থাকুক, সেই নিত্যধামে সূক্ষ্ম জগতে মন লইয়া সম্বন্ধ, বনে গেলেই সন্ন্যাসী বা ত্যাগী হয় না, সং বা সর্ব্বস্ব যিনি ন্যাস বা ভগবানে অর্পণ করিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ সংসারের আসক্তির গতি ফিরাইয়া যিনি ভগবচ্চরণে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছেন তিনি সংসারী হইলেও সন্ন্যাসী এবং পর্ব্বতগুহা বাসী, জটা কৌপীন ধারির হৃদয় যদি বাসনা যুক্ত হয় তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মধ্বজি ভণ্ড ও মুগ্ধ সংসারির অপেক্ষা অধম।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন ;—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয়াসক্তিহীন হইয়া ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করেন। পদ্মপত্রে যেমন জল দাঁড়াইতে পারে না সেই রূপ তাঁহার হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মৃত্যু।

ওহে! মৃত্যু, কতদূরে কোন্ অন্ধকার পুরে,
লুকাইয়া আছ তুমি, বল সখে, বলনা;
কখন আসিয়া তুমি, প্রবেশিবে রঙ্গভূমি,
সজ্ঞানে তোমার লীলা দেখিতেকি পাবনা?

কবে তব আগমন, হবে তার নাহিক্ষণ,
সহসা করিবে বুঝি চমকিত সকলে?
সুচতুর অভিনেতা, তোমার মতন হেথা
দেখে নাই কেহ কভু ক্ষিতি আর ভূতলে।

প্রাচীন হয়ে নবীন, আছ তুমি চিরদিন,
তোমার দর্শনে হয় ভয়ে সবে চকিত,
অমৃত অগণ্য দ্বার, পশিবার হে তোমার,
কি বেশে আসিবে কবে নহে কেহ বিদিত।

ভব লীলা শেষ করি, লইয়া যাইবে ধরি,
কোন্ দেশে, কার কাছে, পার কি হে বলিতে?
কোন্ পথে লয়ে যাবে, রাখিবে কোথা কি ভাবে,
বিস্তারিত সব কথা ইচ্ছা হয় জানিতে।

বহু চেষ্টা পরিশ্রমে, পারিনা যা কোন ক্রমে,—
অন্তর হইতে কভু স্থানান্তর করিতে,
মৃত্যু, তুমি বলে ধরি, লবে সে সকল হরি,
দিবেনা তিলের তরে একবার ভাবিতে?

এমন পরিবর্ত্তন, বিপরীত সংঘটন,
ঘটাইতে নারে আর কেহ বিশ্ব মাঝারে;
তবু কিন্তু কৌতূহল, দেখিবারে এ সকল,
আছে মনে অতিশয়, তাই ডাকি তোমারে।

চিরঞ্জীব নর আমি, অনন্ত জীবন স্বামী
অমর চৈতন্য বস্তু নাহি ডরি মরণে;
হরি নামে তোর ভয় নাশিব হে সুনিশ্চয়,
সঁপিয়াছি প্রাণ মন মৃত্যুঞ্জয় চরণে।

শ্রীআনন্দনাথ ভট্টাচার্য্য,
[illegible]

দয়াই ধর্ম্ম।

জীবন্ত করিয়া প্রকৃতি জীবন, জীবন্ত করিয়া নদ নদী গণ,
উচ্চকণ্ঠে ওই গায় প্রস্রবণ, "দয়াই ধর্ম্ম পৃথিবী তলে;
শুনহে মানব শুন একবার, আমি জলধারা সামান্য আকার,
গিরিবরে তবু করিয়া বিদার দয়াই ধর্ম্ম দেখাই সকলে।"

ওই শুন পুন তটিনী লহরী, কুলু কুলু করি দিবস শর্ব্বরী,
অকাতরে সদা সলিল বিতরি, সেই এক সত্য প্রচার করে;
"কত জল যান জলচর কত, রাখিয়াছি বুকে দেখ শত শত,
দেখাতে মানবে আমি অবিরত, দয়াই ধর্ম্ম অবনি পরে।"

ওই দেখ সব তরু লতাগণ, ফল ফুলে শোভি স্বভাব কেমন,
তুষিয়া সতত জীবজন্তু গণ, দয়াই ধর্ম্ম প্রচার করে;
পর্ব্বত-কন্দর গহন কানন, মানবে যে সব ভাবেহে ভীষণ,
তা'রাও পালিছে জীব জন্তুগণ, দয়াই ধর্ম্ম প্রচার তরে।

তাই বলি সবে ভেবনা কখন আহার বিহার যাপিতে জীবন,
হয়েছে গঠিত মানব কখন, জড়ের অধম নিস্পন্দ হ'তে,
তাহ'লে কেনবা অস্থি মজ্জাময়, তা'হলে কেনবা হস্ত পদ ময়,
তা'হলে কেনবা বলবীর্য্যময়, ধরেছ শরীর, কি কাজ সাধিতে?

অবারিত বেগে দেব দিবাকর, ভ্রমি অনুদিন দেশ দেশান্তর,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয় নিরন্তর। দয়াই ধর্ম্ম অবনি মাঝে;
"জগতের হিতে তামস নাসিয়া প্রকৃত সময়ে প্রাচিতে উদিয়া,
রূপের প্রবাহ চৌদিকে ঢালিয়া, ঊষায় সাজায় মোহন সাজে।

মধ্যাহ্ন সময়ে কিরণ প্রখর, ছড়াইয়া ফেলি অবনি উপর,
বাষ্পময় করি বারি নিরন্তর কত উপকার সাধন করি;
আমারি প্রভাবে ঘনবর কোলে, নাচিয়া হাসিয়া সৌদামিনী খেলে,
নীরদ সলিল ঢালিছে ভূতলে, দয়াই ধর্ম্ম প্রচার করি।

* * * * *

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।

অমলা—(ক্ষুদ্র গল্প) পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

দারুণ ছুরিকা প্রহারে মজুয়ার হৃতপিণ্ডের মর্ম্ম স্থল বিদ্ধ হইয়াছিল, মজুয়া পড়িয়া গেল। প্রাণ যায়, রুদ্ধবাক্যে এখনও মজুয়া বলিল "নিষ্ঠুর! আফ্‌জল! সেই অকৃত্রিম প্রেমের কি এই পরিণাম?"

বক্ষ হইতে প্রবল রক্তধারা বহিল, মজুয়া মূর্চ্ছিত হইল। সহসা তীরবেগে এক ভুবন সুন্দরী দেবী প্রতিমা ছুটিয়া আসিয়া মজুয়ার পার্শ্বে বসিলেন, মুখে চক্ষে জল দিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণের পর মজুয়া চক্ষু মেলিল, দেখিল সেই তটিনী তট বাসিনী দেবী অমলা, মজুয়া কাঁদিল, কহিল "দেবী!—— আঃ——তুমি দেবী, আমি যবনী——ছুইওনা——হা প্রেম!—— প্রাণ যায় তবু সে প্রেম যায় না——ওঃ——আফজল! আর একবার দেখিতে পাইলাম না——বক্ষে ছুরি মারিয়াছে, সে জন্যত কিছু বলি নাই——কিন্তু যদি একবার মরিবার সময় দেখাদিতে, সুখে মরিতাম——"

অমলা কহিলেন "ছিছি! হতাশ কেন? প্রেম যদি ঠিক হয়, তবে আর বিচ্ছেদ কি?"

মজুয়া। "ছিছি!—মরিলাম—হা—নিরাশা—"

অমলা। "হতাশ হইও না, অধিক বুঝাইবার সময় নাই, পরকাল মান? পরকালে প্রিয়তমকে পাইতে চাও?"

মজুয়া। "পরকাল—ওঃ—আখেরীর দিন—অনেক দূর—"

অমলা। "আখেরীর দিন? ও যাবনিক ধারণা—ছাড়, যদি এই দেহান্তরের পরই সেই প্রেম রাজ্যে যাইতে চাও, হিন্দুর মতে বিশ্বাস কর।"

মজুয়ার হতাশ প্রাণে আশা আসিল, যাতনাক্লিষ্ট মুখেও

আনন্দ বিভা দেখা দিল, চক্ষে আনন্দাশ্রু পড়িল, কহিল "এমন উপায় আছে কি? আমাকে হিন্দু করিতে পার?"

অমলা। "যদি বিশ্বাস করিতে পার তবে এই মরণ সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও—

হরে মুরারে—মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

বামা কণ্ঠের মধুরিমা মধুর হরিনাম লহরী গগণ পথে গড়াইয়া চলিল, মজুয়ার মন প্রাণ যেন সেই পবিত্র সুধাসঙ্গীতে গলিয়া গেল, মজুয়াও সঙ্গে সঙ্গে গাহিল। একবার—দুইবার—তিন বারের সময় তাহার নয়নে প্রেমাশ্রু বহিল, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, মজুয়া প্রেমভরে অমলাকে আলিঙ্গন করিতে হাত বাড়াইল। অমলা, যবনীকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন "বস্তু শক্তির প্রভাব দেখিলে? তুমি আর যবনী নাই, এখন দেবী। যাও স্বর্গে যাও, তোমার জন্য প্রেম রাজ্যের পুষ্পময় বিমান আসিয়াছে। কিছু দেখিতেছ কি?"

মজুয়ার কথা বাহির হইল না, উর্দ্ধে অঙ্গুলী সঙ্কেতে বি দেখাইল, চক্ষে জল, কণ্ঠরুদ্ধ। অমলা ভাবে বুঝিলেন, কহিলেন "প্রেম রাজ্যের পুষ্পক বিমান! যাও সাধ্বী! সুখে যাও, সেখানে গিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা কর, এক তিল যেন পতি দেবতাকে ভুলিও না। আমি আফ্‌জলকেও তোমার সমধর্ম্মী করিব, তোমার নিকট পাঠাইব।

মজুয়ার চক্ষে প্রবল বেগে অশ্রু পড়িল, অমলার চরণের ধূলা মস্তকে লইলেন, চক্ষু উর্দ্ধে উঠিল, জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। অমলাও "হরে মুরারে" গাইতে গাইতে বনান্তরালে লুকাইলেন।

যখন এই মজুয়ার সহিত আফ্‌জলের প্রথম প্রেম সম্মিলন হয়

তখন আফ্‌জল তাহার জন্য প্রাণাপেক্ষা রাখে নাই। মজুয়া আরমানী রমণী বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সে কেবল সৌন্দর্য্যে, কিন্তু প্রকৃত সে হিন্দু রমণী, আফ্‌জলের প্রেমে বন্দিনী হইয়া কুল, মান, ধর্ম্ম, পিতা, মাতা ও বন্ধু ছাড়িয়া যবন আফ্‌জলকেই বিবাহ করিয়াছিল। হায়! সেই প্রাণের প্রাণ মজুয়াকে স্বহস্তে হত্যা!—বিনা অপরাধে——আফ্‌জলের ক্রোধ গেল, মজুয়ার সেই মুখ খানি মনে পড়িল—দারুণ ছুরিকাঘাৎ মনে না করিয়াও যে মজুয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ছিল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, মরিবার সময় চক্ষের বাহিরে যাইওনা" সেই কাতর বাণী, সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখ খানি মনে আসিল, আফ্‌জল ঘুরিতে ঘুরিতে বসিয়া পড়িল। উন্মত্ত আফ্‌জল আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া গিয়া মজুয়ার রক্তাক্ত মৃতদেহ বক্ষে লইয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় বনান্তরাল হইতে রমনী কণ্ঠের সঙ্গীত পাইল

হরে মুরারে মধুকৈট ভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

আফ্‌জল চমকিয়া চাহিল, দেখিল সঙ্গীতকারিণী সেই অমলা! অমলা ধীরে ধীরে তাঁহার দিকেই আসিতেছে। আফ্‌জলের আবার ক্রোধ উপস্থিত হইল, তীব্র চীৎকারে কহিল "পাপীয়সি! মায়াবিনি! তোর জন্যই আমার এই সর্ব্বনাশ, তুই কে? মানবী না রাক্ষসী?"

অমলা মধুর বাক্যে কহিল "যেই হই, সে পরিচয়ে কাজ নাই, জিজ্ঞাসা করি এ বৃথা রোদনের কারণ কি?"

বালার স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আফ্‌জল বিস্মিত হইল, পূর্ব্ববৎ উত্তেজিত স্বরেই কহিল "পাপিষ্ঠে। তোর হৃদয় থাকিলে এমন কথা বলিবি কেন? তোর জন্যই আমার এই প্রেমতরু স্বহস্তে ছেদন করিয়াছি।"

অমলা। "ছি! ছি! বলিতে লজ্জা হয় না? তুই কামুক,

প্রেমের কি জানিস্‌? কামকেই প্রেম মনে করিয়াছিস্‌, তোর দেহে যদি প্রেমের সম্পর্কও থাকিত, তাহা হইলে এমন হইত না। হায়! হায়! এই সাধ্বী তোর প্রাণের ভালবাসা দেয়াও বাঁধিতে পারে নাই, তুই কাম মত্ত গজেন্দ্র, প্রেমের মৃণাল বন্ধন তোর কি করিবে! হারে মূর্খ যবন! প্রেম কি তোর মত পিশাচের হৃদয়ে থাকিতে পারে?"

তেজ দেখিয়া আফ্‌জল নরম হইল, কহিল "সুন্দরী! এ তিরস্কার এ পাষণ্ডের যোগ্যই বটে।"

সতেজ উজ্বল নয়নে চাহিয়া অমলা কহিল "আবার সুন্দরী? ওরে অপ্রেমিক! নিষ্ঠূর প্রাণি! তুই যদি প্রেমের গরিমা জানতিস্‌, তা হইলে এই মজুয়ার নিকট তোর জগৎ কুৎসিত বোধ হইত। তোর চক্ষে যখন আমি সুন্দরী, তখন কোন মুখে বলিস এই মজুয়া তোর প্রেম তরু!"

আফ্‌জল হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মজুয়ার মৃত দেহ পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "হা মজুয়া! হা প্রিয়তমে! এমন পাষণ্ডকেও তুমি ভাল বাসিয়াছিলে?"

অমলা কহিলেন, "প্রকৃত ভালবাসার লক্ষণই ঐ, প্রেমিকা প্রেমাস্পদের দোষ দেখিতে পায় না। মজুয়ারই তোর প্রতি যথার্থ প্রেম ছিল, কিন্তু তুই নিতান্ত স্বার্থপর কামুক, কাম চরিতার্থ জন্যই তোর প্রণয়, সেই জন্য এই কুসুম কোমলার প্রাণের বন্ধন ছিঁড়িয়া অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলি। আফ্‌জল! তোর জিহ্বা খসিয়া পড়িল না। এই প্রেমিকাকে ব্যভিচারিণী বলিয়াছিস্‌! মজুয়া যে এখানে ছুটীয়া আসিয়াছিল, সে কি ইচ্ছায়? প্রাণের তাড়নায়। হায়! এমন অনুরাগিণীর বুকে ছুরি মারিয়া এখনও বাঁচিয়া আছিস্‌?"

দয়াবতী অমলার চক্ষুতে জল পড়িল। আফজলও আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মজুয়ার বক্ষ

হইতে ছোরা উঠাইল, অমনি ক্ষত মুখে পিচকারীর বেগে রক্ত-স্রোত ছুটিল, উন্মত্ত আফ্‌জল সেই ছোরা লইয়া নিজ বক্ষে মারিতে উদ্যত, অমলা তাহার হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইলেন। কহিলেন, "বুঝিলাম মজুয়াতে তোমার ত ভালবাসা আছে, ক্ষান্ত হও, আত্মহত্যা মহা পাপ, যদি মজুয়াকে পাইতে চাও, আমার কথা শুন।"

আফ্‌জল অমলার পবিত্র করস্পর্শে যেন নিষ্পাপ হইল, বিস্মিত হইয়া কহিল, "দেবি! তুমি কে? তুমি কি আল্লার প্রেরিত?"

অমলা। "হাঁ! আমি শ্রীহরির কিঙ্করী, জীবের ভালর জন্য তিনিই কোন জীবনে নিযুক্ত করেন, কিন্তু নিজের ভালমন্দ নিজের হাতে, তুমি কি তোমার এই মজুয়াকে পাইতে চাও?"

আফ্‌জল কাঁদিল, কহিল, "স্বহস্তে ছুরি মারিয়াছি, আর সে আশা কেমন করিয়া করিব। দয়া করিয়া আমায় ছোরা দাও, মজুয়ার শোক বিস্মৃত হই।"

অমলা। "ক্ষান্ত হও, প্রেম স্বর্গীয় নৈসর্গিকবন্ধন, জীবনান্ত হইলেও সে বন্ধন ছিন্ন হয় না, মরণের পরও তাহার অটুট সম্বন্ধ, আমাদের এই লোকের উপরে এক প্রেমময় রাজ্য আছে, মরণের পর অতৃপ্ত প্রেমিক প্রেমিকা সেই স্থানে গিয়া পুনর্ব্বার সম্মিলিত হয়। তুমি হিন্দুর এই পবিত্র মত মানিতে চাও না, চিরদিন গোড়ে ভূত হইয়া থাকিতে চাও।"

আফ্‌জল। "আমাদের মতেও ভেস্ত ও দোজখ আছে, যারা খোদার বিচারে গুণাগার হয়, তাহা দোজখে যায়, যারা খোদার হুকুম তামিল করে, তাহারা ভেস্তে যায়। কিন্তু মরণের পর মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ আমরা মানিতে চাই না, ওটী তোমাদের হেঁদুর ভুল।"

অমলা। "তবে তুই গোড়ে ভূত হইয়া থাক্। হারে মূর্খ যবন! এই পবিত্র প্রেম—যাহার বন্ধনে বিভিন্ন দুটী হৃদয় এক হইয়া যায়,

ইহা কি আতস বাজীর মত ক্ষণিক, যে মরিলেই ফুরাইল। ইহার কি পর জীবনে কোনই পুরস্কার নাই? তোর সে জ্ঞান থাকিলে এক ফুল পঞ্চাশ জনকে দিবি কেন? এই জীবন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি মজুয়াকে পাইতে চাইস্ তবে হিন্দুর আস্তিক মতে আয়, তোর ভাল হইবে। মজুয়া—আহা! পতিব্রতা সাধ্বী মজুয়ার প্রাণ পবিত্র প্রেমে পূর্ণ, আফ্জল! সেই পতিপ্রাণা মজুয়া তোমার জন্য স্বর্গীয় প্রেমরাজ্যের নন্দন কাননে বসিয়া দিন গণিতেছে, আর তুমি চিরদিন ভূত হইয়া গোড়ে থাকিতে চাহিতেছ? ছি!

আফ্জল। "মজুয়াও আখেরিব দিন পর্য্যন্ত গোড়ে থাকিবে? যখন খোদার হুকুমে এক এক কবর হইতে এক এক নামে হাজার মুর্দ্দা খাবা হইবে, সেই দিন সকলেব বিচার।"

অমলা। "তোমার মুণ্ডু। মজুয়ার গোড়ে থাকিতে দায় পড়িয়াছে, সে হরির কৃপায় সেই প্রেম রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। যদি তুমিও যাইতে চাও, মজুয়াকে পাইতে চাও্ তবে আমার কথা শুন, আমার মতে আইস।"

আফ্জল। "তোমার কথাগুলি বেশ ভাল লাগিতেছে, কিন্তু চির দিন যাহা মানিনাই, তাহা মানিতে মন সরিতেছে না।"

অমলা। "তুমি বিশ্বাস কর, আমার সঙ্গে সঙ্গে হরিবল, প্রত্যক্ষ ফল দেখিলে মানিবেত?"

আফ্জল। "হরি কে?"

অমলা। "জগতের কর্ত্তা।"

আফ্জল। দুনিয়ার মালিক আল্লা।"

অমলা। "দুনিয়া এক না দুই? যাহাকে তুমি আল্লা বল আমি তাহাকেই হরি বলি।"

আফ্জল। "তবে আল্লা বলিলে কি হয় না।"

অমলা। "হয় কি হয় না আমি জানি না, আল্লা বলিলে কি হয়?

আফ্জল। "মনে আল্লা আইলে দিল্ সাফ্ হয়।"

ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ—(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

আজ প্রায় দশ বার দিন হইল, গঙ্গার ঘাটে একটী মহাত্মা আসিয়াছেন। গ্রামের প্রায় সকল ভদ্রলোকেই তাঁহাকে দেখিতে যান। মহাত্মার সুমধুর আলাপ, বিনয়, নম্রতা ও অসাধারণ জ্ঞান গর্ভ উপদেশে একবার তাঁহাকে যে দেখিয়াছে সেই তাঁহার অসাধারণ গুণে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়াছে। গ্রামের ভদ্র সম্প্রদায়ের আর অন্য আলোচনা নাই। যিনি যখন অবসর পাইতেছেন তখনই তিনি মহাত্মার নিকট আসিয়া কত কি ধর্ম্ম কথার আলোচনা করিতেছেন। প্রায় সর্ব্বদাই দুই চারি জন লোক তাঁহার কাছে বসিয়া থাকেন, যাহার যাহা সন্দেহ, তিনি প্রাণ খুলে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ মিটাইতেছেন। গ্রামে এক মহান ধর্ম্ম স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

একজন কথায় কথায় বলিল, মহাশয় কাল সকালে হইতে এই গ্রামে একটী পাগল আসিয়াছেন, গ্রামের সকলেই তাহাকে দেখিয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করতঃ চমৎকৃত হইয়াছেন। বিশেষতঃ বালকগণ প্রায় সর্ব্বদাই তাহার কাছে বসিয়া আছে। বাল জাতি সুলভ, চঞ্চলতা নাই, পরস্পর খেলিবার বা বেড়াইবার কথাই নাই, কি যেন এক মোহিনী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া পাগলের সহিত নাচিতেছে ও নিঃশঙ্কচিত্তে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছে। আহা! সে দৃশ্য অতি মধুর! আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গ্রামের যে সমস্ত শিক্ষিত লোকের হৃদয়ে এক বদ্ধমূল সংস্কার ছিল যে হরি সংকীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তনে নৃত্য করা এক প্রকার লজ্জা হীন অসভ্যতারই কার্য্য; কিন্তু তাহারা পাগলের ভাবগতিকে বিমুগ্ধ হইয়াছেন, ভাবে মাতিয়াছেন, গাইতেছেন ও নাচিতেছেন আর আপন বন্ধুবান্ধবকে নিশ্চলভাবে বলিতেছেন, "বন্ধুগণ এই এক অপূর্ব্ব আনন্দ; এইরূপ আনন্দ কখনও ভোগ করি নাই পূর্ব্বে যাহা ধারণা ছিল, তাহা অতিশয় ভ্রমাত্মক [illegible] তাহাতে

সন্দেহ নাই।" মহাশয় বলিব কি, আমাদের দেশ যেমনই ধর্ম্ম বহির্ম্মুখ ছিল তেমনই আপনার শুভাগমনে লোকের কুসংস্কার দূর হইয়া সৎ শিক্ষা পাইল, এবং বিধি প্রেরিত পাগলের গুণে আশাতীত ভাবে লোক আনন্দে মাতিল। যাহারা অসৎ সঙ্গ পরায়ণ কুকর্ম্ম নিরত ছিল আজ কাল তাহারা আপন আপন কার্য্যের জন্য নিজকে শত শত ধিক্কার দিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। আমাদের বোধ হয় যে ইনি সামান্য পাগল নন, কোন মহাপুরুষ। পাগলের নিকট আপনার কথা বলা মাত্র, তিনি আসিতেছিলেন কিন্তু বালকগণের প্রেমে ও গ্রামের ভদ্রলোকের একান্ত আগ্রহে আসিতে পারিতেছেন না। মহাত্মা এই সকল কথা শুনিয়া প্রশান্ত অথচ গম্ভীর ভাবে বলিলেন আপনাদের দেশের সৌভাগ্য, পাগল শীঘ্রই এখানে আসিবেন।

(পাঠকগণ! ঐ মহাত্মা ও পাগল আপনাদের পূর্ব্বপরিচিত ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ। জীব উদ্ধারের নিমিত্ত উভয়ে অতিশয় যত্নপর হইয়া একজন প্রেমে মাতোয়ারা আর একজন ধীর, গম্ভীর পণ্ডিত সাজিয়া বেড়াইতেছেন।) এইরূপ কথোপকথনের অব্যবহিত পরেই গগণ ভেদী রবে হরিবোল হরিবোল ধ্বনি করিতে করিতে বহুলোক সমভিব্যাহারে পাগল গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত। হরিনাম শ্রবণ মাত্র মহাত্মার শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইল, তিনি করতালি দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আহা! ইনিই প্রকৃত পণ্ডিত, আমাদের দেশে সামান্য কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া অনেকেই পণ্ডিত মহাশয় সাজিয়া একেবারে অভিমান ও অহঙ্কারের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি স্বরূপ হইয়া থাকেন। প্রিয় পাঠকগণ! আপনারা নিশ্চয় জানিবেন শ্রীভগবানে যাহার মতি নাই শ্রীভগবন্নাম শ্রবণে যাহার আনন্দ ও উৎসাহ হয় না, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও জগতের অনিষ্টকারক, কুসংস্কারী মূর্খ আর অল্প শাস্ত্রজ্ঞান থাকিয়াও যাহার ধর্ম্মে মতি শ্রীভগবৎ কথায় একান্ত রতি ও যিনি অভিমানশূন্য প্রেমিক

তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত ও মহাশয়। পাগলেও মহাত্মায় পরস্পর কিছুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দের পর প্রেমালিঙ্গন হইল, কীর্ত্তন ভাঙ্গিল, মহাত্মার ভাব গতিক বুঝিয়া পাগল সকলকেই গৃহে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলে প্রণাম ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাগলের দিকে বারবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া একে একে সকলেই চলিয়া গেল। এক্ষণে পাগল ও মহাত্মা দুইজনে মাত্র মুখা মুখি হইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

প্রেমানন্দ! বৎস ক্ষ্যাপা চাঁদ এ দেশটাকে খুব মাতাইয়াছ, এই একটু পূর্ব্বেই তোমার কথা হইতেছিল, যাহা হউক, কোন কোন দেশ ঘুরিলে কোথায় কি দেখিলে বল। তোমার শরীর ভাল আছে ত। জীবের উন্নতি কল্পে বহু যত্ন করিয়া কিছু কিছু ফল পাইতেছ তো।

ক্ষ্যাপা। দেব! এই জগত লীলাময়ের লীলাক্ষেত্র কতরকম ভাব এবং কত রকম প্রবৃত্তির লোক যে দেখিলাম, কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা এই অল্প সময়ের মধ্যে দেখিলাম তাহা একমুখে বর্ণনা করিতে পারিনা। আর না—গুরুদেব, আর না—আর কখন লোকালয়ে যাব না, লোক দেখিবার, বালকের সঙ্গে মিশিবার আশাও করিব না। বেশ দেখিলাম, বেশ বুঝিলাম, বেশ শিখিলাম, আর না, আর না। গুরুদেব! আমি ভেবেছিলাম, মানুষ ত সকলেই মানুষ, বাবারে, মানুষ সেজে যে অনন্ত কোটী পশু পক্ষী বিচরণ করিতেছে মানুষ সেজে দানব দানবী, রাক্ষস রাক্ষসী, পিশাচ পিশাচী, লীলা-ময়ের লীলা ক্ষেত্রটাকে লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিল। আগে মানুষ কথাটা শুনিলেই যেমন আনন্দ হইত এখন আর তেমন হয় না। মানুষ কিনা তাহা বিশেষ করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে এমন কি পরীক্ষা করিতে স্বতই মনের আবেগ হয়।

হায়! কি ব্যাপার, কি ব্যাপার! গুরুদেব এই সংসার মরু-ভূমে, কপট বহুল লোকালয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণটা এক রকম

শুকাইয়া গিয়াছে। যখন কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন তখন অমৃত-ময় সদুপদেশ দ্বারা আগে আমার প্রাণটা শীতল করুন পরে যাহা দেখিলাম শুনিলাম তাহা বলিব, দেব! আজ দুই তিন দিন পূর্ব্বে একটী পণ্ডিতের সহিত দেখা হইয়াছিল তিনি বলিলেন "ভক্তিমার্গ বালকের পুতুল খেলার ন্যায়" ইত্যাদি পরে কয়েকটা শ্লোক পড়িয়া শুনাইলেন এবং তাহার মত মতন ব্যাখ্যা করিলেন। শ্লোকগুলি শুনিতে বড়ই ভাল বোধ হইল কিন্তু তাহার কৃত ব্যাখ্যায় আমার মনে আনন্দ হইল না আমি শ্লোক কয়েকটী লিখিয়া আনিয়াছি. প্রথমতঃ এই শ্লোক কয়েকটীর তাৎপর্য্যার্থ আমায় বুঝাইয়া দিউন পরে অন্যান্য বিষয় আলোচনা হইবে।

(এই বলিয়া ক্ষ্যাপা প্রেমানন্দের হস্তে একখানা কাগজ দিল, প্রেমানন্দ আদ্যান্ত পড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন)।

প্রেমানন্দ। বৎস এই শ্লোক পাঁচটি মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের লিখিত। শঙ্করাচার্য্য যদিও বাহিরে মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় নিগূঢ় ভগবৎতত্ত্ব জ্ঞান বা ভক্তি, সাধারণতঃ ভগবৎ ভাবহীন শুষ্কতার্কীক জ্ঞানীরা তাহার প্রকৃতভাব বুঝিতে না পারিয়া বাদমাত্র জ্ঞান জ্ঞান করিয়া চীৎকার করে মাত্র। যাহা হউক এই উপদেশ পূর্ণ শ্লোক কয়েকটীর অর্থ তোমায় বলিতেছি শ্রবণ কর ;—

(১) বেদো নিত্যমধীয়তাং (২) তদুদিতং কর্ম্মস্বনুষ্ঠীয়তাং
(৩) তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ (৪) কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্
(৫) পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং (৬) ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তা—
(৭) মাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং (৮) নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্।

আচার্য্য বলিতেছেন (১) নিত্য বেদ অধ্যয়ন কর (২) বেদোক্ত কর্ম্মাদির সুচারুরূপে অনুষ্ঠান কর (অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইলেই চিত্ত শুদ্ধি ও ভগবদ্ভাবের উদয় হইবে) (৩) ঐ কার্য্যের দ্বারা শ্রীহরির উপাসনা কর অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম

প্রতিপালন দ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন কর। (৪) কামনা সম্ভূত কর্ম্মে মতি করিও না কাম্য কর্ম্মে মতি হইলে ঈশ্বরপ্রেম হওয়া একেবারে অসম্ভব। (৫) হৃদয়ের পাপ প্রবৃত্তি ও পাপ সংস্কার যাহা রহিয়াছে তাহা একেবারে ধুইয়া ফেল শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা ও অনুতাপ দ্বারা পাপ ক্ষয় কর। (৬) আর জাগতিক সুখ যাহা অহন্তা ও মতত্বা হইতে জন্মায় এবং আপাতত ইন্দ্রিয় প্রীতিকর পরন্তু পরিণাম বিরস সেই অনিত্য সংসার সুখে সর্ব্বদা দোষানু-সন্ধান কর। (৭) আত্মার ইচ্ছা পরিণত কর অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রীয় এবং যাহার অনুষ্ঠানে ভগবদ্ভক্তি লাভ হইবার সম্ভাবনা অথচ নিজের আনন্দজনক কার্য্য সে বিষয় কাহার বাধা না শুনিয়া নিজের ইচ্ছা-মত কার্য্য কর। (৮) যদি গৃহ ক্ষেত্রাদি পরমার্থতত্ত্ব লাভের অন্তরায় মনে কর তবে শীঘ্র সেই গৃহ হইতে চলিয়া যাও।

(১) সঙ্গঃ সংস্থু বিধীয়তাং (২) ভগবতো ভক্তির্দ্দৃঢা ধীয়তাম্
(৩) শান্ত্যাদি পরিচীয়তাং (৪) দৃঢতরং কর্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।
(৫) সদ্বিদ্যোপ্যপসর্প্যতাং (৬) প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং
(৭) ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং (৮) শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাকর্ণ্যতাম্॥

(১) বাবা! সতের সহিত সঙ্গ করিবে সৎ বলিতে কেবল একমাত্র সাধু ব্যক্তিই বুঝিবে না, সৎ বলিতে সদসদ্বিবেকী সাধু-পুরুষ এবং সৎ কথাপূর্ণ গ্রন্থ, সৎ আলোচনা, সৎ আহার এমন কি যাহা আলোচনায় বা ব্যবহারে সৎ প্রবৃত্তির কারণ সত্ত্বগুণ জন্মে, সেই সকলই সৎ শব্দ প্রতি পাদ্য ঐ সৎ সঙ্গ ব্যতীত কোন প্রকা-রেই জীবনের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। (২) ভগবানে যাহাতে দৃঢ় ভক্তি (অহৈতুকী ও অপ্রতিহত প্রেমভাব) হয় তাহার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করিতে হইবে। (৩) কিসে শান্তি হয়, কোন কর্ম্ম শান্তি সুখপ্রদ ইত্যাদি সর্ব্বদা বিচার করিয়া যাহা যাহা শান্তির কারণ সেই সেই বিষয়ের অনুশীলন করিতে হইবে। (৪) আর অতিশয় আসক্তিজনক কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে, কর্ম্মে

অতিশয় মনোনিবেশ বা "আমার ও আমি" রূপে আসক্ত হওয়াই জীবের সকল দুঃখের নিদান, সুতরাং তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। (৫) সৎ গুরুর উপসর্পণ (আশ্রয়) গ্রহণ করিবে, সদ-সদ্বিবেকী তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতিত জীবের হৃদয় গত অজ্ঞান দূর করিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। (৬) ঐ সদ্‌গুরুর পাদুকা প্রতিদিন সেবা করিবে অর্থাৎ গুরুর পাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সদ্‌গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিবে। (৭) একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য ও অবলম্বনীয় মনে করিয়া তাঁহারই জন্য যত্ন করিবে। (৮) এবং শ্রুতির যাহা উচ্চ বাক্য অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ববিবেক তাহাই সর্ব্বদা আলোচনা করিবে শ্রীভগবান নিত্য তদ্ভিন্ন সকলই অনিত্য এবং তিনিই অবলম্বনীয় এই ভাব আশ্রয় না করিলে কিছুতেই মোহ-বন্ধন ছিন্ন হয় না, মোহাভিভূত ব্যক্তির ভগবত্তত্ত্ব লাভ অসম্ভব।

(১) বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং (২) শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রিয়তাং
(৩) দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাম্ (৪) শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্ ॥
(৫) ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতা (৬) মহরহর্গর্ব্বং পরিত্যজ্যতাং
(৭) দেহেঽহম্মতিরুজ্ঝ্যতাং (৮) বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥

(১) বাক্যার্থ বিচার কর অর্থাৎ তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যের প্রকৃত অর্থ বিচার কর, এখানে কেহ বলেন তুমিই সেই ব্রহ্ম, পরন্তু তুমি সেই ব্রহ্মের এইরূপ অর্থ করিলেই কোন গোল হয় না, এই বিষয় বিচার করিবার অবসর নাই প্রয়োজনও নাই, সর্ব্বদা আমি কাহার অর্থাৎ কাঁহার শক্তিতে চালিত, পালিত হইতেছি ইহাই বিচার করা কর্ত্তব্য। (২) ঐরূপ বিচার করিয়া যাহা সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সেই পক্ষই অবলম্বন কর। (৩) অন্যায় রূপে তর্ক করিও না। (৪) যাহা সাধনার অঙ্গভূত অথচ নিজের ভাবের অনুকূল সেই রূপ শাস্ত্রার্থই গ্রহণ কর, অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ কাণ্ডে এবং উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর ভাবে প্রত্যেক শাস্ত্র বাক্য বিভাগ করিয়া নিজে যেরূপ অধিকারী তাহা

নিরভিমানী হইয়া বুঝিয়া আশ্রয় করিতে হইবে, নিম্ন অধিকারী হইয়া উচ্চাধিকারীর চাল চলন বা কথা বার্ত্তা করা অতি অন্যায় এবং ধর্ম্মহানি কর, নিশ্চয় জানিবে আজ কাল ঐ জন্যই সমাজের এত অধঃপতন, কার্য্যে কিছুই করে না, পরন্তু বাক্যে বৃহস্পতি। (৫।৬) আমি শ্রীভগবানেরই অংশ এই মনে করিয়া জীবাত্মার ভাব সেই পরমাত্মা শ্রীভগবানের সহিত মিলাইবার জন্য গর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা যত্ন করিবে। (৭) দেহে আমি আমার বুদ্ধি করিবে না, অর্থাৎ এই দেহ অনিত্য, পরন্তু এই দেহ অবলম্বন করত ঈশ্বরোপাসনা করিলে জীবন আনন্দময় হইবে এই মনে করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় যত্ন পর হইবে, পরন্তু দেহই আমি ইত্যাকার মনে করিবে না। (৮) বিজ্ঞজনের সহিত বাদানুবাদ একেবারেই পরিহার করিবে, সৎ ব্যক্তির সহিত অন্যায় তর্কাদির ফল অতিশয় বিষময়, সাধু জনে অপরাধ ঘটিলে কোন সাধনা সিদ্ধ হয় না।

(১) ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং (২) প্রতি দিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং
(৩) স্বাদ্বন্নং নতু যাচ্যতাং (৩) বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।
(৫) শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং (৬) নতু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাং
(৭) ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং (৮) জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্॥

(১) ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসাকর অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া যাহাতে সাধন ভজনের হানি না হয় সেইরূপ ভাবের সহ্যগুণ থাকা উচিত।

(২) প্রতিদিন ভিক্ষারূপ ঔষধ ভোজন কর অর্থাৎ অভিমান ত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যে যাহা দেয় তাহাতেই প্রফুল্ল থাক।

(৩) উত্তম বস্তু আহার করিব এই কামনায় উত্তম বস্তুরই নিরন্তর প্রার্থনা করিও না।

(৪) যাহা লাভ করিবে তাহাই ভগবৎ ইচ্ছায় হইতেছে ইহা মনে করিয়া সর্ব্বদা সন্তোষ থাক। যথা লাভে সন্তোষই জীবন্মুক্তির প্রধান উপায়। (৫) শীত, উষ্ণ, ভাল, মন্দ, লাভ, হানি,

নিন্দা, স্তুতি প্রভৃতি সমভাবে সহ্য করিতে যত্ন কর। (৬) বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিও না অর্থাৎ যে কথায় নিজের বা পরের কোনই উপকার সাধিত হয় না এরূপ বৃথা বাক্য ব্যয়ে মনুষ্য জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিও না। (৭) সকল কার্য্যেতেই নিরাসক্ত ভাব অভ্যাস কর অর্থাৎ একমাত্র ভগবদ্ভাব ব্যতীত কিছুই নিজের আত্মার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে, ইহা স্থির জানিয়া সকল কার্য্যই নিরাসক্তভাবে করিবে। (৮) জীবের প্রতি কৃপা বিষয়ে নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করিবে অথবা কেহ তোমার প্রতি কৃপা করিলে অর্থাৎ উপকার করিলে তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার না করিয়া অতিশয় সরলভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাইবে।

(১) একান্তে সুখমাস্যতাং (২) পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং
(৩) পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাম (৪) জগদিদং তদ্বাপিতং দৃশ্যতাম্।
(৫) প্রাক্‌কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং (৬) চিতিবলান্নাপ্যুত্তরে শ্লিষ্যতাং
(৭) প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতামথ (৮) পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্॥

(১) নির্জ্জনে একমাত্র ভগবৎ চিন্তাতেই সুখে থাকিতে যত্ন কর। (২) পরের জন্য চিন্তা কর, অর্থাৎ পরের উপকারের জন্য নিরন্তর চেষ্টা কর, কিম্বা পরাৎপর পরমেশ্বরেতেই স্থির ভাবে চিত্ত রাখিতে অভ্যাস কর। (৩) পূর্ণ পরমাত্মাকে (ভগবানকে) সম্যক্ দেখিতে যত্ন কর। (৪) এই জগৎ সেই ভগবৎ সত্তায় পরিপূর্ণ, অর্থাৎ ভগবান সর্ব্বত্র সকল সময় সকল বস্তুতে বর্ত্তমান, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে যত্ন কর। (৫) গত বিষয়ের আলোচনা করিয়া দুঃখভোগ করিও না। (৬) ভবিষ্যৎ বিষয়ের ভাবনায় আকৃষ্ট থাকিও না। (৭) বর্ত্তমান সময়ে সুখ দুঃখ যাহা ভোগ করিবে তাহা আপন কর্ম্মেরই ফল ইহা জ্ঞান বলে স্থির জানিয়া কার্য্য কর!

(৮) সর্ব্বদাই ভগবদ্ভাবে থাকিতে যত্ন কর।

ক্ষ্যাপাচাঁদ এই অতি সংক্ষেপে বলিলাম, শ্লোক কএকটী অতি সুন্দর, শুনিয়া আনন্দ হইল? তবে এখন বিশ্রাম কর। (ক্রমশঃ)

দীনবন্ধু।

ভক্তির সাধন। (পূর্ব্ব প্রকাশিতে পর।)

কীর্ত্তনে সাধকের অবস্থা ;—সাধক গান শুনিতে শুনিতে গানের রসে আকৃষ্ট হইয়া আবেশে ঢলিয়া পড়েন। তাঁহার বাহ্য জ্ঞান থাকে না। তাঁহার অঙ্গে কতকগুলি ভাবের চিহ্ন মাত্র প্রকাশ পাইতে থাকে। এই অবস্থায় সাধকের অন্তঃকরণ কেবল অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হয়। তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার জনিত কোন ক্রিয়া থাকে না। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় বর্জ্জিত হইয়া প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকে।

এই অবস্থা বেশীক্ষণ না থাকার জন্য. অনেকে ইহাকে সাধকের মোহা-বস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক সে কথা হইতে পারে ; মোহ ছুটিলে যেমন স্বাভাবিক অবস্থা আপনা হইতেই আইসে এই আবেশের অবস্থার অন্তেও সাধকের সেই রূপ পূর্ব্বাবস্থা স্বভাবতই আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু, যদি সাধকগণের রসে ও ভাবে মনকে সর্ব্বদা মজাইয়া রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তরে ভাবের একটী ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। ভাব লাভ হইলে তাঁহার কৃষ্ণ প্রাপ্তির আর বিলম্ব থাকে না।

কোন সাধক নাম সংকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া কেবল নাচিতে থাকেন। সেইরূপ নৃত্যপর ভক্তের লজ্জা ধৈর্য্য ও ভয় কিছুই থাকেনা। তিনি পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইয়াও বিদ্যা ও বুদ্ধিহীন পাগলের মত হন। তাঁহার অবস্থায় সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য আছে। তাঁহার বাহিরে চাঞ্চল্য, কিন্তু ভিতরে শান্তি বিরাজিত, তাঁহার বাহিরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, কিন্তু ভিতরে প্রবল আনন্দ।

এই অবস্থা সর্ব্বদা থাকে না ; কিন্তু নাম সংকীর্ত্তন হইতে যাঁহার হৃদয়ে এইরূপ আনন্দের একটি সংস্কার স্থায়ী ভাবে দাঁড়াইয়া যায়, এবং অন্য সংস্কার সমস্ত বিলুপ্ত হয় ; তাঁহার শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। আনন্দ-ময় নৃত্যপর ভক্তের ন্যায় সকলের সৌভাগ্য কবে উদিত হইবে? কবে সকলে কীর্ত্তনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে ?

কীর্ত্তনাদির জন্য, মোটের উপর একটি ব্যবস্থা আছে। সেটী আর কিছুই নহে, বিশ্বাস। যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের লীলা বিলাসে বিশ্বাস স্থাপন করিতে জানেন, তাঁহাদের শ্রবণ কীর্ত্তনে অধিকার জন্মে। তাঁহাদের জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন ;—

"ব্রজ বধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জনে কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকাল হয় ক্ষয়।
নিতগুণ ক্ষোভ নহে মহা ধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম ভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধূর্য্যে বিহরে সদায়॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

বিশ্বাসও সামান্য বস্তু নহে। যাহার বলে রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনে অধিকার জন্মে, তাহা সমান্য হইবে কিরূপে? বিশ্বাস লাভের জন্যও সাধককে অনেক চেষ্টা করিতে হয়। কীর্ত্তনে বাদ্যের সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা আছে। বাদ্য কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞের একটি অঙ্গ। যথাপদে ;—

"খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥" ইত্যাদি।

এবং "তা তা থৈয়া বাজে মৃদঙ্গ।" ইত্যাদি।

উপাসনার জন্য খাদ্যাদির যেমন ব্যবস্থা আছে, গান বাজনারও তেমই ব্যবস্থা আছে। কীর্ত্তন গান কেবল উপাসনার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তনের প্রত্যেক অঙ্গই উপাসনার অনুকূল। কীর্ত্তন দস্যুলম্পট কি গণিকার সম্পত্তি নহে ; ভক্তের সম্পত্তি। কীর্ত্তন আমোদ প্রমোদের জিনিষ নহে, ভজনের জিনিষ। কলিযুগে জীবের যেমন পরমায়ু, যেমন শক্তি, তদনুযায়ী ব্যবস্থা। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব জীবের অপরাধ সমূহকে আহুতি দিবার জন্যই এই মহা যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যবস্থার বলিহারি।

আমাদের আশা—সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর সেই ভুবন ভুলান মনোহর নৃত্য, সেই আবেশ, সেই ভাব ভঙ্গী, সেই নয়নের দর বিগলিত ধারা সকলের মনে উদিত হইয়া প্রেমানন্দের সঞ্চার করুক।

বিষয়ীর অন্ন ও সাধক।

তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় উল্লাস।

বিষয়াশক্ত ব্যক্তি বিষয়ী। বিষয়ী ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি সংযত নহে। ইন্দ্রিয়-গণ তাহাকে স্বভাবতই বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ের মধ্যে

ফেলিতেছে। তরঙ্গ বিক্ষোভিতা নদীর ন্যায় বিষয়ীর অন্তঃকরণ সর্ব্বদা চঞ্চল। বিষয়ী ব্যক্তির স্বভাব রজোগুণ প্রধান। বিষয়ীর ক্রিয়া রজোগুণের ক্রিয়া।

বিষয়ীর সংসার কাম ক্রোধ প্রভৃতির লীলাক্ষেত্র। বিষয়ী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া করে না। কামনা প্রণোদিত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে। যদি ধর্ম্ম বলিয়া কিছু করে, তাহা ধন, মান ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য। বিষয়ী ব্যক্তির পূজাদি সমস্তই রাজস। তাহার শ্রদ্ধাও রাজসী।

বিষয়ীর সংসর্গে রজোগুণের স্ফূর্ত্তি হয়। যে ব্যক্তি বিষয়ীর সঙ্গ করে, সে অস্থির গতিতে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায়, নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করে।

বিষয়ী ব্যক্তি দোষের, বিষয়ীর সঙ্গ দোষের, কিন্তু বিষয়ীর অন্ন দোষের কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন;—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন করে মন॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

বিষয়ীর সহিত তাহার অন্নের অবশ্যই সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ না থাকিলে মহাপ্রভুর উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়। সেই সম্বন্ধ কি প্রকারে হইতে পারে, এক্ষণে তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব।

বিষয়ী ব্যক্তি কাম, ক্রোধ প্রভৃতির অধীন। সেই জন্য কাম ক্রোধাদির বিষয় প্রথমতঃ আলোচনা করিতে হইবে।

কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদিগের এক একটীকে রজোগুণের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। যেমন জলের তরঙ্গ জল ব্যতীত কিছুই নহে, তেমনই কাম ক্রোধাদি রজোগুণ ব্যতীত কিছুই নহে।

কাম ক্রোধ প্রভৃতি অন্তরে উদিত হইলে, অন্তরে তাহাদিগের স্থান কুলায় না। তাহারা বাহিরে আসিয়া বাহিরের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বিস্তার করে। তাহাদিগের গতি অধোদিকে বহির্দ্দেশাভিমুখে।

কোন ব্যক্তির ক্রোধ উপস্থিত হইলে, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ দিয়া তেজ নির্গত হয়। তাহার চক্ষু, মুখ ও শরীর রক্ত বর্ণ হয়। তাহার নিকটে যত বস্তু

থাকে। প্রত্যেক বস্তুতে তেজ সঞ্চালিত হইতে থাকে। (সকল পদার্থের তেজ গ্রহণ শক্তি সমান নহে। সকলে আপন আপন শক্তি অনুসারে তেজ গ্রহণ করিয়া থাকে।) সূর্য্য যেমন জগতের প্রত্যেক বস্তুকে তেজ দান করে, সেই রূপ ক্রোধী ব্যক্তির মূর্ত্তিমন্ত ক্রোধ তাহার নিকটস্থ বস্তুকে তেজ দান করে। সেই তেজ কি? তাহা কি রজোগুণের অবস্থা বিশেষ নহে? ক্রোধের ন্যায় কাম এবং লোভ প্রভৃতি হইতেও রাজোগুণের বিস্তার হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যখন কাম ক্রোধাদির অধীন এবং কাম ক্রোধাদি যখন রজোগুণের পুষ্টি সাধন করিতেছে; তখন বিষয়ীর অন্নে অজ্ঞাতসারে রাজোগুণের ক্রিয়া হইবে এবং অন্নের রজোগুণ পুষ্টি লাভ করিবে তাহার বিচিত্র কি?

জগতের সমস্ত পদার্থই যখন ত্রিগুণাত্মক, তখন কোন বস্তুতে গুণের ক্রিয়ার অভাব হইতে পারে না। বিষয়ীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, বিষয়ীর সংস্পৃষ্ট বায়ুতে রজোগুণের ক্রিয়া হইবে।

দেখা গেল বিষয়ীর অন্ন রজোগুণ প্রধান। বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে স্পষ্টতঃ অথবা প্রকারান্তরে বিষয়ীর সঙ্গ করা হয়, বিষয়ী ব্যক্তির রজোগুণ অজ্ঞাতসারে অন্তঃকরণ অধিকার করে।

বিষয়ীকে দেখিয়া কাহার ভয়? বিষয়ীর অন্ন বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে কে বাধ্য? এই কথার এক মাত্র উত্তর—সাধক। সাধক তাঁহার অতি যত্নের ভক্তিটুকু কোথায় চুপসিয়া যাইবে বলিয়া ভয় করেন, ভয় করেন তাঁহার নির্ম্মল জ্ঞানে রজোগুণের চাঞ্চল্য দেখা দিবে বলিয়া, আর ভয় করেন ভক্তির পথে বিঘ্ন জন্মিবে বলিয়া।

সমস্ত সংশোধিত করিয়া কার্য্য করা সাধকের শক্তিতে কুলায় না। সাধককে অনেক বিষয়ে অন্যের সাহায্য লইতে হয়। যে সকল বিষয়ে অন্যের সাহায্য লইতে হয়, সেই সকল সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সকল দ্রব্যের দ্বারা ভজনের সামান্য উপকারিতা আছে, তাহা যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করা ও যাহা হইতে অপকারের সামান্য আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করাই ব্যবস্থা।

বিষয়ীর অন্ন ত্যাগ, বিষয়ীর অন্নের জন্য নিমন্ত্রণ ত্যাগ বৈরাগ্য ধর্ম্মের একটী অঙ্গ।

রঘুনাথ পিতৃ দত্ত অর্থ নিজে গ্রহণ না করিয়া সেই অর্থের সদ্ব্যয় জন্য

মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবেন। কিছুদিন পরে নিমন্ত্রণ বন্ধ করিলেন এবং কহিলেন ;—

"এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল।" শ্রী চৈঃ চঃ।

মহাজ্ঞানী রঘুনাথ রজোগুণকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিলেন। কোন ব্যক্তি কোন সাধুকে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যদি নিমন্ত্রণ করে, এবং সেই সাধু সেই নিমন্ত্রণের সম্মান রক্ষার জন্য তাহার দ্রব্যাদি সাদরে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সাধুর অন্তরে প্রতিষ্ঠার প্রতিবিম্ব পতিত না হইবে কেন ?

বিষয়ীর অন্নে নানা কারণে

"দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন করে মন।"

বিষয়ীর দ্রব্য বিষয়ীকে স্মৃতিপথে জাগাইয়া দেয়, বিষয়ীর ভাব অন্তঃকরণে প্রদান করে।

ভক্ত, ভক্তের অন্ন প্রার্থনা করেন। ভক্তের অন্ন ভক্তিরস পরিসংস্কৃত সত্ত্ব গুণ পরিপুষ্ট। ভক্ত উপবাস করিয়া মরিতে ভয় করেন না, ভয় করেন অভক্তের অন্নকে। যদিও ভক্তের হৃদয় সহসা নষ্ট হয় না, তথাপি যাহা ভজনের প্রতিকূল, যাহা গ্রহণ করিলে হৃদয় নষ্ট হইতে পারে, এমন বস্তু ভক্ত গ্রহণ করিতে চাহেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব বৈরাগ্যের শিক্ষা গুরু। তিনি ভক্তরক্ষার জন্য সামান্য দোষও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন ;—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন করে মন॥" শ্রী চৈঃ চঃ।

যেমন প্রভু তেমনই ভক্ত। রঘুনাথ গোস্বামীর বৈরাগ্য দেখিয়া পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। যিনি বড় লোকের ছেলে হইয়া দীনের দীন কাঙ্গালের কাঙ্গাল সাজিয়া বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি বৈরাগ্যের অন্তরায় বলিয়া মহাপ্রভুর সেবা ও সিংহদ্বারের ভিক্ষা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি পচাসড়া পরিত্যক্ত প্রসাদান্ন দুই চারিটী কুড়াইয়া খাইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। যিনি রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে মন প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিয়া বৈরাগ্যের

পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যাঁহার গুণ কবিরাজ গোস্বামী গাইতে গিয়া মুক্ত-কণ্ঠে বলিয়াছেন ;—

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে।
সবে চারি দণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে করে নিবেদন॥
প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হইলে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহুপানী॥
ভিতরেতে দড় ভাত মাজ যেই পায়।
লোণ দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায়॥

আহা কি মধুর বৈরাগ্য! সকলে রঘুনাথের একবার জয় দিউন। মহাপ্রভু রঘুনাথের ব্যবহার জানিতে পারিয়া, একদিন রঘুনাথের সেই সড়া প্রসাদান্ন খাইয়া বলিলেন ;—

"প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদ না পাই॥" শ্রী চৈঃ চঃ।

যেমন ভক্ত তেমনই প্রভু। এই ভাব কি ভগবান ভিন্ন অন্যে সম্ভবে? প্রভু ভক্তের পচা সড়া অন্নে সন্তুষ্ট, কিন্তু বিষয়ীর শাল্যান্ন স্পর্শ করেন না।

বৈরাগ্য কি বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তেরাই জানেন। নির্ম্মল পদার্থেই সামান্য ময়লা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য রঘুনাথ তাঁহার বৈরাগ্যের

নির্ম্মল অন্তঃকরণে যেটুকু মলিনত্ব দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহা অপরে কে দেখিবে? বিষয় বিষ্ঠার কীট আমরা বিষয়ীর অন্ন কি প্রকারে পরীক্ষা করিব?

আমার প্রার্থনা, যাঁহারা বৈরাগ্য ও ভক্তিবলে ভগবানকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন গৌরভক্ত গোস্বামীদিগের অনুসরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ নাম।

চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ উল্লাস।

এক্ষণে নামের বিষয় পৃথক্ রূপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শুধু কৃষ্ণনাম, সুর—তাল সংযুক্ত নয়, শুধুই কৃষ্ণনাম। ইহাতে আবাল বৃদ্ধ সকলকে আকর্ষণ করিবার জন্য আড়ম্বর নাই। ইহার মর্ম্ম কেবল সাধকেই জানেন। কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন নহে, যেই নাম সেই কৃষ্ণ। মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যই তাহার প্রমাণ। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।—

"প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুইত সমান॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিন ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্মনাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গুণ কৃষ্ণ লীলা বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥

কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণ একই বস্তু, এই কথার তাৎপর্য্য কি? সম্প্রতি এই প্রশ্নটীর মীমাংসা না করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। সাধক অনুরাগ ভরে একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণ নাম জপ করেন। কৃষ্ণ নামের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে প্রাকৃত জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তিনি কৃষ্ণ নামের মাধুর্য্যাস্বাদনে যতই ব্যাগ্র হন, ততই নাম হইতে সুমধুর রস বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আর্দ্র করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মন প্রাণ রসের মধ্যে ডুবিয়া যায়, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ দিয়া রসের প্রবাহ ছুটে, তিনি যেন রসের অকূল-সাগরে ভাসিতে থাকেন। যখন রস পান করিয়া সাধক প্রেমে উন্মত্ত হন, যখন সাধক কেবল প্রেমময়, যখন সাধকের কৃষ্ণ ব্যতীত কিছুই থাকে না, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বাধ্য হইয়া সাধকের সম্মুখে আসিয়া দর্শন দেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধকের যে দশা উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। সাধক তখন দেখিতে পান, নামেও যে রস, রূপেও সেই রস, দেখিতে পান, "কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুইত সমান।" এবং দেখিতে পান, কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ নাম নহে কৃষ্ণই স্বয়ং, জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম রূপে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে সাধকের চক্ষুতে চিরদিনের মত একটি দাগ লাগিয়া যায়, সাধক চির দিনের মত রসের সাগরে ভাসিতে থাকেন।

সাধকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥"
"কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥

এই কৃষ্ণ নাম কলি জীবের একমাত্র সম্বল। কলিকালে নাম ভিন্ন আর গতি নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

নামের অচিন্ত্য শক্তি, অনন্ত মহিমা বর্ণন করিবার শক্তি আমাদের নাই। মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রকাশানন্দের উক্তি,—

"সন্ন্যাসী হইয়া কর গায়ান নর্ত্তন।
ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া করহ কীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম॥"

ইহার উত্তরে মহাপ্রভুর উক্তি :—

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ নাম জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
এই আজ্ঞা পাইয়া নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাসি কাঁদি নাচি গাই যেন মদ মত্ত॥
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণ নামে বুদ্ধি ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার উপজয়ে কৃষ্ণ ভাব॥
কৃষ্ণ বিষয় প্রেম পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ প্রায় চারি পুরুষার্থ॥

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণ নামের ফল প্রেমা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেম তোমা করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাব করে চিত্ত তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ গদ গদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য।
এতভাবে প্রেমাভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়॥
নাচিয়া গাইয়া ভক্ত সঙ্গে করি' সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার সর্ব্বজন॥
এই তাঁর বাক্য আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণ নাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥

কৃষ্ণ নামই কৃষ্ণের স্বরূপ, এবং কৃষ্ণ নামই কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রধান সাধন। কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিতে কালা কাল স্থানাস্থান বিচার নাই। অনুরাগের সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে হয়। অনুরাগই নামের সাধনে প্রধান সহায়। অনুরাগ হইতে সাধকের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, এবং অনুরাগ হইতেই সাধকের একাগ্রতা জন্মে। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে অনুরাগ জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহার বিঘ্ন বাধা অনেক। সেই জন্য গোস্বামী শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ নাম জপ করিতে হয়, অনুরাগের প্রতিকূল বিষয় হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোস্মি।" নামোপাসনায় জপ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে, সাধক সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয় না। কেন না,—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

মুক্তি ও প্রেম দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস। মুক্তি লাভ হইলে প্রেম লাভ হয় না, কিন্তু প্রেম লাভ হইলে মুক্তি লাভ হয়। মহাপ্রভু অল্প কথায় নাম সাধনের সুন্দর মীমাংসা করিয়া দেখাইয়াছেন, যথা—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
সর্ব্ব শক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপ লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥

অথ শ্লোক।—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

ইহার অর্থ।—

উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥
বৃক্ষ যেন কাটি লেহ কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হইয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজায়॥"

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"ঊর্দ্ধ বাহু করি কহো শুন সর্ব্ব লোক।
নাম সূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥

প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥"

"তৃণাদি" শ্লোকের ভাব মনে মনে ধারণ করিয়া, সর্ব্বদা মনে মনে নাম গ্রহণ করিলেই হয়, বাহিরে সাধন দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এই কথা অনেকেই বলেন, এবং অনেকের ধারণাও এইরূপ।

মনে মনে সাধন করিতে পারিলে চলিতে পারে, মন লইয়াই ধর্ম্ম। কিন্তু মনের ধর্ম্ম দেখিলে মনকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। মনের প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ আছে। মন বাহিরের বিষয় পাইলে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে। (তাহাকে বাধ্য হইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়।) যে পর্য্যন্ত মন প্রাকৃত বিষয় লইয়া সুখী হয়, সেই পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত বিষয়ের সহিত তাহার প্রণয় হয় না। "কৃষ্ণের নাম, প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।" এই কথা মানিয়া লইয়া আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে সাধন করিতে হয়। কৃষ্ণ নাম যেমন খাইতে শুইতে সর্ব্বদাই করিবার ব্যবস্থা আছে, তেমনই মনের গতি পরিবর্ত্তনের জন্য, কৃষ্ণ নাম সাধনের সঙ্গে সাঙ্গ কতকগুলি সাধনাঙ্গ রাখার ব্যবস্থা আছে। যে বিধি কৃষ্ণ নাম সাধনের সাহায্য করে, সেই বিধি পালন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দুই প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া বাহিরের সাধন। এক প্রকার নিজে উদ্ধার হওয়া, অন্য প্রকার অন্যকে উদ্ধার করা সুপবিত্র ভক্তির বস্তু অঙ্গে ধারণ করিলে, দ্রব্যের গুণে নিজেরত উপকার হইবেই, স্পর্শের কথা দূরে যাউক, তাহা দর্শন করিয়াও অন্যে উপকার পাইবে। দর্শন শক্তির দ্বারা এক বস্তুর গুণ অন্যে সঞ্চালিত হয়, ইহা প্রকৃতির নিয়ম।

উচ্চ করিয়া নাম কীর্ত্তন করিলে, মনে মনে নাম গ্রহণ অপেক্ষা অনেক ফল হয়। যিনি নামোচ্চারণ করেন, তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের নামের শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ প্রবেশের সুযোগ পায় না। সহজেই তাঁহার একাগ্রতা জন্মে। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা নাম শ্রবণ করেন, তাঁহারাও অশেষ ফল প্রাপ্ত হন। সময় মত উচ্চ কীর্ত্তন ও প্রয়োজনীয়। ইহার প্রমাণ হরিদাস।

যাঁহারা নিত্য সিদ্ধ ভক্ত, তাঁহাদের সাধন-ভজন না হইলেও চলে। কিন্তু সাধকের পক্ষে সেরূপ কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না। সাধককে সর্ব্বতো-

ভাবে সতর্ক থাকিতে হয়। যাঁহারা ভক্তি রসে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের প্রেম বিহ্বলিত স্বভাবের নিকট কোন পাপই প্রবেশ করিতে পারে না; তাঁহাদের সাধন ভজনে তত প্রয়োজন হয় না, কেহ কেহ বলেন, লোক শিক্ষার জন্য তাঁহাদিগকেও সাধন ভজনের মধ্যে থাকিতে হয়।

কৃষ্ণ নাম যিনি যত ভাল বাসেন, কৃষ্ণ নামে তিনি তত সুখ পান। সাধক কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে সিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে আত্মহারা হইয়া যান। তাঁহার অন্তঃকরণে অপার্থিব ভাবের সম্পূর্ণ উদয় হয়, তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও পার্থিব পদার্থের সহিত মিলিয়া থাকিতে পারেন না। সর্ব্বদা কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন।

যেমন শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্য নানাবিধ ভক্ত নানাবিধ ভাবে আস্বাদন করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম মাধুর্য্যও নানাবিধ ভক্ত নানাবিধ ভাবে আস্বাদন করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ নাম যে প্রকারে উচ্চারিত হউক, ফল নষ্ট হয় না। জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে আগুণে হাত দিলে যেমন হাত পুড়য়, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নাম গ্রহণ করিলে, কল্মষ রাশি বিনষ্ট হয়। প্রমাণ যথা—

"সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলন মেববা।
বৈকুণ্ঠ—নাম গ্রহণ মশেষাঘহরং বিদুঃ॥" শ্রীভাগবত।

এবং "মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং।
সকল নিগম বল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরি গীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর! নর মাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥" স্কন্দপুরাণ।

হরিদাস বলিয়াছেন;—

নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥"

যদি একবার মাত্র কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলেই ফল হয়, তবে অনবরত উচ্চারণ করিবার তাৎপর্য্য কি? এবং অজামিল যে একবার মাত্র নামোচ্চারণ

করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন, জীবের ভাগ্যে তাহা দুর্ল্লভ কেন? এক্ষণে এই দুইটি প্রশ্নের যথা সম্ভব উত্তর প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছি।

যে সময়ে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হয়, সেই সময়ে পাপ থাকে না। কৃষ্ণ নামের প্রভাবে পাপ সমূহ অপসারিত এবং বিনষ্ট হইলে মুক্তি হয়। কিন্তু স্বভাবের প্রবল প্রবাহ জীবের মুক্তাবস্থা থাকিতে দেয় না, মুক্তির বাধক জন্মায়। দ্বিতীয়তঃ অপরাধের সুদৃঢ় সংস্কার হঠাৎ বিনষ্ট হয় না। কাজেই সকলকে বাধ্য হইয়া পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণ করিতে হয়।

মুক্তির জন্য এইরূপ করিতে হইলে, প্রেমের জন্য যে করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ যাঁহারা কৃষ্ণ নাম ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, তাহাদিগকে নামের স্বাদ গ্রহণ জন্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে হয়।

যিনি যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, পর জন্মে তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হন। ইহা যেমন একটি ব্যবস্থা; মৃত্যু কালে একবার মাত্র কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া মরিতে পারিলে অনায়াসে মুক্তিলাভ হয়, ইহাও তেমনই একটি ব্যবস্থা। তাই অজামিলের মুক্তি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তাহাই কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? মৃত্যুকালে স্বভাবই আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়।

যে নাম একবার মাত্র গ্রহণ করিলে রাশি রাশি পাপ বিনষ্ট হয়, যে নাম গ্রহণ করিলে জীব পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করিতে সক্ষম হয়, বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে সেই নামে কোনই ফল হয় না। বৈষ্ণবাপরাধ বড় ভয়ানক জিনিস। সাধক বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সর্ব্ব প্রকারে সতর্ক থাকেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যা-নন্দের চরণাশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবদিগের বন্দনা করিতে পারিলে বৈষ্ণবাপরাধ প্রবেশ করিতে পারে না। এই কলিযুগে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ প্রেম বিতরণের জন্য অবতীর্ণ। যিনি শ্রীগৌর নিত্যানন্দের চরণাশ্রয় করেন, বৈষ্ণবদিগের বন্দনা করেন, বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ও বৈষ্ণব চরণামৃত ভক্ষণ করেন, এবং গোস্বামী শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণ নাম সাধন করেন, তাঁহার পক্ষে প্রেম ভক্তি দুর্ল্লভ নহে।

যাঁহারা নাম গ্রহণ করেন, কিন্তু অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করেন না, এবং নামবলে পাপে প্রবৃত্ত হন, নামের শক্তি সেই সকল ব্যক্তিতে প্রকাশ পাওয়া সুকঠিন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে, নাম হইতে অপরাধের বিনাশ হয়, আবার নাম হইতেই অপরাধের উৎপত্তি হয়। "নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।"

এই কথা যেমন সম্পূর্ণ সত্য, এই কথার যোগ্য পাত্র হওয়া তেমনই সম্পূর্ণ উচিত। পাত্র ভেদে ফলের তারতম্য আছে।

কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণ নাম জপিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নাম জপ করা কর্ত্তব্য। যেমন কৃষ্ণলীলা পদ গাহিবার পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র গাহিবার ব্যবস্থা, সেইরূপ কৃষ্ণনাম জপিবার পূর্ব্বে গৌর নিতানন্দের যুগলনাম জপিবার ব্যবস্থা। কৃষ্ণ নামে বিচার আছে, ভুক্তিমুক্তির ব্যবস্থা আছে; কিন্তু গৌর নিত্যানন্দের নামে কেবল প্রেমই আছে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নাম জপিলেই কৃষ্ণ নামে প্রেম আপনা হইতেই হয়। সকলের শ্রীগৌর নিত্যানন্দের যুগলনাম সার করা কর্ত্তব্য। কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং বলিতেছেন;—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু না পাইয়ে কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥
হেন প্রেম চৈতন্য নিতাই দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই তাহে আনের কি কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥
অদ্যাপি দেখি চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ নামে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
নিতাই বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
অনায়াসে সর্ব্ব অঙ্গে অশ্রু গঙ্গা বয়॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করয়ে প্রকাশ॥
প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলক গদগদ অশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন॥

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার॥
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥"

আর একটা কথা না বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতে পারিতেছি না। সুতরাং সেটিও বলিতে হইল। যে নাম শ্রীকৃষ্ণ বাঁশরীতে সাধিয়াছেন, যে নাম করিতে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্চ্ছিত ও ধূলি ধুসরিত হইয়াছেন, সেই রাধা নামের সুধা কি জীবের ভাগ্যে ঘটে না? রাধা নামের সাধন কোথায়? শ্রীরাধিকাকে ভক্তের মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহার নামের সাধন কেহ অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন করুণ, আমরা কিন্তু বলিব, কৃষ্ণ নাম এবং রাধা নাম ভিন্ন নহে, কৃষ্ণ তত্ত্বের মধ্যে রাধা তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। কৃষ্ণ নাম সাধন করিতে জানিলে রাধা নামের স্বাদ পাওয়া যায়,' এবং রাধা নাম করিতে জানিলে কৃষ্ণ নামের স্বাদ পাওয়া যায়। ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন;—

"কৃষ্ণ নাম গুণে ভাই, রাধিকা চরণ পাই,
রাধা নাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।"
এবং "কৃষ্ণ নাম রাধা নাম, উপাসনা রসধাম।"

রাধাকৃষ্ণ যুগল নামের বিষয় অন্য সাধনাঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। এখন সকলে জয় গৌর নিত্যানন্দ জয় রাধাকৃষ্ণ বলিয়া নাম সাধনের কথা এইখানে বন্ধ করুণ।

হে সহৃদয় পাঠক! আপনি যদি কৃষ্ণ নামের স্বাদ কখন গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মহাপ্রভুর সেই অরুণ আঁখি, সেই বিগলিত অশ্রু, সেই পুলকাবৃত বিশাল দেহ, সেই কৃষ্ণ নামে অবরুদ্ধ কণ্ঠ, সেই ধর্ম্ম, সেই কম্পন, সেই প্রেমবিগলিত ভাব একবার স্মৃতিপথে উদিত করুন। জানিতে পারিবেন।

"কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥"

ভক্তি।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্নকর্ত্তৃকসম্পাদিত।

শ্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

২য় খণ্ড   শ্রাবণ মাস ১৩১১।   ১২শ সংখ্যা।

ভক্ত মণ্ডলীর সাহায্যে—

শ্রীভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

ঠিকানা—হাবড়া—কৌড়ার বাগান শীতলা তলা।

হাবড়া, বৃটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা ।

হৃদয় নিভৃতরঙ্গে সর্বদেব দীনবন্ধো ।
ত্বমিহ সুখনিবাসঃ সচ্চিদানন্দসিন্ধুঃ ॥
নিরবধি বিনিমগ্নোদুঃখ সংসারসিন্ধৌ ।
অত মহত কৃপালো সিঞ্চিতঃ প্রেমবিন্দো ॥

হে ভগবন্ দীনজন বন্ধো ! সকল শাস্ত্র, সকল সাধক ও সকল সম্প্রদায়, এক বাক্যেই বলিতেছেন ; তুমি নিত্যসত্য, তুমি জ্ঞান স্বরূপ, তুমি প্রেমানন্দ সিন্ধু, তুমি আনন্দময়. তোমাতে দুঃখ নাই, শোক নাই, ভাবনা নাই, হতাশ নাই, তুমি সর্ব্বজীবজীবন তুমি অমার হৃদয়ে হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছ, জীবহৃদয়ে তোমার অভাব কখনও হয়না । কিন্তু কি পরিতাপ কি দুঃখ কি দুর্ভাগ্য ! যাহার হৃদয় সেই প্রেমময় আনন্দঘনমূর্ত্তি সর্ব্বদা বিরাজিত, সেই আমি আনন্দ কাহাকে বলে তাহা জানিলাম না, প্রেমে মাতিয়া কি সুখ তাহা পাইলাম না, ভাবেভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা কাহাকে বলে বুঝিলাম না, নিরন্তর দুঃখসাগরে ডুবিয়া আছি ? হে কৃপালো ! মনে হয় তোমার কৃপা ভিন্ন হৃদয় বিহারী প্রেমঘনমূর্ত্তি যে তুমি তোমায় জানিতে পারিব না, নাজানিলে আমার এ অশান্তি যাইবার নয় তুমি কৃপা করিলে অভিমান অজ্ঞানাদি

দূর হইবে আমি তোমার প্রেমে তোমার সত্ত্ব প্রাণেপ্রাণে উপলব্ধি করিয়া চিরঅশান্তি চিরদুঃখ চিরকালের অভাব দূর করিব। হায় হায়! আমায় একবিন্দু প্রেম বারিতেও বঞ্চিত করিলে? হে নাথ কৃপাকর, বিন্দুমাত্র কৃপাবারিতে ত্রিতাপতপ্তহৃদয় সুশীতলকর, দুঃখানল নিভিয়া যাউক! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না আর ভুগিতে ও ভাবিতে পারি না, শান্তিময়! জনমের মত তোমার চিরশান্তিময় প্রাণ জুড়ান ভাবে দীনহীনকে আশ্রয় দাও।

দীনবন্ধু।

যোগ ও ভক্তি।

ভক্তি উল্লাসময়ী উপাসনা। যোগে উল্লাস কম। "যোগ" শব্দে সাধারণতঃ আত্মযোগ বুঝিতে হয়, কিন্তু ভক্তি ও যোগ, উহা বিশিষ্ট যোগ। ভক্তি মনঃশিক্ষা হইতে আরম্ভ হয়। মনঃশিক্ষার সহিত ভক্তির মুখ্য সম্বন্ধ। আবার দেহশিক্ষার সহিত যোগের সম্বন্ধ মুখ্য। শ্রীমদ্রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন:—

"বাচশ্চ বেগং মনসশ্চ বেগং ক্রোধস্য বেগং চোদবোপস্থ বেগং।
বেগান্ য এতান্ বিসহেত বীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং সশিষ্যাৎ॥"

এস্থলে বেদান্তোক্ত শমদমতিতিক্ষার প্রয়োজন উপদিষ্ট হইয়াছে। মনের নিগ্রহ শম সাধিত হইলে দমও তিতিক্ষার জন্য অতটা ভাবিতে হয়না। গুরুপার্শ্বে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বালকের চাপল্য ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়না। তদ্রূপ ভগবন্নামের সম্মুখে মন থাকিলে, মনের শম ঘটে লোল্য প্রজল্পাদি প্রশমিত থাকে। আসন প্রাণায়াম প্রক্রিয়াদি বলেও দীর্ঘকালে মনের শম সাধিত হয়। প্রথমোপায়ের

নাম ভক্তি। দ্বিতীয়োপায়ের নাম যোগ। শ্রীভগবানের নামরূপ গুণাত্মিকা মানসিকি ক্রিয়ার নাম ভক্তি; উহা উল্লাসময়ী। শমদম লাভের তদিতর উপায়ের নাম যোগ। উহা ভগবৎসম্বন্ধহীনতা প্রযুক্ত কঠোর ও নিরস। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, কি গুণ, কোন একটির সহিত যোগ থাকিলেই মনের উল্লাস হয় এবং উল্লাসগুণে চিত্তমল—অমঙ্গল—বিদূরিত হয়। এই জন্যই ভক্তি বিশিষ্টযোগ।

নারদপঞ্চরাত্রে ভক্তির সংজ্ঞা এই রূপ :—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

দেহাদি অন্যান্য বিষয়ে মমতা না হইয়া কেবল শ্রীভগবানে অত্যধিক মমতাকেই ভীষ্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব, নারদ, ভক্তগণ ভক্তি বলিয়াছেন।

যোগে দেহাদির মমতা করিতে হয়, দেহের সেবাবিশেষে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। সুতরাং উহা ভক্তি হইতে পৃথক্। যোগে দেহাদির চিন্তানিবন্ধন মন ভগবচ্চিন্তার সুযোগ ও অবসর পায়না। স্বাস্থ্য, আয়ু, অঘটনঘটন-পটীয়সী বিভূতি ও কৈবল্যের প্রতি যোগের লক্ষ্য। সুতরাং উহা নবসৃজিত বাসনায় জড়িত থাকে। ভক্তির লক্ষ্য কেবল ভগবান্।

এখন্ যোগ কি? যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। তখনকার অবস্থা কি? তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানং। যোগে দ্রষ্টৃ পুরুষ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। যোগী নিজ আত্মারই ধ্যান করিয়া থাকেন এবং এই যোগের পরিণতিমূলক সমাধি লাভ করেন। সকলের দেহ, সকলের জীবন যোগের অনুকুল হয় না। যোগের সর্ব্বাঙ্গ সাধন করিয়া উঠা বড় কঠিন, অতীব ক্লেশকর! তাতে আবার ভগবৎসম্বন্ধের প্রক্ষীণতাহেতু আরো ক্লেশকর। কোন বালককে যদি বল "একপায় হাটিয়া আস", সে উহা ততটা

পছন্দ করিবেনা, পথও অতিক্রম করিতে পারিবেনা। কিন্তু যদি বল, দেখ বালক, "দৌড়ে এসো, আমি তোমাকে এই সন্দেশটি দেব।"—তখন বালকের চিত্তোল্লাস কত হইবে! সন্দেশের মিষ্টি প্রতিপদেঅনুভব কবিতে থাকিবে এবং অতিদ্রুত পথ চলিয়াও অণু-মত্রও ক্লেশ বোধ করিবেনা। যোগ ও ভক্তির ঈদৃশ অবান্তর ভেদ। যোগ শাস্ত্রের মতান্তরে ষটচক্র ভেদও করিতে হয়। ব্যাপার খানাকি? কিন্তু যোগী যে ভক্ত হইতে পারেননা এমত নহে। যোগী যদি ভক্তিতে পৌঁছেন, তবে তিনি পাকা ভক্ত হন। ইহা সহজেই অনুমিত হয়। কারণ তিনি ভক্তির নিম্নস্তরের অনেকগুলি বিষয়ে অভ্যাসযোগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া উঠেন। আবার আত্মদর্শন হইতে কি না হইতে পারে? কিন্তু যোগমার্গে অতটা উঠা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিতে পাবে?—তাই ভক্তি পক্ষে যোগেব নিন্দা শাস্ত্রে পাই।

এস্থলে তলিয়ে দেখিবাব একটি বিশেষ বিষয় আছে। তাহাএই:—যোগের সহিত ভক্তির কোনও মাখামাখি কুটুম্বিতা আছে কিনা? স্থল ভেদে যোগ ভক্তির সব্বতোভাবে প্রতিকূল কি অনুকূল? সমীরণ সতত সর্ব্বত্র স্রোতের প্রতিকূল থাকে না। ভানুর কিরণ বাদ দিলে চন্দ্রের সুখশীতল স্নিগ্ধ রশ্মির অস্তিত্ব থাকে কি না, চাঁদের মহিমা বজায় থাকে কি না? বর্ষণ বন্ধ করিলে নদীর ধারাকান্তি থাকে কি না?—অথাৎ যোগেরে বিদায় করিয়া দিলে ভক্তি তিষ্ঠেন কি না?—ইহা স্থির করিতে চেষ্টা করা যাউক।

ভক্তিগ্রন্থে আমরা যে সকল শব্দ ও উপাধি দেখিতে পাই, সেগুলির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে গেলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে, যোগসূত্রেই ভক্তিহার গ্রথিত—ভক্তি যোগে সম্পূর্ণ ওতঃপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত।

বেদবেদান্তে পাওয়া যায় স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর। ভক্তি শাস্ত্রে পাই সাধনদেহ ও সিদ্ধদেহ। মন সূক্ষ্মশরীরের প্রধানাঙ্গ। সূক্ষ্মদেহভুক্ত বুদ্ধিমন ছাড়িয়া কেবল হস্তপদাদিময় স্থূলশরীর দিয়া কর্ম্ম হয়না সাধন হয়না। সুতরাং সাধনদেহ স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই দেহের সমষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহলে, থাকে মাত্র কারণ-শরীর, উহা প্রকৃতিপুরুষাত্মক। সত্ত্বরজস্তমসাংসাম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ। এই প্রকৃতি আদর্শ উপাসক এবং পুরুষই একমাত্র উপাস্য। যার চিত্ত স্থূলসূক্ষ্মমলমুক্ত হইয়া এই প্রকৃতির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। উপাসকের "আমি" আছে। "আমি" আছেন, প্রকৃতি ও আছে। "আমি"র লয়ে, প্রকৃতির লয়। "আমি"কে ?—আত্ম—ভাব বা সিদ্ধদেহ সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আত্মদর্শনমূলক। এখন দেখা যায় যোগীর আত্মতত্ত্বই ভক্তিসাধনমূলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কেবল উপাধির বর্ণান্তর দ্বারা ভিন্নরূপ চিত্রিত ও রঞ্জিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্রহ্মশক্তি সগুণ। এই শিবশক্তি বা পুরুষপ্রকৃতি ভিন্ন আবার তৃতীয়পক্ষ কে ?—শক্তি নারীরূপে সর্ব্বশাস্ত্রে গৃহীতা ও জনসমাজে পূজিতা। তবে এই পুরুষমূর্ত্তি অনন্ত আবার কে ? এ সম্বন্ধে আমরা বড় একটা অনুসন্ধান করিনা। শিবশক্তির সমাজে অনন্তের কোন নাম পাওয়া যায়না। কিন্তু বৈষ্ণবীয়পুরাণে শ্রীভগবানের মহাশক্তি অনন্তনামে অভিহিত দৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা-যায় ব্রহ্ম ভগবান ব্রহ্মশক্তিই অনন্ত। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে প্রকৃতিপুরুষ রাধাকৃষ্ণাতিরিক্ত শক্তিধর বলদেবকে পাই, যিনি অনন্ত। এস্থলে গোল বাধিল। কারণ দুইটী শক্তির যুগপৎ খেলা। তাদের একটী পুরুষ, একটী নারী। শাস্ত্রমিলাইয়া তত্ত্ব খুঁজিলে ইহার বিশদ মী-মাংসা আছে। শিবশক্তি যোগতন্ত্রে আমরা অনন্তের কোনও উল্লেখ পাইনা। কিন্তু কুণ্ডলিনী নামে একটী শক্তির কথা আছে এবং উহা

অতি উচ্চ কথা। উহা নাগমূর্ত্তি। এই নাগিণীর চৈতন্যে উপাষক প্রকৃতি উপাস্য পুরুষকে লাভ করে। ইহা তন্ত্রোক্তবাক্য। সুতরাং এই নাগিণী পুরুষপ্রকৃতিযোগের নিয়ামক। মানবদেহের সূক্ষ্মা-ভ্যন্তরে এমন এক জ্যোতিশ্চক্র আছেন, যাহা উদ্ভাসিত হইলে, দেহে বিপুল শক্তিসঞ্চার হয় এবং তদ্দ্বারা উপাসকের যোগসাম্বেগ ঘটে। এই নাগেশ্বরী সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিতে অধিক সাধনার আবশ্যক করেনা কিন্তু স্থায়িভাব লাভ কঠিন।

পুরাণরাজ শ্রীগ্রন্থভাগবতে অনন্ত সম্পর্কে যেযে তত্ত্ব নিহিত আছে, তাদের কয়েকটীর উল্লেখ করিলেই এই অনন্ত কুণ্ডলিনীর একত্ব সপ্রমাণ হইবে। অনন্ত আসনভূত পদ্ম বলিয়া একস্থলে বর্ণিত আছে, স্থানান্তরে চতুর্ব্যূহের তত্ত্ব বর্ণিত পাই। এতদ্দ্বারা চতুর্দল পদ্মের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থলান্তরে অনন্তের নাগমূর্ত্তিবিলাস বর্ণিত আছে। আবার সঙ্কর্ষণদেবের স্বরূপতত্ত্ব বর্ণনায় এইরূপ পাওয়া যায় যে ইনি প্রকৃতিকে সঙ্কর্ষণ বা আকর্ষণ করিয়া পুরুষে মিলান, তজ্জন্য ইহার নাম সঙ্কর্ষণ হইয়াছে। অতএব সপ্রমাণ হয়যে, অনন্ত কুণ্ডলিনীর ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সংযোজক। সুতরাং লীলা, মূর্ত্তি, শক্তি ও অধিষ্ঠানের সামাদৃষ্টে ইতি সিদ্ধান্তে যে শাক্তের কুণ্ডলিনী আর ভক্তের অনন্ত—সঙ্কর্ষণ—রাম—নিত্যানন্দ,—অভিন্নযোগতত্ত্ব।

দ্বিতীয়তঃ "মায়াতীতে ব্যপি বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতু-র্ব্যূহমধ্যে।" এই চতুর্ব্যূহ কি চর্ম্মচক্ষুরতীত নয়। সুতরাং উহা যোগতত্ত্বমূলক। চারিটি ব্যূহ কি তৎসম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা নাই; কেবল ভাষায় পাই, তোতার ন্যায় শিখি। তুরীয়, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল—এই কি চারিটী ব্যূহ নয়? তুরীয়ব্রহ্ম বাসু-দেব, কারণোপহিত চৈতন্য সঙ্কর্ষণপ্রাজ্ঞ, সূক্ষ্মোপহিত চৈতন্য প্রদ্যুম্ন

হিরণ্যগর্ভ, এবং স্থূলোপহিত চৈতন্য বৈশ্বানর অনিরুদ্ধ, ইহাই রাম-নিত্যানন্দতত্ত্ব। উহা যোগতত্ত্ব বৈ আর কিছু নয়। যোগতত্ত্বের এই চতুর্ব্যূহ অবগত নাহইলে ভক্তিতত্ত্বের বিকাশ হয়না এবং ভক্তির আগাগোড়া কিছু ঠিক পওয়া যায়না। তত্ত্ববিচার করিলে যোগ ও ভক্তির ছাড়াছাড়ি নাই তৎপ্রমাণ কল্পে উহাই যথেষ্ট, যে নিত্যানন্দ ছাড়িয়া দিলে ভক্তির কিছুই থাকেনা সে নিত্যানন্দ পাইলাম যোগতত্ত্বসাররত্ন।

কালীহর বসু,
ঢাকা—ভাগ্যকুল।

তুমিই সব তোমাতে সব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিখিল জগতের সর্ব্বোর্দ্ধে দেশে পরব্যোম ধাম। এই ধাম দুনিরীক্ষ ব্রহ্ম জ্যোতিতে পূর্ণ। এই জ্যোতির প্রথমস্তর জ্ঞানময় কোষ, ইহা শুভ্র জ্যোতিঃ। শৈবগণ এই জ্যোতি সদা শিব বলিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। এই জ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় স্তর আনন্দময় কোষ। ইহা কৃষ্ণ জ্যোতিতে পূর্ণ! ব্রহ্মবাদীগণ, যোগীগণ, নির্ব্বাণীগণ, এই জ্যোতিতে নির্ব্বাণ লাভ করেন। শাক্ত গণ এই জ্যোতিকে ত্রিপুরা দেবী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সদাশিব তাঁহার শয্যা স্বরূপ বলিয়া গনণা করেন। এই ত্রিপুরাই শাক্ত গণের নির্ব্বাণ স্থল। সৌর গণও সূর্য্য মণ্ডল হইতে এই জ্যোতিতে প্রবেশ করেন। গাণপ গণও গাণপত্য লাভের পর এই জ্যোতিতে অন্তে প্রবিষ্ট হন। চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রাপ্ত বৈষ্ণবগণও এই স্থানে

নির্ব্বাণ লাভ করেন। দ্বৈত বাদী বৈষ্ণবগণ নির্ব্বাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা এই জ্যোতিরভ্যন্তরে সাকার নিত্য মূর্ত্তি দেখেন। তাঁহারাই পার্ষদ রূপ নিত্য গতি লাভ করেন।

পর ব্যোমে গোলোক ও নিত্য বৈকুণ্ঠ এই দুইটি নিত্য ধাম আছে। গোলোক আনন্দ ময় কোষে, বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময় কোষে। বৈকুণ্ঠের বাম ভাগে নিত্য কৈলাশ। পরব্যোমের অধোভাগে মহজ্জল, ইহার নাম কারণবারি। এই বারি অনন্ত জগতের আধার।

গোলোকে জ্যোতিরভ্যন্তরে একমাত্র শান্ত দ্বিভূজ শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ মূর্ত্তি ছিলেন, কৃষ্ণ বিহারে উন্মুখ হইলে তদীয় বাম ভাগে স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর সার অংশে রাধা মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সহসা দ্বিধা হইলেন। ঐশ্বর্য্য ভাগ মহালক্ষ্মী, মাধুর্য্য ভাগ শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণও উভয় মূর্ত্তির গৌরব রক্ষা হেতু দ্বিধা হই-লেন। ঐশ্বর্য্য ভাগ চতুর্ভুজ নারায়ণ, মাধুর্য্য ভাগ দ্বিভূজ মুরলী ধর শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতা হইলেন, মহালক্ষ্মী নারায়ণের আশ্রিতা হইলেন। জ্ঞানময় কোষে শ্রীমহালক্ষ্মী নারায়ণ শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে এবং আনন্দ ময় কোষে গোলোক ধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিলেন।

সর্ব্বাদি সর্গে কারণ তোয়ে মহত্তত্ত্ব রূপী মহাবিরাট প্রকাশিত হইলেন। ইনি সর্ব্বাবতার বীজ, সৃষ্টির আধার ও আদি বীজ। ইহাঁর প্রতি রোম কূপে এক এক অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব। প্রতি ডিম্বের অভ্যন্তরে জল, ইহার নাম গর্ভোদক। গর্ভোদকে বট পত্র শায়ী মহাবিষ্ণু আছেন। ইহাঁর নাভী হইতে এক পদ্মঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; ঐ পদ্মে সৃষ্টি কর্ত্তা চতুরানন ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। ঐ পদ্মের কাণ্ডে অর্থাৎ নাল মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন বিরাজিত। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মার ললাট হইতে কালাগ্নি রুদ্র প্রকাশিত হন। চতুর্দ্দশ ভুবন

নারায়ণের কলা অনন্ত দেবের মস্তকে অবস্থিত। ঐ অনন্ত মুখে কালাগ্নি রুদ্র প্রলয় কারণ স্বরূপ হইয়া রহিলেন। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্ষীর সমুদ্র বেষ্টিত শ্বেত দ্বীপে সিন্ধু তনয়া লক্ষ্মী পতি চতুর্ভুজ বিষ্ণু বাস করেন।

ত্রিরূপ ভঙ্গপূর্ব্বক যে মূর্ত্তি এক মাত্র অবশেষ থাকেন, তিনিই ত্রিভঙ্গ ললিত শ্যাম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। এই সৃষ্টাদি প্রলয়ান্ত কেবল ত্রিরূপের খেলা মাত্র। সমস্তই যেন ত্রিরূপে বিন্যস্ত। যথা—

তিন পুরুষ মূর্ত্তি, কারণ তোয় শায়ী, গর্ভোদক শায়ী, সর্ব্ব জীব গুহা শায়ী।

তিন বিষ্ণুমূর্ত্তি, ক্ষীরোদ শায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণ, গোলোকে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ।

তিন শিব মূর্ত্তি, ভুবন মধ্য স্থিত কৈলাশে পার্ব্বতী পতি রুদ্র ইনি তমঃ প্রবর্ত্তক। ২ য়। ঈশ্বর বা শিব, পরব্যোমে বৈকুণ্ঠ ধামে নিত্য কৈলাশে, দুর্গা ও ভদ্রকালী শক্তি দ্বয়ে পরি শোভিত শুদ্ধ সত্ব গুনাশ্রিত। ৩ য়। সদা শিব। নিগুর্ণ, নিরাকার, অদ্বৈত জ্ঞান তত্ত্ব।

তিন ব্রহ্মা। চতুরানন সৃষ্ঠি কর্ত্তা, সত্য লোকাবস্থিত। ২ য় হিরণ্য গর্ভ। ৩ য় মহদ্ব্রহ্ম। যিনি দ্বারিকায় ব্রাহ্মণ বালক অপহরণ করায়, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন যাঁহার নিকট হইতে বালক প্রত্যানয়ণ করিয়াছিলেন।

তিন গুণ। সত্ব, রজঃ, তমঃ। বিষ্ণু সত্ব গুণ প্রবর্ত্তক, পালন কর্ত্তা, ব্রহ্মা রজো গুণ প্রবর্ত্তক, সৃষ্ঠি কর্ত্তা, রুদ্র তমো গুণ প্রবর্ত্তক, প্রলয় কর্ত্তা। এক মূর্ত্তি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য জন্য ত্রিমূর্ত্তি গ্রহণ করেন, এই মূর্ত্তিত্রয় গুণের প্রবর্ত্তক, নির্লিপ্ত স্বয়ং গুণাস্পৃষ্ট।

তিন শক্তি। স্বরূপ শক্তি, জীব শক্তি, মায়া শক্তি। জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি। হ্লাদিনী শক্তি, সন্ধিনী শক্তি সম্বিৎ শক্তি।

তিন যোগ। জ্ঞান যোগ, ক্রিয়া যোগ, ভক্তি যোগ। জ্ঞান যোগে তুরীয় মুক্তি; কর্ম্ম যোগে ক্রম মুক্তি, ভক্তি যোগে পার্ষদত্ব বা জীবন্মুক্তি।

ত্রিবিধ জীব। বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত। জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত। গৃহী, সন্ন্যাসী, প্রপন্ন। বিরক্ত; অনুরক্ত, উদাসীন। মুক্তাত্মা, পুণ্যাত্মা, পাপাত্মা।

বস্তু ত্রিবিধ। চর, অচর, তদতীত ব্রহ্ম।

ত্রিবিধ অবস্থা। জগৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। জন্ম, জীবিত, মৃত্যু। আদ্য, মধ্য, অন্ত।

তিন লোক। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল। কর্ম্মভূমি, ভোগ ভূমি, মোক্ষ ভূমি। স্বর্গ, অপবর্গ, নরক।

এই ত্রিরূপ মূলে কেবল একমাত্র তুমি, অতএব তুমিই সব তোমাতেই সব। সকল স্রোত, সকল পথ, তোমা হইতেই বাহির হইয়া তোমাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র পড়িয়া,

মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছিবার উপায় কি?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শাস্ত্রে ভগবান আমাদিগকে সাংসারিক সুখভোগ বা কর্ত্তব্য-পালন করিতে নিবারণ করেন নাই, কেবল মোহযুক্ত হৃদয়ে ভোগ্য দ্রব্যে প্রগাঢ় লিপ্সা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন, কেন না তৃষ্ণার ন্যায় রোগ আর নাই, তৃষ্ণাতে ক্রমাগত তৃষ্ণার ও অভাবের বৃদ্ধি করিয়া হৃদয়কে শান্তিহীন করে, ভোগ্য দ্রব্য যাহা ভগবান আমাদিগকে দিয়াছেন তাঁহাকে স্মরণপূর্ব্বক প্রশান্ত হৃদয়ে তাহা ভোগ করিলে কোন ক্ষতি নাই, গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন।

আপূর্য্যমাণ মচল প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তি মাপ্নোতি ন কাম কামী

যেমন চারিদিকের নদ নদী হইতে ক্রমাগত জল আসিয়া সমুদ্রে পতিত হইতেছে অথচ তাহাতে সমুদ্রের বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস নাই, সেইরূপ যিনি কামনার বিষয় সকল উপভোগ করিতেছেন, অথচ বিন্দুমাত্র কাম দ্বারা বিচলিত হইতেছেন না, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন, ভোগকামনাশীল ব্যক্তি শান্তিলাভ করিতে পারেন না।

যোগবাশিষ্টে আছে—

প্রত্যাহার বঁড়িষেণ ইচ্ছা মংসং নিযচ্ছত—

অতএব ইচ্ছাকে বহির্ম্মুখীন করিয়া সংসারে ছাড়িয়া না দিয়া অন্তর্ম্মুখীন করিয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ভ্রাতৃগণ! যদি একান্তই কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে দমন করিতে অশক্ত হও তাহা হইলে তাহাদিগের গতি ফিরাইয়া দাও শুদ্ধা ভক্তির কামনা কর, সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর, অহংকারের উপর ক্রোধ কর, দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত ক্রোধ ভরে বল, কি! আমি সর্ব্বপাপহারি হরিনাম করিয়াছি আমার আবার বন্ধন কি? আমার আবার পাপ কি? ঐ রূপ বিশ্বাস ও ভক্তি লাভ করিবার লোভ কর, ঈশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হও, ভক্তির অঞ্জন চক্ষে মাখিয়া তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হও, তাঁহার নামমদে মাতাল হও ভক্ত সাধুগণের গুণের অনুকরণ কর, তাঁহারা ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন আমিও ঈশ্বরের দাস তবে কেন পারিব না বলিয়া হৃদয়ে মাৎসর্য্য আনয়ন কর, এরূপ করিলে যে অস্ত্র তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবার আশঙ্কা ছিল, সেই অস্ত্র লইয়া আপন পথ পরিষ্কার করিতে পারিবে, যে দস্যুরা তোমার গন্তব্য পথের বিঘ্ন স্বরূপ ছিল, সেই দস্যুদের সহায়েই জঙ্গলময় জীবনপথ অতিক্রম করিয়া সচ্চিদানন্দ সাগরের তীরে উপস্থিত হইতে পারিবে।

ভক্তগণ! যতক্ষণ লেশ মাত্র অহংকার থাকিবে, ততক্ষণ ভগবানকে লাভ করা দুরাশা মাত্র "আমি করিতেছি" এই অজ্ঞান জনিত

অভিমান ত্যাগ করিয়া কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া প্রশান্তচিত্তে, অনাসক্ত ভাবে কার্য্য করিলে, আকাশ যেমন সর্ব্বঘটে আছে অথচ কলঙ্কিত হয় না তেমনি নিষ্কলঙ্ক ভাবে সংসারে বিচরণ করিতে পারিলে পরিণামে আমরা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হইতে সক্ষম হইব, কিন্তু সংসারে এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করা কঠিন এবং সাধনা সাপেক্ষ, এই সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মন দুগ্ধের স্বরূপ. অতএব জলের উপর দুগ্ধ রাখিলে মিসিয়া যাইবেই, সেই জন্য প্রার্থনা রূপ অম্ল সংযোগে দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করিয়া পরে ভক্তিরূপ মন্থন দণ্ড দ্বারা নিষ্কাম রূপ মাখন তুলিয়া সংসার জলে ফেলিলে আর মিসিবার ভয় থাকে না এবং প্রাতঃকালে মাখন তুলিলে যেমন ষোল আনা মাখন পাওয়া যায়. সেইরূপ ভক্তি সাধনা বাল্য কাল হইতেই করা উচিত এবিষয়ে নির্লিপ্ত মুক্ত সংসারী জনক রাজা আমাদের উপমাস্থল তিনি বলিতেন—

অনন্তং বত মে বিত্তং কিন্তু মে নাস্তি কিঞ্চন
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন

অর্থাৎ—

আমার অনন্ত ধন রত্নাদি আছে, তথাপি আমার কিছুই নাই মিথিলা ভস্মীভূত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।

উপরোক্ত শাস্ত্র প্রমাণে, ইন্দ্রিয় দমন, অনাসক্ত ভাবে সংসারে বিচরণ ও ভক্তিধনে ধনী হওয়া সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল, এবং যাহা ভবসাগর পার হইয়া আনন্দধামে যাইবার তরণী স্বরূপ তাহা নিজের সাধনায়, নিজের ক্ষমতায় লাভ করিব এরূপ অভিমান করিলে সকলি পণ্ড হইয়া যায়, আমি বা আমার বলিয়া অভিমান করিবার যখন কিছুই নাই, তখন সকল বিষয়ই প্রার্থনার দ্বারা লাভ করিতে চেষ্টা পাওয়া উচিত, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় রত্ন সকল লাভ করিবার পথের বিঘ্ন স্বরূপ অবিদ্যাদি নাশ করিবার

জন্য যে বলের আবশ্যক ব্যাকুল প্রার্থনা যোগে সেই বল ভগবানের নিকট লাভ করিতে হয়, বারি পাত্র যেমন নদীর জলে পূর্ণ থাকে সেইরূপ আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পাত্রে যত্তটুকু শক্তি আছে তাহা ভগবানের দত্ত ও সেই শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে তাঁহার নিকট প্রার্থনা আবশ্যক, নিজে বৃদ্ধি করিব মনে করিলে অভিমান আসিয়া পড়ে এবং ঐ অভিমান সম্ভূত সূচী প্রমাণ ছিদ্র পাইলেই অবিদ্যা রাক্ষসী সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটায়।

ক নিরোধো বিমূঢ়স্য যো নির্বন্ধং করোতিবৈ
স্বরাবস্যৈব ধীরস্য সর্ব্বদাসাবকৃত্রিমঃ

অষ্টাবক্রসংহিতা।

অর্থাৎ—

যে মুর্খ ইন্দ্রিয় সংযমাদির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা না করিয়া নিজের তেজ দেখাইতে যায়, সে বিফল মনোরথ হয়, কেবল যে জ্ঞানী আত্মাকে লইয়া আনন্দক্রীড়া করেন অর্থাৎ যিনি নিষ্ক্রিয় সমাধিমান তাঁহার ইন্দ্রিয় সংযম অকৃত্রিম।

অতএব সর্ব্বাবস্থাতেই প্রার্থনা আমাদের একমাত্র বল, বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া আমরা মানব দেহ পাইয়াছি, সার্ব্বভৌম সম্রাটের নিকট যেমন কপর্দ্দক ভিক্ষা করা মুর্খতার পরিচায়ক সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড পতির নিকট আমাদের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব রত্নাদি প্রার্থনা না করিয়া স্বর্গীয় ভক্তিরত্ন ভিক্ষা করা উচিত। ভক্তি পাইলে ইন্দ্রিয়াদি আপনা হইতেই দমিত হইয়া যায়, যেমন কাহারো পুত্রশোক হইলে সে সময় তাহার হৃদয়ে অভিমান স্থান পায়না, সেইরূপ ভক্তি স্থায়ী হইলে ইন্দ্রিয়-তাড়না ও অভিমান নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ভগবৎ ভক্তি সংসারে জীব হৃদয়ে শান্তির অমৃত ধারা বর্ষণ করে এবং দেহান্তে অনন্তসুখ ও অপার আনন্দ প্রাপ্তির কারণ হয়, ভক্তির বল অসীম, শিবাবতার দুর্ব্বাসামুনি ভক্ত রাজ অম্বরীষের নিকট পরাজিত হইয়া পদানত

হইয়াছিলেন, ভক্ত প্রহ্লাদের মহিমা জগত বিদিত, ভক্তিবলে ত্রিজগতে কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না, এমন কি মোক্ষ সাম্রাজ্যের রাজলক্ষ্মী ভক্তের পদানত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করেন। ভাগবত—

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দ সান্দ্রা।
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ॥"

অর্থাৎ—

যদি ভগবচ্চরণে আন্তরিক ও অকপট ভক্তি হয়, তাহা হইলে মুক্তিদেবী আপনি আসিয়া চরণে লুণ্ঠিত হন, কিন্তু ভক্ত কিছুই চাহে না, চাহে কেবল সেই অভয় চরণারবৃন্দে ভ্রমর রূপে মধু পান করিতে ও গুণ গুণ রবে হরি গুণগানে আত্মহারা হইতে। ভক্তগণ! যে আনন্দের আস্বাদসুখ দেবতাদের কল্পনাতীত—মানব লেখনী তাহা কি প্রকারে বর্ণনা করিবে?

পাঠকগণ? আমরা যে কয়টী বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এতক্ষণে সেগুলির মীমাংসা হইল আমরা বুঝিলাম যে একমাত্র ব্যাকুল প্রার্থনাই ভক্তিলাভের মূল এবং হরিভক্তিই সংসারে শান্তির প্রস্রবণ ও মুক্তির কারণ।

শ্রুতি বলিতেছেন:—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃনুতে তনুংস্বাম্

এই আত্মাকে অর্থাৎ ভগবানকে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পাওয়া যায় না, কেবল ইনি যাহাকে কৃপা করেন তাঁহার নিকট ইনি স্ব স্বরূপ প্রকাশ করেন। ব্যাকুল প্রার্থনাই এই কৃপা লাভের মূল।

অতএব প্রার্থনা যোগে ভক্তি সাধনাই আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং সময় থাকিতে থাকিতে সেই লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে পারিলে জীবন সংগ্রামে অনায়াসে জয়ী হইয়া দেহান্তে প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হইতে সক্ষম হইব।

"কৌমার মাচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

বাল্য হইতেই ধর্ম্মাচরণ করিবে একেতো মনুষ্য জন্মই দুর্লভ তন্মধ্যে সফলকাম জীবন নিতান্তই দুর্লভ।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "ভক্তি সাধন অল্প বয়সেই কর্ত্তব্য হৃদয়ভূমি কোমল থাকিতে থাকিতে ভক্তিবীজ বপন করা উচিত সংসার তাপে পুড়িয়া সে মাটি ঝামা হইয়া গেলে বীজ ভাল গজায়না অতএব প্রথম হইতেই বিদ্যা ও ধন অর্জ্জনাদি সমস্তই ভগবানকে লইয়া করিলে আত্মোন্নতি হয়, নতুবা শঠতার পরিপোষক হইয়া আত্মনাশের কারণ হয়।

পাঠকগণ! এক্ষণে ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার কতকগুলি সামাজিক বিঘ্নের বিষয় উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অসৎসঙ্গ ধর্ম্মপথের একটি বিশেষ বিঘ্ন স্বরূপ, সমাজ ধর্ম রক্ষা করিতে গিয়া অনেক সময় আমরা অবিদ্যা কবলে পতিত হই, এরূপ স্থলে অবিদ্যা ছদ্মবেশে জীবহৃদয়ে আধিপত্য লাভের জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করে, আমরা মনে করি যখন সমাজে আছি তখন সামাজিক সৌহৃদ্য অবশ্য রক্ষণীয়, কিন্তু পাঠকগণ! যদি ভ্রাতা বা পিতা ঈশ্বর-পরায়ণ না হয়েন তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গও পরিত্যাজ্য—

"বরংহুতবহ জ্বালা পিঞ্জরান্ত ব্যবস্থিতিঃ।
ন সৌরি চিন্তা বিমুখ জন সংবাস বৈবশম্॥"

কাত্যায়ন সংহিতা।

অগ্নিদাহ মধ্যে লৌহময় পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল, তথাপি ভগবচ্চিন্তাবিমুখ ব্যক্তিদিগের সংসর্গে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

যাহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী ও ঈশ্বর-পরায়ণ তাহারাই ব্রাহ্মণ তুল্য, এরূপ ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও তাহার সঙ্গ প্রার্থনীয়। ভাগবত।

"চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ॥"

অর্থাৎ—

হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং হরিভক্তি-হীন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষা অধম।

এই ব্রহ্মাণ্ড ত্রিগুণময় (সত্ব, রজ, তম,) ও এই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণের সংযোগে গঠিত, কিন্তু দেহভেদে এই গুণত্রয়ের মধ্যে এক একটি গুণ-ভাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, প্রত্যেক জীবের চতুর্দ্দিকে দিহস্ত স্থান ব্যাপিয়া তদ্দেহের গুণস্রোত অতি সূক্ষ্মভাবে প্রবাহিত হয়, সত্বগুণাবলম্বী যদি রাজসিক বা তামসিক প্রবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করে তাহা হইলে জল যেমন দুগ্ধের সহিত মিসিয়া যায়, দুর্গন্ধময় বারি যেমন সচ্ছবারির সহিত মিসিয়া সাম্য-ভাব ধারণ করে সেইরূপ রজো বা তমোগুণের স্রোত সত্বগুণে বিলীন হইয়া একতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহা সত্বগুণাবলম্বীর ঘোর অনিষ্ট সাধন করে এই জন্য সঙ্গদোষকে শাস্ত্রকারেরা ভয়াবহরূপ চিত্রিত করিয়াছেন এবং সাধুসঙ্গকে ধর্ম্মপথের প্রধান সহায় ও আত্মোন্নতির কারণ বোধে সৎসঙ্গ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অনেক সময় এই সামাজিকতার অনুরোধে আমাদিগকে পর-চর্চ্চার সাহায্যকারী হইতে হয়, পরচর্চ্চা জ্ঞানবারিপূর্ণ দেহ-ঘটের একটি ছিদ্র বিশেষ, পরমাত্ম চর্চ্চার পক্ষে পরচর্চ্চা বিশেষ হানিজনক কে কি ভাবে জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে, অজ্ঞ আমরা, কি করিয়া বুঝিব? বন্ধুতাস্থলে বাক্যে বা কার্য্যে বিপরীত ভাবের আভাষ পাইলে, নিজের জ্ঞানানুযায়ী তাহাকে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে না বলিয়া অসাক্ষাতে নিন্দা করা পশুভাবের পরি-চায়ক, আবার মিথ্যা নিন্দা করিলে সেই উদ্গারিত গরল নিন্দা-কারীর দেহে সংক্রামিত হইয়া নানারূপ দুশ্চিন্তা ও রোগোৎপত্তির কারণ হয় এবং নরকের ছবি ইহকালেই দর্শন করায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

অমলা—(ক্ষুদ্র গল্প)।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অমলা। "তোমার মনে ঘোর অন্ধকার দেখিতেছি, নামের ফল কই? দুঃখ হরণ করেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে হরি বলি। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে হরি বল, এখনি ফল পাওকি না দেখ। বল হরি জগতের কর্ত্তা।"

আফ্‌জল। "দুনিয়ার মালিক আল্লা।"

অমলা। "আবার?"

আফ্‌জল। "বলিতে যাইতেছি, তা উল্টাই বলিয়া ফেলিতেছি।"

অমলা। "আহা! মজ্জুয়ার দেহে হিন্দু শোণিত ছিল কিনা, তাই তাহার এক কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল। তুই পশুঘাতি যবন, তোর সহজে সাত্ত্বিক নামে বিশ্বাস হইবে কেন?"

আফ্‌জল আবার বিহ্বল হইয়া পড়িল। কহিল, "আমার মজুয়া কি তেমার সঙ্গে কথা কহিয়াছে? আহা! বল! বল! মজুয়া আমায় কি বলিয়া গিয়াছে?"

অমলা কাঁদিলেন, কহিলেন "সেকথা শুনিয়া কি করিবে আফ্‌জল? তাহা শুনিলে তোমার হৃদয় ফাটীয়া যাইবে।"

আফ্‌জল। "দেবি মূর্ত্তি তুমি! আমি যবন হইলেও তোমাকে দেখিয়া দেবতা মানিতে মনে হইতেছে। বল! দেবি! বল! আমার হৃদয় নাই, যেখানে লোকের হৃদয় থাকে, আমার সেখানে খোদা এক খানা ঝামা বসাইয়া দিয়াছেন। হৃদয় থাকিলে—উঃ!! আর বলিতে পারিনা, আমি কি করিয়াছি গো—হা মজুয়া! মজুয়া!"

যবন শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অমলাও চক্ষুরজল মুছিয়া কহিলেন "আফ্‌জল! ধৈর্য্যধর; আহা! মজুয়া সাধ্বী, পতি ভিন্ন জানে না, তাই সে পাপের মুখ হইতে পতিকে

বাঁচাইতে আসিয়াছিল, আফ্‌জল! তুমি ভিন্ন তাহার মনে অন্য সুখবাসনা ছিল না। তুমি যে তাহাকে কত কষ্ট দিয়াছ, বাঁদীর মুখে শুনিলাম, কিন্তু মজুয়া বলিল দিদি ও কথা শুনিওনা, তা কিছুই নয়, তিনি আমায় ভাল বাসেন, না বাসেন তাতেইবা আমার কষ্ট কি? আমি একবার তাঁহাকে দেখিলেই সব ভুলিয়া যাই, আব তাঁহার হাঁসি মুখ মনে রাখি, তাই ভাবি, তাই দেখি।”

আফ্‌জলের দেহ অবশ হইয়া পড়িল, চক্ষুব জল শুখাইয়াগেল, চিৎকার করিয়া কহিল “আঃ!! বল! বল! আর ছোড়ার প্রয়োজন নাই—মরিবাব সময় আমার মজুয়া কি বলিল সেই কথা শুনিবার জন্যই প্রাণ আছে।”

অমলা কহিলেন “মজুয়ার শেষ কথা—হা প্রেম! প্রাণ যায় তবু প্রেম যায় না,—ওঃ!—আফ্‌জল! আর একবার দেখিতে পাই-লাম না, বক্ষে ছুরী মারিয়াছ, সে জন্যত কিছু বলিনাই, কিন্তু যদি একবার মরিবার সময় দেখা দিতে, সুখে মরিতাম।”

দুই চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিল, আফ্‌জল মূর্চ্ছিত হইয়া মজুয়ার উপর পড়িয়াগেল। অমলা একবাব কাঁদিলেন, আবার চক্ষু মুছি-লেন, কহিলেন “হে হরি! প্রভো! ভক্তের কথা রাখ, মজুয়ার প্রেমের পুরস্কার দাও, আফ্‌জল পোঁড়া যবন, তাহাকে তোমার উচ্চ রাজ্যে পাঠাইতে আমার সাধ্য নাই, সহায় হও, সুমতি দাও।”

অমলা যবনকে স্পর্শ করিলেন, মুখে জল চক্ষে জল দিতে লাগিলেন, অনেক ক্ষণ পরে আফ্‌জল চেতন পাইল, হুঙ্কার দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল “তারপর? দেবি! বল! বল! মজুয়াকে কোথায় পাঠাইলে? আমাকেও সেখানে পাঠাও আমার এই অন্তিম উপকার কর, মজুয়াকে যে মহামন্ত্র দিয়াছ, আমাকেও সেই মহামন্ত্র দাও। আমি যাবনিক মত ছাড়িলাম, মজুয়াকে দেখিলাম, সে আমায় সব বলিয়াছে, দাও আমায় সেই দুঃখ ভঞ্জনের মধুর নাম দাও।„

অমলা কাঁদিলেন, আফ্জলের মস্তকে পবিত্র হস্ত দিয়া কহিলেন, গাও—

হরে মুরারে—মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

আফ্জল গাহিল, আবার গাহিল, আবার গাহিল, গাহিতে গাহিতে চক্ষে প্রেমাশ্রু বহিল। কহিল "তুমি দয়াবতী দেবী, তুমি আমার জননী, তুমি আমার কন্যা, তুমি আমার গুরু, তুমিই আমার সাক্ষাৎ সেই হরি। আমি যবন, পাঁচওক্ত নমাজ করিয়াছি, রোজা করিয়াছি, খোদার নাম লইয়াছি, কিন্তু কখনও প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিনাই, আজ তুমি আমায় উদ্ধার করিলে। মা আমার আর একবার গাও, আমারও বুঝিও অন্তিমকাল নিকট, আর কথা কহিতে পারিতেছি না, এইবার অন্তিম শয্যার কাজ কর মা।"

অফ্জল হাত বাড়াইয়া অমলার চরণের ধূলা লইল, মাথায় দিল, অমলা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার গাহিলেন।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

আফ্জলের বাক্যরুদ্ধ, আকাশের দিকে স্থির নয়নে কি দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষে জল পড়িল। অমলা কহিলেন "তুমি এখন আর যবন নহ, দেবতা, ঐ দেখ স্বর্গীয় বিমানে তোমায় মজুয়া তোমাকে লইতে আসিতেছে। যাও, সুখে থাক, হরি তোমাদের আশা পূর্ণ করিলেন, যে মহামন্ত্র দিলাম, স্বর্গেও তাহা ভুলিওনা, স্বর্গের নন্দন কাননে, মন্দাকিনী পুলিনে, স্বর্গীয়

বায়ুর তালে তালে প্রেমিক প্রেমিকার প্রাণ ভরিয়া সেই মধুর সঙ্গীত গাহিও। স্বর্গের পারিজাত তুলিয়া দুজনে প্রেমভরে সেই প্রেমময়ের চরণোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলী দিও। প্রেমের রাজ্যে প্রেমভরে সেই প্রেমময়ের "হরে মুরারে" নাম ডাকিয়া প্রেমময় প্রাণ তাঁর চরণে ঢালিয়া দিও, আহা! ধন্য ধন্য! তোমাদের প্রতি আমার হরির বড় দয়া।"

আফ্‌জল আবার সেই মধুর নাম গাহিতে ইঙ্গিত করিল, অমলা মধুরকণ্ঠে আবার গাইলেন "হরে মুরারে" সেই মধুর সঙ্গীতের পবিত্র তরঙ্গে পবিত্র জীবন তরঙ্গ মিশাইয়া আফজলের পবিত্র আত্মা স্বর্গ পথে ছুটিল, সেই গগনপথ বিহারিণী মঞ্জুয়ার পার্শ্বে গিয়া বসিল, প্রেমিক প্রেমিকার পুত আত্মা প্রেমরাজ্যে চলিয়া গেল। অমলা প্রেমে বিভোর হইয়া "হরে মুরারে" নাম গাহিতে গাহিতে প্রেমিক প্রেমিকার দেহ দুইটি ভাগীরথী বক্ষে ভাসাইয়া দিলেন।

অমলা তীরে উঠিয়া দেখিলেন তাঁহার গুরুদেব দাঁড়াইয়া আছেন, অমনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। গুরুদেব মস্তকে চরণ দিয়া কহিলেন "বৎসে! আমি তোমার গুরু অভিমানে ধন্য হইলাম। তোমার ভক্তি সিদ্ধ হইয়াছে, চল তোমাকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারাণীর দাসী করিয়া দিব।"

অমলা সাশ্রুনয়নে কহিলেন "আমার মা?"

গুরু। "তোমার মাও যাইবেন। চল সব প্রস্তুত আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। দুরাত্মা আফ্‌জল খাঁর দৌরাত্ম্যে দেশ উৎসন্ন হইতেছিল, তুমি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছ, শ্রীহরি তোমার প্রতি সন্তোষ, আমি সন্তোষ, জগৎ সন্তোষ, এখন চল, নিজের কার্য্যে মন দাও।"

অমলা। "প্রভো! হরিনামের ফল প্রেম, কিন্তু তবে হরিনামে কেন স্বর্গবাসনা দূর হইলনা! আমার এই ভ্রম দূর করিয়া দেন।"

গুরু। "বৎসে! হরিনামের অনন্ত শক্তি, সাধক নিজ কামনানুরূপ ফল পায়, ইহার আর ভ্রম কি? বাসনা থাকিতে মোক্ষ হয় না, মোক্ষের ঊর্দ্ধে প্রেম। সকামী সাধক হরিনামে নিষ্পাপ হইয়া সমুদয় সুকৃতির ফল এক হরিনাম হইতেই লাভ করিয়া স্বর্গাদি ভোগ প্রাপ্ত হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি হরিনামে মুক্তিলাভ করেন। যিনি ভক্তির সাধক, হরিনাম তাঁহাকেই প্রেমরত্ন দান করেন।"

অমলা শ্রীগুরু পাদপদ্মের ধূলি গ্রহণ করিয়া, গুরুদেবের অনুসরণ করিলেন। তারপর শ্রীবৃন্দাবনে বহুদিন ভক্তির সাধন করিয়া অন্তে শ্রীরাধারাণীর দাসী হইলেন।

সহকারী সম্পাদক।

সম্পূর্ণ।

সুখ-অন্বেষণ।

(১)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
সারাটি জীবন গেল বৃথা অন্বেষণ।
সুখের কেমন ছায়া, না দেখিনু কভু তাহা,
দুঃখের করাল মূর্ত্তি বিষাল গঠন।
আঁকিয়া হৃদয় পটে কাটাই জীবন॥

(২)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
পাতি পাতি খুঁজিলাম এ সারা ভুবন।
ফুল্ল কমলিনী দলে, ফুটন্ত গোলাপ ফুলে,
হাসন্ত তারকা দলে রাখিয়া নয়ন।
খুঁজেছি তোমারে সুখ কিন্তু অকারণ॥

(৩)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
জোছনা নিশিতে বসি' সুনীল গগন।
হেরিয়াছি কতনিশি, বিজনে একান্তে বসি,
নীরব প্রকৃতি হাসি রজত কিরণ।
তার মাঝে সুখ মাত্র করিব কল্পন॥

(৪)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
গৃহ ত্যজি' কুঞ্জ মাঝে করেছি ভ্রমন।
বসিয়া বকুল ডালে, ললিত রাগিণী তুলে,
গায় পাখী চেয়ে থাকি পাতিয়া শ্রবণ।
তার মাঝে কোথা সুখ বুঝিনা কেমন॥

(৫)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
দেখিয়াছি সমুদ্রের লহরী নর্ত্তন।
উত্তাল তরঙ্গ গুলি, ভীমনাদে পড়ে ঢলি,
শুনিলে শীহরে প্রাণ সে ভীম গর্জ্জন।
মনে হয় থাক্ সুখ নাহি প্রয়োজন॥

(৬)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
করিয়াছি কতদিন গিরি আরোহণ।
এমনি বাতাস সেথা, এমনি গাছের পাতা,
এমনি ভানুর তাপ চাঁদের কিরণ।
যত উঠি তত দেখি সকলি এমন॥

(৭)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
ভেবে ভেবে কত নিশি করি জাগরণ।
রাজার প্রাসাদখানি, কল্পনায় মনে আনি,

তার মাঝে নাহি দেখি সুখের বদন।
দুরন্ত চিন্তার ভার রাজার বহন॥

(৮)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
দেখিয়াছি দরিদ্রের কুটীর ভবন।
আতঙ্কে শিহরে কায়া, অনন্ত দুঃখের ছায়া,
ছাইয়া রেখেছে যেন দরিদ্র জীবন।
অভাবে স্বভাব সদা বিষাদে মগন॥

(৯)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
তন্ন তন্ন দেখিয়াছি গার্হস্থ্য-জীবন।
আজ শোক কাল রোগ, নিত্য নব অভিযোগ,
সহস্র যাতনা করে গৃহস্থ ধারণ।
বদনে অঙ্কিত সদা অব্যক্ত বেদন॥

(১০)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
যতনে পরিনু পায় বিবাহ বন্ধন।
তার মাঝে সুখ হায়, মরু-মরিচিকা প্রায়,
ভবিষ্য আঁধারে ঢাকা প্রিয়ার বদন।
কে বলে প্রেয়সী মুখ সুখ-দরশন॥

(১১)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
বিদেশে নিরাশে কত করেছি ভ্রমণ।
ভাবিতাম মনে মনে, ত্যজিলে আত্মীয় জনে,
পরদেশে পাব বুঝি সুখ-দরশন।
কোথা সুখ? মনদুঃখে করেছি রোদন॥

(১২)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
এভাবে কদিন আর করিব ভ্রমণ।
খুঁজিতে খুঁজিতে সুখ, ক্রমেই বাড়িছে দুখ;
পাবনা জীবনে বুঝি সুখ দরশন।
দুঃখে দুঃখে কেটে যাবে অভাগা-জীবন॥

(১৩)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
আর না করিব সুখ তব অন্বেষণ।
জেনেছি জেনেছি সার, তুমি সুখ নিরাকার,
মনের বিকার মাত্র নাহিক গঠন।
পুণ্যবলে ভুঞ্জে তোমা' শুদ্ধ সাধুগণ॥

(১৪)

কোথা সুখ! কোথা সুখ! সুখেরি কারণ।
বৃথায় গোঙানু কাল অশেষ যতন।
করুণা নিদান হরি, যদি দীনে দয়া করি,
কলুষ-কালিমা ধুয়ে শুদ্ধ কর মন
তবে বুঝি হ'তে পারে সুখের মিলন॥

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্ষ্যাপা। গুরুদেব অতি সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিলাম, অনেক স্থান ঘুরিয়াছি, অনেক পণ্ডিত দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের কৃত অনেক রকম ব্যাখ্যাও শুনিয়াছি কিন্তু আপনার ব্যাখ্যানুযায় সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সুমধুর প্রাঞ্জল ভাষায় অথচ অল্প কথায় কেহই বুঝাইতে পারে না।

দেব! সময় সময় নিজের চিত্তের অবস্থার অতিরিক্ত কথাও বলিতে হয়, না বলিলে লোক শিক্ষা হয় না অথচ যাহা প্রকৃত নিজে উপলব্ধি করি নাই, তাহা বলিলে কি পাপের ভাগী হইব না? এবিষয় যাহা কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিউন্।

প্রেমানন্দ। বৎস! বেশ সরল মনের কথাই বলিয়াছ, অবস্থার অতিরিক্ত ভাবের বাক্যাদি উপদেশ দিবার সময় প্রয়োগ না করেন এরূপ লোক সংসারে প্রায়ই দেখা যায় না। তবে উহার মধ্যে ভাল মন্দ আছে, কেহবা বলিতে পারেন এই কথাগুলি আমার না বলিলেই নয় তাই বলিতেছি পরন্তু আমি এরূপ বাক্য বলিবার যোগ্য পাত্র নহি। আর মনে মনে সতর্কতার সহিত শ্রীভগবৎ সকাশে প্রার্থনা করেন হে ভগবন্! আমি উপদেষ্টা হইয়া লোককে যেমন বলিতেছি আমার মন, আমার কার্য্য, ও আমার শিক্ষা ও ব্যবহার যেন এইরূপই হয় এইরূপ যাহার মধ্যে সতর্কতা ও অভিমান শূন্যতা আছে তাহার পতন হয় না। এমন কি ভগবৎ প্রার্থনার বলে অল্পকাল মধ্যেই সেইব্যক্তি আপন বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মনে ভাবে নূতন কথা শিখিব, লোককে উপদেশ দিব, আমার নিজের গুণ থাক আর না থাক লোকের কাছে কতকগুলি কথা বলিয়া মান পাই-

লেই হইল, ঐরূপ ব্যক্তি শাস্ত্রের অতি সুন্দর সুন্দর শ্লোকাদি মুখস্থ করিয়াও বিন্দুমাত্র আনন্দ পায় না। ফলে ঘোর অবিশ্বাসী, কুতার্কিক ও পণ্ডিতাভিমানী হইয়া পরগুণে স্পর্দ্ধা করিতে থাকে। এইরূপ লোক অতি ঘৃণিত ও ভয়ঙ্কর, এইরূপ লোকদ্বারা জগতের উপকার না হইয়া বরং অপকারই অনেক পরিমাণে সাধিত হয়।

ক্ষ্যাপা। দেব! আমি ইতিমধ্যে কোন এক দেশে গিয়াছিলাম, তথাকার প্রায় অধিকাংশ লোকই পরচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করে, সেখানে গুণীলোকের গুণের আলোচনা প্রায়ই হয় না, অনুসন্ধান করিয়া করিয়া লোকের দোষের আলোচনা করিয়া থাকে। আমি তাহাদের সহিত যতক্ষণ ছিলাম, প্রাণ কেমন অস্থির হইতে লাগিল, কীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম, তাহারা যোগদানও করিল, প্রাণ খুলিল না, ভাব আসিল না, আনন্দ পাইলাম না মনে বড়ই দুঃখ হইল সুতরাং জিজ্ঞাসা করি এতক্ষণ হরিনাম করিয়াও প্রীতি হইল না কেন?

প্রেমানন্দ। ক্ষ্যাপাচাঁদ! তুমিইত পূর্ব্বে বলিয়াছ মনুষ্য দেহধারী অনেক পশু আছে পরচর্চ্চাকারী দোষগ্রাহী জনগণ একপ্রকার মলবাহী পশু বিশেষ, ইহাদের হৃদয়ে সহজে দেবভাব আনা অসম্ভব।

শাস্ত্র বলিয়াছেন কেবল পুণ্যফল সঞ্চিত থাকিলে পুণ্যলোকে গমন করে, পাপ সঞ্চিত থাকিলে পাপযোনী কীট, পতঙ্গাদি হইয়া জন্মায়, পাপ ও পুণ্য দোষগুণ লইয়াই এই কর্ম্মভুমিতে মনুষ্যগণ জন্ম গ্রহণ করে, যাহাদের পুণ্যফল বেশী তাহারা সৎসঙ্গ ও বিবেকাদির বলে পাপাংশ দোষগুলি ক্ষালন করিয়া নির্ম্মল ও শুদ্ধশান্ত হইয়া পুণ্যধামে গমন করে। আর যাহাদের পাপ অধিক তাহারা আপন কর্ম্মফলে, অসৎসঙ্গে মিশিয়া কেবল পরের দোষ অনুসন্ধান করতঃ আপন হৃদয়কে দিন দিন কলুষিত করিয়া সঞ্চিত পুণ্যটুকু বিনাশ করতঃ পাপযোনীতে প্রবেশ করে, সুতরাং মনুষ্য মাত্রেরই

দোষ এবং গুণ থাকিবেই। দুর্গন্ধ স্থানজ মক্ষিকা গুলি যেমন বায়ুবেগে চালিত হইয়া মনুষ্য দেহে পতিত হইলেও ক্ষত প্রভৃতি অপবিত্র স্থান অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, পবিত্র, সুগন্ধ, সুনির্ম্মল অক্ষত স্থান তাহার প্রীতিকর হয় না, সেইরূপ অসৎ প্রকৃতি পশুবৎ জীব মানুষ হইয়াও পশুত্বের পরিচয় দিতে চেষ্টা করে। কাহারও সামান্য দোষ থাকিলে খুটিয়া খুটিয়া বিস্তার করিয়া লইতে চেষ্টা করে। ঐরূপ লোককে মলগ্রাহী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ঐ সব লোক হইতে দূরে থাকিবার জন্যই সিদ্ধপুরুষগণ প্রায় লোকালয়ে আসেন না। ঐ নরপিশাচগণ কখন কাহার অক্ষত চরিত্রকে ক্ষত করিয়া অলীক আমোদ প্রকাশ করিবে তাহার স্থিরতা নাই সুতরাং উহাদের নিকট হইতে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। দুষ্টব্যক্তি নিজের অন্তঃকরণের অনুরূপ অপরকেও সকল রকম কলুষিত মনে করে। আর যাহার চিত্ত নির্ম্মল, যিনি পরগুণগ্রাহী তিনি প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেক বাক্য হইতে গুণলেশকেও রাশি প্রমাণ বিস্তার করিয়া নিজেও সুখে থাকেন ও পরকেও আনন্দিত ও উৎসাহিত করেন। গুণগ্রাহী পুণ্যবান ব্যক্তি অপরের গুণ ভিন্ন দোষ একেবারেই দেখেন না, এখানে একটী শ্লোক মনে পড়িল বলিতেছি শ্রবণ কর—

"গৃহ্নাতি সাধুরপরস্য গুণং ন দোষান্
দোষান্বিতো গুণি-গুণান্ পরিহায় দোষং
বালস্তনাৎ পিবতি দুগ্ধমসৃগ্ বিহায়
ত্যক্ত্বাপয়োরুধিরমেব পিবেৎ জলৌকা"

যাহারা সাধুপ্রকৃতির তাহারা পরের সামান্য গুণকে বেশী বলিয়া গ্রহণ করেন, বহু বহু দোষের দিকে লক্ষ্য রাখেন না। আর যাহারা দোষযুক্ত অসাধু তাহারা গুণিগণের বহুগুণও পরিত্যাগ করিয়া অল্পদোষকেই বহু বলিয়া গ্রহণ করে। স্তন্যপায়ী সরল-

হৃদয় শিশু যে মাতৃস্তনমুখ হইতে অমৃতময় দুগ্ধ চোষণ করিয়া লয়, হিংসাপরায়ণ জলৌকা সেই স্তনমুখে লগ্ন হইয়া বিন্দুমাত্র দুগ্ধ লাভ করিতে পারে না পরন্তু কেবল শোণিতের দ্বারাই উদর পূর্ণ করে। ইহা দ্বারাই গুণগ্রাহী ও দোষগ্রাহীর মর্ম্ম বুঝিয়া লইবে। এবিষয় আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তোমায় বিশেষ সাবধান করিয়া দিতেছি কখনও পরের দোষ আলোচনা করিবে না, উহাতে যেমন মন কলুষিত হয় এবং ঐ কলুষিত ভাব দূর করিতে যেমন কঠোর তপস্যার প্রয়োজন এরূপ আর কোন মহাপাপ ক্ষালন করিতেও কঠোর করিতে হয় না।

ক্ষ্যাপাচাঁদ। গুরুদেব! যাহা বলিলেন তাহা অতি সত্য, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার আদেশ প্রতিপালনে সর্ব্বদা সক্ষম হই। গুরুদেব! এইরূপ এক একটী বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে সাধারণতঃ জীবের আর পাপের সীমা থাকে না। কি প্রকারে জীবের উদ্ধার হইবে সেই বিষয় কিছু সংক্ষেপে উপদেশ করুন। জীবের দুঃখ ও দুর্গতির বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া মন বড়ই অস্থির হয়। দেব! এই ভারতবর্ষবাসী আর্য্যসন্তানগণ বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল ও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অধ্যাত্মবিচার সম্বন্ধে সকল রকমে শ্রেষ্ঠ ছিল। কাল-ক্রমে তাহারা এক্ষণে যাবজ্জীবন কেবল উদরান্ন সংগ্রহের নিমিত্তই অতিশয় ব্যাকুল! আহা! একবারও পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিতেছে না; ক্রমিক দুর্ব্বল অল্পবুদ্ধি ও আধ্যাত্মজ্ঞানহীন হইয়া দুঃখময় সংসারের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সুখের গন্ধও পাইতেছে না? ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

প্রেমানন্দ। বৎস! জীবের দুঃখে যে তোমার প্রাণ কাঁদিতেছে ইহা সিদ্ধাবস্থার পূর্ব্ব লক্ষণ তোমার এই দয়ার ভাবে আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। দেখ বহুসংখ্যক মানবই ইহজন্মের ও পূর্ব্ব-জন্মের দুর্নিবার পাপের ফলে এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

প্রথমতঃ জীবনের নস্তু সময়ই বৃথা কার্য্যে কাটায়। সময় থাকিলেও সেই সর্ব্বনিয়ন্তা মঙ্গলময়ের নাম করে না। মনে কর, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই পরস্পর মিলাইয়া দিতেছেন। যাঁহার অনন্ত কৌশলে ও সম্পূর্ণ বৎসলতায় আমরা ইন্দ্রিয়াদি লাভ করিয়া যাহা কিছু সুখের ও প্রয়োজনীয় তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেছি, তাঁহার নিকট কেবল মাত্র তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাতেও কুণ্ঠিত বা বিমুখ হওয়া কি মহাপাপের কার্য্য নয়? আর এই পাপের পরিণতিতেই যে আমরা নানাবিধ রোগ শোক দুঃখদৈন্যাদিতে ছটফট্ করিতেছি তাহাতে কি কিছুমাত্র সন্দেহ আছে? দ্বিতীয়তঃ আমাদের পরস্পর সহানুভূতির অভাব, একজন ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবে অপরে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যাহাতে সেই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া শুভফল প্রদান করে তাহার জন্য পরস্পরের যত্ন থাকা আবশ্যক এবং উহাই জাতি, সমাজ ও ধর্ম্মের উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু আজকাল এবিষয় প্রায় অধিকাংশ লোকই নিদ্রিত কি প্রকারে আপন আপন আত্মীয় স্বজন নানাবিধ সাজ সজ্জায় বিভূষিত হইবে ইত্যাদি তামসিক ও রাজসিক ব্যাপারেই দিবানিশি ব্যস্ত থাকে. অধ্যাত্ম জগত বলিয়া যে কিছু আছে এবং এই অলসতার পরিণতি যে অতি দুঃখকর তাহা বোঝে না এবং সে বিষয় বুঝাইতে গেলেও অপ্রয়োজনীয় বোধে কর্ণপাত করে না। তৃতীয়তঃ নিজের বদ্ধমূল কুসংস্কার দূর করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, সেদিকে কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া বরং আপনাপন সংস্কারের অনুরূপে শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে যত্ন করে। এই দোষে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে কি দুর্ঘটনাই ঘটিয়াছে এবং কত বিকৃত সম্প্রদায় গঠিত হইয়া ধর্ম্মের নামে ঘোরতর অধর্ম্ম উৎপাদন করিতেছে তাহা বর্ণনা করিতে গেলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

ক্ষ্যাপাচাঁদ এই কলুষিত ভাব দমন করিতে হইলেও শ্রীভগবানের একান্ত প্রসন্নতার প্রয়োজন, সেই প্রসন্নতা যে জীব কত দিনে লাভ করিবে বলিতে পারি না। আপন আপন পাপের ফলে অনন্তকাল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যখন তীব্র অনুতাপ আসিবে ঐ তীব্র অনুতাপের সহিত যখন সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীভগবানের নাম আশ্রয় করিবে তখন শ্রীভগবৎ প্রসন্নতা বলে ক্রমিক অগ্রসর হইতে থাকিবে। যেমন যেমন অগ্রসর হইবে অমনি শ্রীভগবানের নামে রুচি শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা আসিবে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে একান্ত নিষ্ঠার নাম শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাই সকল উপাসনার মূল, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কখনও দুঃখ পায় না।

ক্ষ্যাপা। দেব উপদেশ অনেক শুনিয়াও মনকে বিষয় চিন্তা হইতে নিগ্রহ করা যায় না যতক্ষণ শুনা যায় ততক্ষণই ভাল, পরন্তু পরক্ষণেই মন অন্যদিকে যায়, মন যে সর্ব্বদাই চঞ্চল ইহার উপায় কি?

প্রেমা। বাবা ক্ষ্যাপাচাঁদ! এবিষয়ে তোমায় অনেকবার অনেকরকম উপদেশ দিয়াছি, তবু আবার বলিতেছি শ্রবণ কর, হৃদয়ে পবিত্রতা না থাকিলে কেবল শুনিয়াই মনস্থির হয়না, মনস্থির না হইলে যতই শুনিবে আর যতই করিবে কিছুতেই পরমানন্দ হইবার নয় মনস্থিরের জন্য সত্ত্বগুণ প্রধান আহার বিহার, সত্ত্বগুণাবলম্বী জনের সঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। আর কিছুই যদি না সম্ভব হয় অথবা সকল সদুপায় সম্ভব হইলেও অতি উত্তম আর এক উপায় আছে, শ্রীভগবানে সকল কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয় নিষ্পাপ নিষ্কপট ও শান্ত হইয়া যায়, এবিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই, ভগবৎ প্রসন্নতায় না হইতে পারে, এরূপ কোন কার্য্যই বিশ্বমাঝে নাই, যাহার নিষ্কপট প্রার্থনা বলে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজীব জীবন সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান প্রসন্ন তাহার আর কিছুই ভাবিতে হয় না, যোগ, জ্ঞান, তপস্যাদির

ফল তাহার অনায়াসলব্ধ যদি সহজে আনন্দ বা একেবারে কৃতার্থ হইবার বাসনা থাকে শ্রীভগবানে পূর্ণ নির্ভর কর; অবশ্য পূর্ণ নির্ভরতা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, ক্রমিক অভ্যাস কর। আহা! নির্ভরতা যে কি মধুর, নির্ভরতায় যে কি সুখ, নির্ভরতার গুণে যে জীবের কত উন্নতি হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। শ্রীভগবানেই যাহার নির্ভর অর্থাৎ হে ভগবন! আমি কিছুই জানিনা বা আমার কোন ক্ষমতা নাই তুমি যাহা কর তাহাই হইবে" এইরূপ ভাব, তাহার কোন দুঃখ কোন বিপদ কোন বাধা বিপত্তি আসিতেই পারে না, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান তাহাকে রক্ষা করেন। নির্ভরতার ফলে যুক্তি খাটেনা শাস্ত্র খাটেনা সম্ভব অসম্ভব মানেনা আমি বিশ্বস্তভাবে এরূপ বহু বহু ঘটনা জানি যাহা অসম্ভব হইলেও শ্রীভগবৎ কৃপায় অতি অল্পকালমধ্যেই সম্পাদিত হইয়াছে। রোগ কিছুতেই সারেনা, চিকিৎসক দেখাইয়া দেখাইয়া একেবারে হতাশ হইয়াছেন সকলে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে "এরোগ আরোগ্য হইবার নয়" আর অনন্য উপায় হইয়া শ্রীভগবানে নির্ভর করত অতি সহজে অতি অল্প সময় মধ্যে অলক্ষিতভাবে সুন্দররূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছে, এবিষয় বিস্তারিত বলিতে গেলে অনেক কথা বাড়িয়া যাইবে, সেই আনন্দময় শ্রীশ্রীভগবানে নির্ভর কর অভিমান শূন্য হইয়া তাঁহারই নাম গানকর সকল চঞ্চলতা সকল অশান্তি পলায়ন করিবে।

ক্ষ্যাপা। দেব বড়ই মধুর বড়ই মধুর প্রাণ মাতিল মন যে কেমন অননুভূত আনন্দে বিভোর হইতে লাগিল, তাহা বলিতে পারি না। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—আরনা দেব আজ আর কোন বিষয়ই শুনিতে ভাল লাগিবে না একক্ষণে শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন্।

প্রেমা। বৎস! নামই জীবের একমাত্র আশ্রয় নামই জীবের একমাত্র বন্ধু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বহুশাস্ত্র ও বহুভক্ত

একমুখে স্বীকার করিয়াছেন "নাম আর নামী (শ্রীভগবান) অভেদ" আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি শ্রীহরির নাম করিতে করিতে হৃদয় নির্ম্মল হইয়া আইসে ক্রমিক হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীহরির দিব্য মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়। যে জন শ্রীভগবানের নাম রসে মাতিয়াছে সে সেই নামসাগরে ডুবিতে পারিয়াছে যে শ্রীহরি নামই একমাত্র আপন বলিয়া অবলম্বন করিতে পারিয়াছে সেই ধন্য সেই মানুষ। তাহার পূর্ব্ব সঞ্চিত যতই পাপ থাকুক না কেন নামরূপী শ্রীভগবান তাহাকে উদ্ধার করিবেনই করিবেন। নাম গ্রহণে মূর্খ অধিকারী নাম গ্রহণে পণ্ডিত ও ধন্য হন, হরিনাম নির্ধনের ধন হরিনাম ধনীরও গ্রাহ্য ও আদরণীয়, হরি নাম সবল সুস্থ নিরোগীর সুখপ্রদ, হরিনাম রুগ্ন ভগ্ন শোকার্ত্তেরও শান্তিদাতা। সঙ্গদোষে কিম্বা অজ্ঞানতা নিবন্ধন মহা মহা গর্হিত কর্ম্ম করিয়া অনুতাপে দগ্ধ মানবের ইহ জন্মেই নিষ্পাপ হইবার একমাত্র উপায় ও অবলম্বন শ্রীহরি নাম। প্রাণ ভরিয়া মন মাতাইয়া অভিমান প্রভৃতি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া যে শ্রীহরি নাম সার করিতে পারিয়াছে সে জানে সে বোঝে সেই অনুভব করে নাম কি বস্তু নামে কি আনন্দ॥ ক্ষ্যাপাচাঁদ! ইহা বলিয়া বুঝাইবার নয় নামে মাতিয়া যাও ঠিক বুঝিতে পারিবে। আজ আর সময় হইল না তোমায় কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা নাম মাহাত্ম্য বুঝাইতে পারিলাম না তবে তুমি ইহা স্থির জানিও যে কলিহত জীবের হরিনাম ভিন্ন আর সহজে উদ্ধারের উপায় নাই, কলিকালে শ্রীহরির নামই যম, নিয়ম, হরিনাম ধ্যান ধারণা, হরিনাম যোগ তপস্যা। যদি অভিমান শূন্য হইয়া নাম কীর্ত্তন করিতে পারে তবে অষ্টাঙ্গ যোগের ফল তাহার করতলগত। নাম জপ ও নাম প্রচার নাম গুণগান কর নাম ভিন্ন আর বন্ধু নাই আর উপায় নাই আর একান্ত জুড়াবার ও আশ্রয় লইবার স্থান নাই তাই শাস্ত্র প্রশান্ত মনে গাহিয়াছেন।

হরের্নামৈব কেবলম্। হরের্নামৈব কেবলম্। (ক্রমশঃ) দীনবন্ধু।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক ভক্তগণ! শ্রীভগবৎ কৃপায় ভক্তি পত্রিকার ছয় বর্ষ পূর্ণ হইল আশাকরি গতবারের ন্যায় এবারও আপনাদের উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইব। আর বিশেষ প্রার্থনা সাধ্যমত প্রত্যেক গ্রাহক মহোদয়ই ন্যূন একটী করিয়া গ্রাহক বৃদ্ধি করত আমার ধর্ম্মপ্রচারের অনুকূলতা করিবেন।

আমাদিগের আশ্রম ভবনাপুর হইতে নিম্নলিখিত স্থানে আসিয়াছে, ভক্তি পত্রিকা এবং শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের পত্রাদি নূতন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা (বেদান্তবন্ধু)।

ঠিকানা—হাবড়া কোঁড়ার বাগান শাওলাতলা।

বিশেষ নিয়ম।

১। ভক্তির বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

২। নমুনা চাহিলে ৵০ দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। পত্রের উত্তর প্রার্থনা করিলে রিপ্লাই কার্ড পাঠাইবেন, নতুবা যথা সময়ে পত্র পাইবার সুবিধা হইবে না।

৩। গ্রাহক ভিন্ন অন্য লোকের লিখিত প্রবন্ধ 'ভক্তিতে' প্রকাশ করা হয় না। বিবেক বৈরাগ্য কিম্বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ভিন্ন অশাস্ত্রীয় কেবল কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক প্রবন্ধ পাঠাইলে প্রকাশ করা হয় না, ভক্তির কিম্বা জ্ঞান বৈরাগ্যের উদ্দীপক পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করা হয়।

৪। লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠে পরিষ্কার করিয়া প্রবন্ধ লিখিবেন; অতি অপরিষ্কার লেখা গ্রহণ করা হইবে না, কারণ তাহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ থাকিয়া যায় সুতরাং উহাতে লেখক এবং সম্পাদক উভয়েরই কলঙ্ক হয়। মাসের প্রথমেই প্রবন্ধ পাঠাইবেন নতুবা সে মাসে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইবে না।